সমসাময়িক শিক্ষা

সমসাময়িক শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

প্রকাশক :

অধিকর্তা

''রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ''

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : ৯৭৮-৮১-৯৩৭৪১৩-৬-৮

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পাদনা :

ড. মিনতি সাহা

মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলকাতা

সঞ্চালক :

ড. কে. এ. সাদাত ও নীলাঞ্জন বালা

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ (Preface)

D. El. Ed. কোর্স-এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান। শিশুদের সঠিকভাবে বুঝতে পারা, শিশুদের শিখন ও বিকাশের গতিবিধির জ্ঞান, শিশুদের সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে ধারণা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে শিশুর বিকাশে সহায়তা দান — এই সমস্ত ধারণা ও দক্ষতা সেই সমস্ত শিক্ষকদের অর্জন করতে হবে যারা প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা দেবেন। সমসাময়িক শিক্ষা (CC-03), সিলেবাসের এই অংশ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

বর্তমানে যাঁরা এই কোর্সটি করবেন তাঁদের এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায় ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সাহায্য করবে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষা ও স্বাধীনোত্তর পর্বের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তা শিক্ষক প্রশিক্ষক (Teacher Educators)-রা প্রথম অধ্যায়ে জানবে। স্বাধীনতা লাভের পর সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কীভাবে শিক্ষার দিকনির্ণয় করেছে তা জানা যাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার যুগ্ম অবস্থান, সংবিধানে সাম্য ও ন্যায়বিচারের ধারণাগুলি আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়টি একেবারেই শিক্ষার বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষার অধিকার আইনের (২০০৯) প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য ও এই আইন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ জানা যাবে এই অধ্যায়ে। সমসাময়িক শিক্ষায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ICT বা তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তি। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকেই অনেকটা কার্যকরী করে তোলা যায় যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণের ধারণা তৈরি হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষকেরা শিখবেন কীভাবে শ্রেণিকক্ষে সমস্ত রকম অসক্ষমতা সত্ত্বেও সকলকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর পরবর্তী অধ্যায়ে পুরুষ ও মহিলা সম্পর্কে সামাজিক নির্মাণকরণের (Social construction of Masculinity and Feminity) ধারণা আলোচিত হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ও অত্যন্ত জরুরি কিছু ধারণা আলোচিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে আগত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা, শান্তির জন্য শিক্ষা, ভাষা, সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষা, যুব সমাজের সংস্কৃতিবোধ ও অন্তর্জালের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষক-প্রশিক্ষকেরা অবহিত হবেন এই দুটি অধ্যায়ে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গবেষণাধর্মী কাজের ফসল এই পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ডি.এল.এড. পাঠক্রমের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকে এই ডিরেক্টরেট সরকারি নির্দেশনামা 712-Edn (cs)/8T – ১৭/৭৯ তারিখ ২১.০৫.১৯৮০ সেকসন (iii), (iv), (viii) ও (x) অনুসারে ‘Development of Teaching Clarity’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রকল্পের শুরুতেই সামগ্রিক পাঠক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে কর্মশালা শুরু করা হয়েছিল। যেমন — (১) ব্যাবহারিক বিষয়সমূহ (P-1, P-2, P-3, P-4) ও তার আদান-প্রদান কার্যবিধি — এই নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত। (২) পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহ (Core Curriculum CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05) নিয়ে একইভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, উত্তর চব্বিশ পরগনাতে ২৪ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ২৮ আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত। (৩) এরপর বিষয়জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি (CPS-1, CPS-2, CPS-3, CPS-4) নিয়ে কর্মশালা হয় ডায়েট, হাওড়াতে ৩১ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

এই প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকে যে কথাগুলি জোরালোভাবে উঠে এসেছিল, তা হল— ‘ডি.এল.এড-এর জন্য সঠিক শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী প্রয়োজন’।

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই কোনোরকম সময় নষ্ট না করে ডায়েট, বর্ধমানে জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল কাজ, যার নাম ছিল — 'Instructional Material Design (development of teaching clarity) for Teacher Preparation'. এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়েট, হুগলিতে। এরপর কাজগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা, সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ চলে দু-দফায় — ১০ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ডায়েট, পুরুলিয়াতে ও ২১ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে।

এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হল, তা শিক্ষক-শিক্ষণ আদৌ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে তা যাচাই করে দেখা ভীষণ জরুরি ছিল। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পাইলট টেস্টিং-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাইলট টেস্টিং-এর কার্যকরী কৃৎকৌশল নির্মাণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, হাওড়াতে ২ মে ২০১৬ থেকে ৪ মে ২০১৬ তারিখে। এরপর পাইলট টেস্টিং-এর অংশ হিসেবে একমাস ধরে রাজ্যের চারটি ডায়েটে— কোচবিহার, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলার প্রায় সকল ডায়েটে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এই শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পাইলট টেস্টিং সার্থকতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সবশেষে পরীক্ষিত শিখন সামগ্রী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর কাছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয় ডায়েট, হুগলির তত্ত্বাবধানে ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশনাকালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে যাঁদের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়, তাঁরা হলেন — শ্রী মিলন কুমার সাহা, অধ্যক্ষ, ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুর, ড. স্বপ্না ঘোষ, অধ্যক্ষা, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী তপন কুমার মল্লিক, অধ্যক্ষ, ডায়েট, বর্ধমান, ড. সন্ধ্যা দাস বসু, অধ্যক্ষা, ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং শ্রী পরিতোষ প্রামাণিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, পুরুলিয়া।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়— অধ্যক্ষ, ডায়েট হুগলি, ড. কে. এ. সাদাত ও অধ্যক্ষ, ডায়েট, হাওড়া, ড. বিশ্বরঞ্জন মান্নাকে— যাঁরা শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও পাইলট টেস্টিং-এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নীলাঞ্জন বালা, রিসার্চ ফেলো, এস.সি.ই.আর.টি-কে — এই প্রকল্প শুরু থেকেই যার পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও ভাবনায় একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়ে আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।।

এই পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন — ড. মিনতি সাহা, ড. অজিত মণ্ডল, ড. শান্তনু সেন, রত্না বিশ্বাস।

আশা করি যাঁদের উদ্দেশ্যে এই কার্যভার নেওয়া হয়েছে তাঁরা উপকৃত হবেন এবং সেই শিক্ষক-প্রশিক্ষকেরা তাঁদের পাঠদান ও নির্দেশনা সার্থকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন।

ড. ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

সূচিপত্র (Content)

অধ্যায় - ১ : ভারত : স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা (India : The Freedom Struggle and Independence) ১

অধ্যায় - ২ : ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রের কাঠামো (প্রাক্-স্বাধীন ও স্বাধীনোত্তর কাল) [Structure of Indian Nation State (Pre and Post Independence)] ৫৮

অধ্যায় - ৩ : ভারতের সংবিধান ও শিক্ষা (Constitution of India and Education) ৮৩

অধ্যায় - ৪ : শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Education Act, 2009) ৯৬

অধ্যায় - ৫ : শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি (ICT in Education) ১০৮

অধ্যায় - ৬ : অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষা (Inclusive Education) ১২৮

অধ্যায় - ৭ : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (Children with Special Needs) ১৪৬

অধ্যায় - ৮ : লিঙ্গ, বিদ্যালয় এবং সমাজ (Gender, School and Society) ১৬৮

অধ্যায় - ৯ : সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের বিষয়সমূহ - ১ (Contemporary Indian Issues - 1) ১৭৬

অধ্যায় - ১০ : সমসাময়িক ভারতীয় সামাজিক ঘটনাবলি - ২ (Contemporary Indian Issues - 2) ১৮৮

অধ্যায় ১

ভারত : স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা (INDIA : THE FREEDOM STRUGGLE AND INDEPENDENCE)

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১.২ ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন (Impact of colonialism and anti-colonial struggle)
১.৩ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় শিক্ষা (Education in Pre Independence India)
১.৪ স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা (Education in Post Independence India)
১.৫ সারাংশ (Summary)
১.৬ অনুশীলনী (Unit end exercise)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

ভারতবর্ষ একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ দেশ যেখানে প্রাচীনকাল থেকে বৈদেশিক জাতি আগমন করেছে, কোনো জাতি ভারতে এসেছে বাণিজ্য করতে, কেউ সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। ইউরোপীয় বণিকরা প্রথমে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ১৪৯৮ সালে পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার নির্দেশিত পথে ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন শুরু হয়। ভারতে মূলত ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করলেও ফরাসি, পোর্তুগিজ, ডাচ প্রভৃতি জাতিও উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। যদিও শেষপর্যন্ত ইংরেজদের উপনিবেশ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্যিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য ক্রমশ রাজনৈতিক দিকে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। মোটামুটিভাবে বলা যায় ১৭৫৭ খ্রি: পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা বণিকের রূপ পালটে আস্তে আস্তে রাজদণ্ড হাতে নিতে শুরু করে।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করার পর—

- শিক্ষার্থীরা বলতে সক্ষম হবে কারা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।
- শিক্ষার্থীরা উপনিবেশ স্থাপনের কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবকে শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিরোধী আন্দোলন সূচনার যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ব্রিটিশদের ভারতে শিক্ষা বিস্তারের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনোত্তরকালের বিভিন্ন শিক্ষানীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১.২ ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন (Impact of Colonialism and Anti-colonial Struggle)

ভারতে প্রথম দক্ষিণ ভারত ও বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই দুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত তাদের অধীনে আসে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন থেকে ভারতবর্ষে বণিকের মানদণ্ড থেকে শাসকের রাজদণ্ড হাতে নেয় তখন থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষকে তারা সবদিক থেকেই উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। যার প্রভাব ভারতবর্ষের সমস্ত দিকে যেমন— শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা (Colonial Education System) : বিদেশ থেকে আগত শাসকগোষ্ঠী উপনিবেশ ব্যবস্থাকে শক্তিশালীভাবে কায়েম করতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক রূপ দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থাকে স্থায়ী করতে গেলে বা যে পরিকল্পনা করলে ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা বজায় থাকবে তাই তারা করেছিল। সেই কারণে তারা ভারতবাসীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। আমরা দেখতে পাই যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অভাব, নারীশিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতার ব্যাপক বৃদ্ধি। অগণিত জনগণকে অশিক্ষিত রেখে তাদের প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। ফলে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দরিদ্র উপনিবেশবাসীদের শ্রম স্বল্পমূল্যে ব্যবহার করে নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করাই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্য।

এই ধরনের শোষণব্যবস্থাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। যে-কোনো শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মানবশক্তি দরকার। এই মানবশক্তির আমদানি বিলেত থেকে করতে গেলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই উপনিবেশ থেকেই যাতে শাসন এবং শোষণের জন্য মানবশক্তি পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ভারতবর্ষের মানবশক্তিকে যে ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন, তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল ইংরেজদের দেওয়া ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা।

- **এই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :**

(১) শিক্ষার লক্ষ্য :- ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল আমলাগোষ্ঠী তৈরি করা।

(২) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি বিদ্যাকে শিক্ষায় গুরুত্ব না দেওয়া।

(৩) ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শাসকগণের সন্তুষ্টি আনয়ন।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা।

(৫) মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি ভাষার প্রতি গুরুত্ব এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বত্র ইংরেজিকে গ্রাহ্য করা।

(৬) ইংরেজ অফিসের কর্মচারী হওয়া এবং উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করা এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ফলাফল।

(৭) শিক্ষা চেতনার পথ রুদ্ধ করে ইংরেজ জাতি ও কৃষ্টির প্রতি সপ্রশংস মনোভাব সৃষ্টি।

(৮) শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতনতার বদলে দাসত্ব সৃষ্টি করা।

(৯) উপনিবেশের দরিদ্র পিতামাতার উপার্জন থেকে শিক্ষার ব্যয় বহন করা।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন দেখা যায়—

- এই সময়ে ভারতের কাঁচামাল ইংল্যান্ডে না পাঠিয়ে এবং ইংল্যান্ড থেকে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য ভারতে না নিয়ে এসে, ভারতেই কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।
- কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দেবার জন্য আধুনিক রাস্তাঘাট, জলপথ এবং রেলপথ তৈরি হল।
- পাটকল এবং বস্ত্রকল তৈরি করতে হল যাতে ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থা বজায় থাকে।

- নিজেদের স্বার্থের জন্যই ইংরেজরা ভারতে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করল।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে শিক্ষার সমস্যা সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক শাসনকে স্থায়ী করার চেষ্টা করল।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব (Impact of Colonial Education System) :

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) ইতিবাচক প্রভাব

(খ) নেতিবাচক প্রভাব

(গ) ঔপনিবেশিকতা বিরোধিতার সূচনা।

(ক) ইতিবাচক প্রভাব : ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাবগুলি হল—

১. প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার।

২. শিক্ষক-শিক্ষণ, বৃত্তি-কারিগরি শিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রচলন।

৩. মেধা-বৃত্তি চালু করা।

৪. সুগঠিত শিক্ষা বিভাগ এবং পরিবর্তন ব্যবস্থার সূচনা হয়।

৫. জনসাধারণকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা।

৬. শিক্ষায় পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করা এবং কমিশনের ইতিবাচক সুপারিশকে কার্যকরী করা।

(খ) নেতিবাচক প্রভাব : ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাবগুলি হল—

(১) প্রয়োজন সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

(২) নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

(৩) ভারতবাসীদের সম্পদ ভারতীয়দের শিক্ষার খাতে ব্যয় না করে, নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করেছে।

(৪) চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি।

(৫) **'চুঁইয়ে পড়া নীতি' ('downward filtration theory')** যা গণশিক্ষা প্রসারে বাধাস্বরূপ ছিল।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষাকে দুর্বল রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান।

(৭) ইংরেজি সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি।

(গ) ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিরোধী আন্দোলন বা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা (Introduction of National Education Movement)

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় গণশিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে অবহেলা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার জন্য চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল, যদিও তা ছিল জাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে। উনবিংশ শতকের শেষদিকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। যাকে বলা হয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।

যদিও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এই সময় ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটায় সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছিল। সমাজজীবনে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটান রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ নেতা। এদেশে সমাজসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা প্রভৃতি দূর করে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে এদেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন এই মহান ব্যক্তিরা।

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণের মধ্য দিয়ে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল ভারতবাসী। কিন্তু ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে চাইলে দেশীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উড-এর ডেসপ্যাচে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হল— সরকারি শিক্ষার লক্ষ্য হবে শাসনকার্য পরিচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সহায়তা করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য সরকারি কর্মচারী তৈরি করা, যা ভারতবাসীর মনে তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছিল। সরকারি এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথাগত শিক্ষা রূপায়ণ, নারী-শিক্ষার বিস্তার, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপক্ষে যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তার মধ্যেই ভবিষ্যৎ শিক্ষা আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল।

উড-এর ডেসপ্যাচে গণশিক্ষার বিষয়টিকে আংশিক স্বীকৃতি দিলেও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ নেতাগণ। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষা দান এবং জনশিক্ষার সার্বিক রূপায়ণ। ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজ সরকার শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ বেসরকারি উদ্যোগে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে মাতৃভাষা চর্চা ও জাতীয় ইতিহাস পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধক পরিবেশ তৈরি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন জায়গাতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বোলপুরে আশ্রম স্থাপন ও ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবে দেশীয় শিক্ষার প্রতি গভীর আস্থার মনোভাব গড়ে ওঠে।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন যে শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন তা জাতীয় শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। ভারতবাসী যে শিক্ষা-সংস্কারের কথা আশা করেছিল তা কার্জনের শিক্ষা পরিকল্পনায় পাওয়া যায় না। এই সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদী আন্দোলনের ডাক দেয়। কার্জন এই সময় রাজনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করলে ইংরেজ সরকারের প্রতি ঘৃণা চরম আকার ধারণ করে। কার্জনের শিক্ষাসংকোচনের নীতি এবং বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা ভারতের জাতীয় নেতাদের এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষদের আন্দোলনমুখী করে তোলে। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যা স্বদেশি আন্দোলনের রূপ নেয়। স্কুল-কলেজ বয়কটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে অনেক স্বদেশি বিদ্যালয় তৈরি হয়ে গেছে। সেখানে জাতীয় লক্ষ্যকে মাথায় রেখে শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। ১৯০৬ খ্রিঃ জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠন করা হয় এবং এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করার জন্য কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়—

(I) প্রথম পর্যায় (১৯০৬-১০)

(II) দ্বিতীয় পর্যায় (১৯১১-১৯২২)

(III) তৃতীয় পর্যায় (১৯৩০-১৯৩৮)

(I) প্রথম পর্যায় : জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে পাথেয় করে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের নেতৃত্বে বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ৫১টি জাতীয় উচ্চবিদ্যালয় এবং যাদবপুরে কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সঙ্গে করে হয়েছিল। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেমে গেলে প্রথম পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন থেমে যায়। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের ভরসা কম ছিল। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, অর্থের অভাব, শিক্ষার্থীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য প্রথম পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সফলতা লাভ করতে পারেনি। এছাড়াও আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পিছনে ছিল উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব, আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া, মুসলিম সম্প্রদায়ের অসহযোগিতা।

(II) দ্বিতীয় পর্যায় : ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২০-১৯২২ খ্রিস্টাব্দ অবধি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে ধরা হয় । ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার চেমসফোর্ড রিপোর্ট অনুসারে শাসনসংস্কার বিল পাশ করলেও, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান করায় জনমানসে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজ বর্জন করে এবং এই আন্দোলন পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া বা জাতীয় মুসলিম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সারা দেশে ১৩৪৯টি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোলপুরের আশ্রমটি রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিচিতি লাভ করে। দেশের সর্বত্র মেডিকেল কলেজ, আর্ট ও টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এই পর্যায়েই হয়েছিল।

(III) তৃতীয় পর্যায় : আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (১৯৩০-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) অবধি সময়কালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে লালা লাজপত রায় ঘোষণা করেন, জাতীয় সরকার ছাড়া জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। ইংরেজ শাসন বজায় রেখে শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের পরিবর্তে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হল। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে জাতীয় সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি উদ্যোগে স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ধায় একটি পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়। এইভাবে লক্ষ করা যায়, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের চরম পরিণত অবস্থায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

- **ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিরোধী আন্দোলন বা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে প্রভাব (Impact of National Education Movement)**

ভারতীয়দের মনোজগতে এই শিক্ষা আন্দোলন খুবই মূল্যবান। এই আন্দোলনের ফলে—

(ক) মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা এবং ভারতীয় ভাষাগুলি চর্চা করার চেতনা এবং প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় ভাষা চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(গ) বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঘটে।

(ঙ) শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মানসিকতা তৈরি হয়।

(চ) কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটে।

(ছ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ঘটে।

(জ) শিক্ষায় স্বাধীনতার আদর্শ গুরুত্ব লাভ করে।

(ঝ) গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

(ঞ) বুনিয়াদি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

(ট) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ঘটে।

সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল দিকের উন্নতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন চরমভাবে অনুভূত হয়।

অগ্রগতি নিরীক্ষা (Check Your Progress)

১. **নীচের কোন্‌টি ঔপনিবেশিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নয়?**

(ক) আর্থিক শোষণ

(খ) গণসাক্ষরতা

(গ) সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করা

(ঘ) শিক্ষার মাধ্যম হল শাসকের ভাষা।

২. **ঔপনিবেশিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল—**

(ক) শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

(খ) মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রসার

(গ) বৃত্তি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রভাব

(ঘ) উপরের সবগুলি।

৩. **ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলনকে ক-টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে?**

(ক) দুটি পর্যায়

(খ) তিনটি পর্যায়

(গ) চারটি পর্যায়

(ঘ) উপরের কোনোটিই নয়।

১.৩ প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় শিক্ষা (Education in Pre Independence India)

ভূমিকা (Introduction): ইংরেজদের ভারতে আগমনের সাথে সাথে মিশনারিদের ভারতে আগমন শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন করেছিল। মিশনারিরা ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারেও সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে আদি মিশনারিদের অবদানকেও স্মরণ করতে হয়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান মিশনারিরাও বাংলাতে শিক্ষার প্রভূত

বিস্তার ঘটিয়েছিল। এক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কার্যকলাপকে স্মরণ করতেই হয়। এরপর ব্রিটিশরা শিক্ষার দায়িত্ব নিতে শুরু করলেন এবং ১৮১৩ সালে সনদ আইন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত নানারকম শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যা ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রকম শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই এককটিতে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার শুরু হয় ইংরেজদের আমল থেকে। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়— প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তরকালের শিক্ষা। আলোচনার সুবিধার্থে এ সম্পর্কে দুটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল।

প্রাক্-স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা (Education in Pre-Independence India)

স্বাধীনতার অনতিপূর্বের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে ঠিক কোন্ সময়কে বোঝায় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও যখন থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করেছে সেই সময়কাল থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থা একটি নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোনো বিশেষ সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা আলোচনা করতে গেলে তার পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে না। তাই প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে আমাদের আলোচনা ব্রিটিশ যুগ থেকে শুরু হচ্ছে।

১.৩.১ আদি-খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান [Contribution of Early Christian Missionaries (১৫০০-১৭৫৭)]

আমরা প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ করলে দেখতে পাই ভারতের অফুরন্ত সম্পদ বিদেশিদের প্রলুব্ধ করেছে। এইসব বিদেশিরা কেউ রাজ্য স্থাপন করতে এসেছিল, আবার কেউ বাণিজ্য করতে এসেছিল। প্রথম এদেশে ইউরোপ থেকে পোর্তুগিজরা আসে। পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-Da-Gama) উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে কালিকটের উপকূলে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করে। বণিকদের সঙ্গে মিশনারিরা এদেশে এলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। মিশনারিদের আসার কারণই হচ্ছে ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। এই সময় মিশনারিরা তাদের অনুগামী তৈরি করার জন্য ভারতে শিক্ষাবিস্তার শুরু করেন। এবং তাদের উদ্যোগে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়।

- **বিভিন্ন দেশের মিশনারিদের অবদান**

পোর্তুগিজদের অবদান :

ভারতের আধুনিক শিক্ষাধারার প্রথম প্রবর্তক পোর্তুগিজ মিশনারি সম্প্রদায়। পোর্তুগিজ মিশনারিদের মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার (St. Francis Xavier) ও রবার্ট-ডি-নোবিলি (Roberto-de-Nobili) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এঁরা ভারতে আসেন। সেন্ট জেভিয়ারের নাম এখনও ভারতে কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছে।

পোর্তুগিজ মিশনারিদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) মিশন ও গির্জা সংলগ্ন প্রাথমিক পোর্তুগিজ ও ল্যাটিন স্কুল।

(২) ভারতীয় অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য প্রাথমিক স্কুল যেখানে কৃষি ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

(৩) উচ্চ শিক্ষার জন্য জেসুইট কলেজ।

(৪) ধর্মশিক্ষা ও পাদরি তৈরির সেমিনারি।

এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল লাতিন, তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, পোর্তুগিজ ব্যাকরণ, সংগীত প্রভৃতি। এখানে মনোবিজ্ঞানকে অনুসরণ না করে মধ্যযুগীয় শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও পোর্তুগিজদের ভাবনাচিন্তায় ভারতীয়দের উদ্‌বুদ্ধ করা।

পোর্তুগিজরাই ভারতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৫৬ খ্রিঃ গোয়াতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এছাড়াও এদের আরও চারটি ছাপাখানা ছিল। ভারতে পোর্তুগিজ শক্তির পতনের ফলে পোর্তুগিজ মিশনারিদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। সেই যুগের কয়েকটি কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুনাম অর্জন করেছিল। পোর্তুগিজরা নিজেদের উপনিবেশ ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রশাসিত অঞ্চলে শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার করে। তারা সম্রাট আকবরের ইবাদতখানায়ও ধর্মালোচনার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতীয় ও পোর্তুগিজ ভাষা মিলে একটি মিশ্র ভাষা তৈরি হয়, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হয়েছিল।

ফরাসিদের অবদান :

ফরাসি বাণিজ্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং তাদের কর্মধারা অব্যাহত থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত। চন্দননগর, পণ্ডিচেরি, মাহে, ইয়ানন, কারিকল প্রভৃতি স্থানে ফরাসি কুঠি স্থাপিত হয়। সেখানে তারা বিদ্যালয় স্থাপন করে। কুঠিগুলিকে কেন্দ্র করে ফরাসি ক্যাথোলিক মিশনারিরা তাদের শিক্ষা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ফরাসি ভাষা ছাড়াও দেশীয় শিক্ষকদের আঞ্চলিক ভাষায়ও পাঠ দেওয়া হত। তারা তাদের শাসিত অঞ্চলের বাইরেও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন ও প্রথমাবস্থায় ফরাসি পাদরিরা বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, বই প্রভৃতি বিতরণ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি প্রলোভিত করতেন। অ-খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের এই বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক আকাঙ্খাকে ফরাসিরা অনেক সময় অগ্রাধিকার দেওয়ায় তাদের শিক্ষার প্রয়াস ব্যাহত হয়। ইংরেজদের কাছে পরাজিত হবার পর তাদের শিক্ষা প্রয়াসের অবসান ঘটে। কেবলমাত্র কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফরাসি ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছিল।

দিনেমারদের অবদান :

দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরের কাছে ত্রাঙ্কুবারে (Tranquebar) এবং কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে সপ্তদশ শতকে দিনেমারদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বাণিজ্যিক প্রসারতা তাদের বিশেষ ছিল না এবং রাজনৈতিক আকাঙ্খাও তাঁদের ছিল কম। তাঁরা তাদের ব্যাবসা কেন্দ্রগুলি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেন। দিনেমাররা শিক্ষা প্রচার ও ধর্মপ্রচারের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। দিনেমাররা প্রোটেস্টান্ট হওয়ায় প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী ইংরেজরা তাদের কাজে সহযোগিতা করেছিল। ইংল্যান্ডে খ্রিস্টান জ্ঞান প্রচারক সমিতি [Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK)] দিনেমারদের আর্থিক সাহায্য দিতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদের সাহায্য করেছে।

দিনেমার মিশনারিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জিগেনলগ (Ziegenbalg)। তিনি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ুতে একটি ছাপাখানা গড়ে তোলেন। তিনি তামিল ব্যাকরণ এবং তামিল ভাষায় বাইবেল-এর অনুবাদ করেন। মাদ্রাজে দুটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও ত্রিবাঙ্কুরে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র তিনি স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৭১৯) যাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন সুলজ (Schultz), সুয়ার্জে (Seuartz), কারন্যান্ডার (Kernander)। সুলজ একখানি তেলেগু অভিধান ও তেলেগু ভাষায় বাইবেল রচনা করেন। তিনি পুরোনো স্কুলগুলিকে নতুন করে সংগঠিত করেন ও নতুন দুটি স্কুল তৈরি করেন। কারন্যান্ডার ভারতীয়দের জন্য স্কুল স্থাপন করেন। এদের সবার সমবেত প্রচেষ্টায় ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভের আমন্ত্রণে কারন্যাণ্ডার বাংলাদেশে আসেন এবং কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ইংরেজদের অবদান

১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে পরিচালন সভা ভারতে কোম্পানির কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতীয় প্রচারক সংগ্রহ করতে। কয়েকজন ধর্মান্তরিত ভারতীয়কে এ বিষয়ে ধর্মীয় শিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের সনদে কোর্ট-এর ডাইরেকটরেরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য জানিয়ে বাণিজ্য জাহাজে মিশনারিদের পাঠাবার নির্দেশ জারি করে। তবে ১৬৯৮ খ্রিঃ কোম্পানির সনদ নবীকরণের পর থেকে মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের কাজ ত্বরান্বিত হয়। এই সনদে সে বিষয়গুলি ছাড়াও কয়েকটি দাতব্য স্কুল স্থাপন করার কথাও বলা হয়। বস্তুত এই নির্দেশের মধ্যেই ছিল ইংরেজ মিশনারিদের শিক্ষা প্রয়াসের বাস্তব ভিত্তি।

ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। যেমন— মাদ্রাজে সেন্ট মেরির স্কুল, বোম্বাইতে রেভারেন্ড রিচার্ড কোবে স্কুল, কলকাতায় রেভারেন্ড বেলানি স্কুল ইত্যাদি। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় সোসাইটি ফর প্রমোশন অফ ইন্ডিয়ান (Society for Promotion of Indian's)। এরা শিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। মিশনারিদের ধর্ম ও শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংল্যান্ডে কোম্পানির পরিচালক সভা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। ভাষাগত বাধা অপসারণে কোম্পানির স্বার্থ জড়িত ছিল বলেই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টায় আর্থিক সাহায্য দিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে কোম্পানির শিক্ষানীতি বিচারে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোম্পানি কখনও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। মিশনারিদের সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে।

আদিপর্বের মিশনারি প্রচেষ্টার গুরুত্ব

আদিপর্বের মিশনারি প্রচেষ্টার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। গণশিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিল। দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করার মাধ্যমে মাতৃভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ বই রচনা করা হয়েছিল। ছাপাখানায় মাতৃভাষাতেই বই প্রকাশ করা হয়। এই সময় নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেমন— অবৈতনিক বিদ্যালয়, পুরুষ ও মহিলাদের আবাসিক বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়, ধর্মীয় মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি।

গণশিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের পথে ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। আদিপর্বের মিশনারিরা সাধারণত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বজায় রেখে তাকে আধুনিক করার চেষ্টা করেছিল। (I) বিদ্যালয়ে আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা, (II) ছাপাবই পড়ার ব্যবস্থা (III) একাধিক শিক্ষক নিয়োগ (IV) ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা (V) সময় তালিকা তৈরি করা (VI) সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণ করা (VII) নানা আধুনিক বিষয় যেমন— ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য শিক্ষা, বৃত্তিমুখী বিষয় পড়ানো ইত্যাদি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায় আদি মিশনারিরা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছিল। বহু আধুনিক উপাদান সংযোজন করে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। তাই সেদিক থেকে আদিপর্বের মিশনারিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলা যায়।

১.৩.২ উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান (Contribution of Christian Missionaries during 19th Century)

পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মিশনারিদের যে বিচ্ছেদ পর্ব শুরু হয়েছিল তার সমাধি ঘটেছিল উনিশ শতকের শুরুতেই। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে পরিচালক সভার ঘোষণায় উদার নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের কথা বলা হয়। একদিকে সরকারি সাহায্যে প্রাচীন শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার ঘোষণা ও লর্ড উইটোর ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের মন্তব্য এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যপন্থী উভয়েরই শিক্ষায় সরকারি হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের প্রস্তাব ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে ভারতে মিশনারিদের অবাধ প্রবেশ ও কর্মোদ্যোগ স্বীকার করা হল এবং শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের নীতি ঘোষিত হল। এইভাবে ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ দুটিকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের মিশনারি শিক্ষা প্রচেষ্টা চলতে থাকল।

১৮১৩ সালের সনদ আইনে মিশনারিরা কোম্পানির এলাকায় ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা পান এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্র এলাহাবাদ থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারিরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সময়ে বাংলায় যেসব মিশনারি সংস্থা এদেশে শিক্ষাবিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল—

(১) লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (১৮১০-১৮১৮)

(২) চার্চ মিশনারি সোসাইটি ১৮০৭

(৩) স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি

(১) লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (London Missionary Society) :

লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভারেন্ড মে (Rev. May) ১৮১০ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি চুঁচুড়া ও তার আশেপাশে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুলগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল তিন হাজার। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মে সাহেব একটি নর্মাল স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) চার্চ মিশনারি সোসাইটি (Church Missionary Society) :

কলকাতাতে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটির মাধ্যমে এই মিশনারি সোসাইটির কাজকর্মের সূচনা হয়। ক্যাপ্টেন স্টিউ (Stew) ১৮১৮ খ্রিঃ বর্ধমানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বাংলায় বিভিন্ন স্থানে ১০৭টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৮৫ সালে সেগুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১০ হাজার। ১৮২০ সালে শিবপুরে উচ্চশিক্ষার জন্য Bishop's College প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি (Scottish Missionary Society) :

এই সময়ের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ। এই সময়ে মিশনারিদের ধর্মোদ্যোগের পুরোভাগে ছিলেন তিনি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্থাপন করেছিলেন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশন। এটি বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ। ডাফ সাহেব নিম্নশ্রেণির পরিবর্তে উচ্চশ্রেণির মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দুধর্মকে খর্ব করে এ দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন। নারীশিক্ষা প্রসারেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তা ছাড়া কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতের নানা স্থানে, যেমন—মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নাগাপট্টমে সেন্ট জোসেফ কলেজ, আগ্রায় সেন্ট জোনস কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মিশন' নামে একটি বইও লেখেন।

১.৩.৩ শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কার্যকলাপ (Activities of Serampure Trio)

শ্রীরামপুরে দিনেমার কুঠিকে কেন্দ্র করে তিনজন মিশনারি একত্রে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন—উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং জসুয়া মার্শম্যান। এঁরা শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে পরিচিত। কেরি ছিলেন ধর্মপ্রচারক, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণশিল্পী এবং মার্শম্যান ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর উদ্যোগে সুপরিকল্পিতভাবে, বাংলায় শিক্ষা বিস্তার ও ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু হয়। এঁদের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে একটি দেশীয় বিদ্যালয়, যশোরে ৪টি, দিনাজপুরে ১টি, কাটোয়ায় ১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হত দেশীয় ব্যাকরণ, প্রাথমিক গণনা ও গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাথমিক ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নীতি শিক্ষা।

শিক্ষাবিস্তারে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান—

- **মুদ্রণশিল্প প্রবর্তন ও পুস্তক মুদ্রণ :** দেশীয় ভাষায় বাইবেল ছেপে বিতরণ করা ছিল ছাপাখানা তৈরির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে অনেক পাঠ্যপুস্তকও মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞান, ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানান ধরনের বই মিশনের প্রচেষ্টায় মুদ্রিত হয়। মিশনারিরা সংস্কৃত শিখে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও কেরির প্রেরণায় ও তত্ত্বাবধানে রচিত ও প্রকাশিত হল রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' — 'জ্ঞানোদয়' ও 'লিপিমালা'। গোলোক শর্মার 'হিতোপদেশ', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন উপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বয়স চরিতম্' এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলি', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রভৃতি।

শিক্ষা সংগঠন ও শিক্ষা কমিটি :

মিশনের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাতে ছিলেন উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জসুয়া মার্শম্যান। এই কমিটি বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শক নিয়োগ, পুস্তক ও আসবাবপত্র সরবরাহ প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব বহন করতেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি : উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির প্রতিও মিশন যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। Andrew Bell ইংল্যান্ডে যে মনিটর প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, মিশন সেই পদ্ধতিটি নিজেদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করতেন।

শিক্ষক শিক্ষণ : ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য মিশন একটি নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করে। নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার আগে এই নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে আসতে হত।

পরিদর্শন ব্যবস্থা : নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্বে পরিদর্শক সেই গ্রামে যেতেন এবং বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন করতেন। পরিদর্শক মিশনের বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানও করতেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই মিশনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৯টি ও সেখানে ছাত্রসংখ্যা হয় ১৭৬৫ জন। এই বিদ্যালয়গুলি শ্রীরামপুর, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, যশোর, বীরভূম, দিনাজপুর, মুরশিদাবাদ এমনকী আজমির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নারীশিক্ষা : নারীশিক্ষার বিস্তারে শ্রীরামপুর মিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়াতে মিশনের প্রচেষ্টাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই থেকে ধীরে ধীরে এদেশে নারীশিক্ষার প্রসার হতে শুরু হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি এবং মোট ছাত্রীসংখ্যা হয় ৪৮৬ জন। শ্রীরামপুর, বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোরে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন বাংলার বাইরেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। এলাহাবাদ, বেনারস এবং ব্রহ্মদেশে একটি করে বালিকা বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া গেছে।

উচ্চশিক্ষা এবং শ্রীরামপুর কলেজ : ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের পাঠক্রমে ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পত্রপত্রিকা প্রকাশ : ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁরা 'দিক্‌দর্শন' প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মান্থলি সারকুলার লেটার', যার পরবর্তী নাম 'The Friend of India'।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করতে গেলে ভারতের অন্যান্য জায়গায় যেমন **বোম্বাই মিশনারিদের** শিক্ষার উদ্যোগ এবং **মাদ্রাজ মিশনারিদের** শিক্ষা বিস্তারের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলার মতো বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। স্কটিশ মিশনের ড. উইলসন এই সময় বোম্বাইতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। মাদ্রাজে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মি. হতা ৯টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া আরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৩.৪ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষা (Education in Charter Act of 1813)

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল। ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এই সনদ আইনের ১৩ ও ৪৩ নম্বর ধারা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৩নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রজাদের স্বার্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি এবং সেইজন্য কার্যকরী জ্ঞান প্রচার ও নৈতিক মান উন্নয়নের দায়িত্ব ইংল্যান্ডকে গ্রহণ করতে হবে। এইসব কাজ করার জন্য শিক্ষা প্রবর্তনে ইচ্ছুক যে-কোনো ব্যক্তি ভারতে যেতে ও থাকতে পারবে এবং তাদের সবরকম সুবিধা দেওয়া হবে। মিশনারিদের কথা প্রত্যক্ষ করে এই ধারায় বলা না হলেও এই ধারা অনুসরণ করে মিশনারিরা ব্রিটিশ ভারতে এসে শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের যে দাবি বহুদিন যাবৎ করে আসছিল সেই দাবি পূরণ হল।

৪৩ নম্বর ধারায় যা বলা হয়েছে

- ব্রিটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বিধান এবং পণ্ডিতদের উৎসাহ দান করার জন্য কোম্পানি অর্থব্যয় করবে।
- এদেশে অধিবাসীদের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানি অর্থ ব্যয় করবে। সব মিলিয়ে কোম্পানি খরচ করবে বছরে ১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই ধারায় ধর্ম, নৈতিকতা, ও শিক্ষার মান পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের কথা ঘোষণা হল।

কিন্তু এই প্রস্তাবনায় নির্দিষ্ট করে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন্ শিক্ষায় টাকা ব্যয় হবে তা উল্লেখ করা ছিল না। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের বীজ বপন করা হল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের দ্বন্দ্ব (Oriental-Occidental Controversy)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের মূল কারণ হল ১৮১৩ সালের সনদ আইনে পাশ হওয়া ১ লক্ষ টাকা কোন্ খাতে, প্রাচ্য না পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় হবে তা নিয়ে সনদ আইনে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকা। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ নিয়ে প্রাচ্যবাদীরা বললেন যে সনদে উল্লিখিত সাহিত্য উন্নয়ন বলতে বোঝায় প্রাচীন সাহিত্যের উন্নয়ন এবং দেশীয় পণ্ডিতবর্গ বলতে বোঝায় প্রাচ্য বিদ্যার পণ্ডিতবর্গ। অপরদিকে পাশ্চাত্যপন্থীরা বলেন যে সাহিত্য বলতে বোঝায় একমাত্র ইংরেজি সাহিত্য এবং প্রকৃত শিক্ষিত বলতে বোঝায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের।

মেকলের বক্তব্য ও বেন্টিংক-এর ঘোষণা

যাইহোক শেষ পর্যন্ত মেকলের বক্তব্য এবং বেন্টিংক-এর সিদ্ধান্ত বা ঘোষণার উপর নির্ভর করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। মেকলের চিন্তাধারা এবং বেন্টিংক-এর চিন্তাধারা একসূত্রে বাঁধা হল। মেকলের মন্তব্য বেন্টিংক-এর চিন্তাকে পরিপুষ্ট করল। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঘোষণা করলেন যে, সরকারি অর্থ ইংরেজি শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে।

১.৩.৫ অ্যাডামের রিপোর্ট অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা (State of Indigenous System of education in the early 19th Century India with Special reference of Adam's Report)

অ্যাডামের সমীক্ষা খুব ব্যাপক ছিল এবং তাঁর সুপারিশগুলিও বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিংক তাঁকে এই সমীক্ষার সুযোগ ও দায়িত্ব দেন। এরপর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পর পর দুটি এবং ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় রিপোর্ট অ্যাডাম পেশ করলেন।

অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট : ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, ১ জুলাই অ্যাডাম তাঁর প্রথম বিবরণীটি পেশ করেন। অ্যাডামের প্রথম বিবরণীতে মোটামুটি নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ ছিল:

(১) উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার জনসংখ্যার ব্যাপারে একটি আলোচনা।

(২) দেশীয় পাঠশালাগুলির বিবরণ ও সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতি।

(৩) শিক্ষাবিস্তারে মিশনারিদের উদ্যোগ, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি ও ওই ধরনের কয়েকটি সংস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(৪) নারীশিক্ষা প্রসারে প্রাথমিক উদ্যোগের বিবরণ।

(৫) টোলের শিক্ষা ও পদ্ধতির বিবরণ।

(৬) শ্রীরামপুর কলেজের বিবরণ।

(৭) গারো পাবর্ত্য এলাকার শিক্ষার বিবরণ।

অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট : ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর তার দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করেন।

অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার শিক্ষা পদ্ধতির খুঁটিনাটি তথ্য প্রদত্ত হয়। এই রিপোর্টটি একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ সাতটি বর্গে বিভক্ত। এই রিপোর্টে তিনি দেশীয় পাঠশালাগুলিকে চারটি বর্গে ভাগ করেছেন—

(১) বাংলার পাঠশালা (২) পারসি শেখানোর পাঠশালা (৩) আরবি শেখানোর পাঠশালা (৪) পারসি ও বাংলা শেখানোর পাঠশালা। অ্যাডাম তাঁর বিবরণীতে শুধু পাঠশালা ও মাদ্রাসার কথা বলেননি, সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষকদের সম্পর্কেও নানা আলোচনা করেছেন।

অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট : তৃতীয় রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল। এই বিবরণীতে রয়েছে দুটি অধ্যায়—

(I) প্রথমটিতে তাঁর সমীক্ষার ফলাফল

(II) পরেরটিতে তাঁর মন্তব্য

এই রিপোর্টে বাংলা ও বিহারে শিক্ষাব্যবস্থার একটি ব্যাপক চিত্র দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের প্রথম অংশে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, শ্রীহট্ট ও দক্ষিণ বিহারের পাঁচটি জেলার শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য অ্যাডাম তাঁর নিজস্ব প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন।

দেশজ শিক্ষার পুনর্গঠন ও সংস্কারের জন্য অ্যাডামের সুপারিশ :

তৃতীয় রিপোর্টের শেষ অংশে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য অ্যাডাম কয়েকটি সুপারিশ করেন—

(১) শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি জেলা নির্বাচন ও তার পর্যালোচনা করতে হবে।

(২) নির্ধারিত জেলাগুলি থেকে ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তক বণ্টন করতে হবে এবং তা পড়ার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

(৪) শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয় গৃহ ও সরঞ্জামের উন্নতি ঘটাতে হবে।

(৫) শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় বা Normal School স্থাপন করতে হবে। School ছুটির সময় বছরে একমাস থেকে তিনমাস পর্যন্ত একাধিক ক্রমে চার বছর কালের মধ্যে তাদের শিক্ষণকর্ম শেষ করতে হবে।

(৬) গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল ভালো হলে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে তাদের শিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান তার খোঁজখবরও রাখতে হবে।

(৯) প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে।

তৎকালীন বড়োলাট অকল্যান্ড তাঁর ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখের শিক্ষা বিষয়ক 'মিনিট'-এ অ্যাডামের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। তিনি বললেন— দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত না হলে এধরনের পাঠশালার সংস্কার ও উন্নতি সম্ভব নয়। এইভাবে অ্যাডামের তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট প্রস্তাব পরিকল্পনা সবই নথিভুক্ত রয়ে গেল।

অ্যাডামের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব পড়ে গণশিক্ষার উপর। বহুদিন প্রচলিত একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সংস্কার না করে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। পরিবর্তে নতুন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। সৃষ্টি হল আধুনিক কালের প্রাথমিক শিক্ষার নানা সমস্যা। যেমন— সর্বজনীন শিক্ষা সমস্যা, নিরপেক্ষতার সমস্যা, অপচয় ও অনুন্নয়নের সমস্যা, যার প্রভাব বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রেও রয়েছে।

১.৩.৬ উড-এরডেসপ্যাচ (Wood's Despatch)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের সমাধান হলেও নানা ধরনের সমস্যা থেকে যায়, যেমন— দেশীয় বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনের সমস্যা, ভারতীয় সমস্যা, ভারতীয় ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম সমস্যা, দক্ষকর্মী সম্বন্ধে সরকারের সমস্যা, সরকারি পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানগত সমতা বিধানের সমস্যা, মূল্যায়নের সমস্যা প্রভৃতি।

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক অনুসন্ধান করে লিখিত হল এদেশের সার্বিক শিক্ষাগত প্রথম দলিল। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একেবারে বেসরকারি উদ্যোগে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। হাউস এবং কমন্‌সের একটি নির্বাচিত কমিটির সামনে ড. ডাফ (Duff), স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন (Trevelyan) এবং মি. উইলসন তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যান্য সদস্য হলেন Sir Erohine Perry Marshman, Sir Frederick Halliday প্রমুখ। এঁরা সবাই স্বীকার করেন যে— "ভারতে শিক্ষাবিস্তার হলে সরকারের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, বরং শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ রাজত্বের সহায়ক হবে"। এর ওপর ভিত্তি করে বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের নির্দেশে একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয়। উডের নির্দেশে রচিত হয় বলে এই শিক্ষা দলিল 'উড্‌স ডেসপ্যাচ' (Woods Despatch) নামে পরিচিত।

উদ্দেশ্য (Objectives) : ডেসপ্যাচের পিছনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

- ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।
- এই পাশ্চাত্য শিক্ষা শুধু উচ্চস্তরে বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক হবে তা নয়, এ শিক্ষা ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র গঠনের সহায়ক হবে।
- এই শিক্ষা কোম্পানিকে বিশ্বস্ত ও দক্ষ ভারতীয় সরকারি কর্মচারী সরবরাহ করবে।

এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতবাসী পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের ফলাফল বুঝতে পারবে এবং ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হবে। অপরপক্ষে ইংল্যান্ডের শিল্পের জন্য এদেশ থেকে পাবে কাঁচামাল এবং বিনিময়ে এ দেশেই তার শিল্পজাত সম্পদ বিক্রি করবে।

শিক্ষার বাহন : শিক্ষার বাহন হিসাবে এখানে সুপারিশ করা হয়েছে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষা উভয়ই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা বিভাগ : বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় : ইংরেজি ও উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতা ও বোম্বাই শহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রয়োজন হলে মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা (Grant-in-aid) : দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে সরকার শর্তসাপেক্ষে আর্থিক সাহায্য করবে। শর্তগুলি হল—

(ক) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্থানীয় পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) সরকারি পরিদর্শক থাকবেন এবং পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

(ঘ) ছাত্রদের নিকট থেকে স্বল্প হলেও বেতন নিতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ : শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার ব্যবস্থা : 'চুঁইয়ে পড়া নীতি'কে বাতিল করে সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়। প্রতি জেলায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। যথেষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করা এবং মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন যাতে দ্রুতগতিতে জনশিক্ষার প্রসার ঘটে।

বৃত্তি শিক্ষা : আইন, চিকিৎসা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

অন্যান্য সুপারিশ : (ক) নারীশিক্ষার প্রসারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(খ) মুসলিমদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(গ) উচ্চতর চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এবং নিম্নতম চাকরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সুযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উড-এর দলিলের গুরুত্ব (Importance of Wood's Despatch)

- দলিলটি সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে স্পর্শ করেছিল।
- 'চুঁইয়ে পড়া নীতি'কে বাতিল করে জনশিক্ষার বিস্তারকে প্রশস্ত করেছিল।
- শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার বিস্তারকে সম্ভব করেছিল।
- নিম্নস্তরের শিক্ষাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরিত হয়েছিল।
- নারীশিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, মুসলিমদের শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ করে শিক্ষার চাহিদাকে বাস্তবরূপ দান করেছিল।

সবশেষে বলা যায়, উড-এর দলিল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও ইতিবাচক প্রভাবের দিকটাই বেশি।

১.৩.৭ স্ট্যানলি-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৯) (Stanley's Despatch, 1859)

ইংরেজদের মনে হয় সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হল উড-এর শিক্ষা সংক্রান্ত দলিল। এই সন্দেহ করে ১৮৫৮ খ্রিঃ উড-এর ডেসপ্যাচকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা গ্রহণ করেননি। এই অবস্থায় ভারতের শিক্ষার পক্ষে কোন্ নীতি কার্যকারী হবে এ সম্পর্কে স্ট্যানলি একটি ডেসপ্যাচ রচনা করেন। এটিকেই স্ট্যানলি-এর ডেসপ্যাচ বলে।

সুপারিশসমূহ (Recommendation of Stanley's Despatch)

তিনি উড-এর শিক্ষানীতি চালিয়ে যাবার স্বপক্ষে বলেন এবং তার সঙ্গে আরও কিছু সুপারিশ করেন, তা হল—

- প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।
- জনশিক্ষা প্রসারের জন্য আর্থিক ঘাটতি দূর করার জন্য শিক্ষা কর ধার্য করার প্রস্তাব স্ট্যানলি-এর ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।
- উডের ডেসপ্যাচ বাতিল করার প্রস্তাবের বিরোধিতা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যথার্থই মঙ্গল সাধন করেছিল।

১.৩.৮ প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন (Hunter Commission, ১৮৮২-৮৩)

পটভূমি : উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪) প্রাথমিক ও দেশজ-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে শিক্ষা প্রচেষ্টা শুধু উচ্চশিক্ষা ও সরকারি স্কুল-কলেজগুলিতে অব্যাহত রইল। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় অবনতি দেখা দিল। বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হবে বলেও না হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে মিশনারিরা বাধাপ্রাপ্ত হলেন। সরকারি সাহায্য ও অনুদান সম্পর্কিত ব্যাপারে নানা অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন গঠন হয়।

কমিশন নিয়োগ : ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড রিপন একটি কমিশন গঠন করেন। স্যার হান্টার-এর নেতৃত্বে কমিশনটি গঠিত হয়েছিল। তাই কমিশনের নাম হয় হান্টার কমিশন। কমিশনটির ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মিস্টার হজ গুলাম, শ্রী আনন্দমোহন বসু, শ্রী পি আর মুদালিয়র, বাবু ভূদেব মুখার্জি প্রমুখ।

কমিশনের দায়িত্ব : কমিশনের দায়িত্ব কী হবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

(১) সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কী চিন্তা করছেন?

(২) দেশের জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা কী দাঁড়াবে?

(৩) বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

যাইহোক দীর্ঘ সময় ব্যাপী সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে কমিশন, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২২০টি নীতি সমেত ৮০০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেন।

কমিশনের রিপোর্ট (Report of the Commission)

(১) নীতি :

- কমিশনকে আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আরও উদার হতে হবে।
- নতুন বিদ্যালয় স্থাপনে সরকারকে উৎসাহ দেখানোর কথা বলা হয়।
- আঞ্চলিক প্রশাসনের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়।
- মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার জন্য থাকবে বিশেষ কমিটি।

এই সমস্ত নীতি কার্যকরী করে তুলতে দুটি পদক্ষেপ নিতে হবে—

(ক) শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হ্রাস করতে হবে এবং

(খ) আর্থিক অনুদান সঠিক নীতি অনুযায়ী হবে।

(২) দেশজ শিক্ষা (Indigenous Education) : কমিশন প্রথমে দেশজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায় তা নির্দিষ্ট করেন— কমিশনের মতে ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে 'দেশজ প্রতিষ্ঠান' বলা যেতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন, সম্প্রসারণ, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যাবলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল। ফলে দীর্ঘদিনের অবহেলিত দেশজ শিক্ষা সরকারি সাহায্য লাভের সুযোগ পেল।

(৩) **প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)**

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- **প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন :** একটি জেলা বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড নিজ-নিজ এলাকার স্কুলগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং এজন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে স্কুলবোর্ড গঠন করতে পারে।
- **অর্থনৈতিক ব্যাপারে :**

➢ প্রত্যেকটি জেলা এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রাইমারি শিক্ষার জন্য একটি পৃথক তহবিল (Fund) গঠন করবে।

➢ স্থানীয় ও প্রাদেশিক (Local and Provincial) রাজস্বের মোটা অংশ বা সিংহভাগ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

➢ সরকারকে সরকারি শিক্ষাখাতের সমগ্র অংশের থেকে ১/৩ অংশ, বা স্থানীয় রাজস্বের অর্ধেক বা ১/২ অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। প্রাদেশিক তহবিল থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও নর্ম্যাল স্কুল পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হবে। অনুদানের সুপারিশ করা হবে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।

- **প্রাথমিকের পাঠ্যসূচি :** সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একই পাঠ্যক্রম তৈরি না করে আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে পাঠক্রম তৈরি করার কথা বলা হয়। পাঠ্যক্রমে থাকবে গণিত-পরিমিতি, হিসাবশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা, কৃষ্টি ও শিল্পকলা প্রভৃতি, ব্যাবহারিক বিষয়গুলিও পঠনপাঠনে থাকবে।
- **শিক্ষক-শিক্ষণ :** শিক্ষাদানের উন্নতির কথা মাথায় রেখে কমিশন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপরও জোর দেন। এর জন্য প্রদেশের অন্তর্গত প্রতিটি বিভাগে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

সমালোচনা : কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব রাখলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যায়—

- প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়নি।
- একটি স্বায়ত্তশাসন সংস্থার ওপর শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল অত্যন্ত দুর্বল ফলে তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।
- বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের ১/৩ অংশ প্রাদেশিক সরকার বহন করবেন। কিন্তু টাকা কীভাবে আসবে সে সম্পর্কে কমিশন নীরব থেকেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে হান্টার কমিশনের সুপারিশ

(ক) **পরিচালনা প্রসঙ্গে :** সরকার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেবে না। বেসরকারি প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সংকটের সময় সরকারি অনুদান পাবে। বিভাগীয় পরিচালনায় রাখা হবে পশ্চাদপদ ও দরিদ্র এলাকায় অবস্থিত স্কুলগুলিকে। শিক্ষার মান যথাযথ রাখার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় একটি উন্নতমানের মডেল বা আদর্শ স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের বেতনের হার সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণই স্থির করে দেবেন।

(খ) **পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে :** মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে থাকবে গতানুগতিক সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, যা কলেজে ভরতির জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। তবে এই শিক্ষায় ব্যাবহারিক শিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। তাই, ব্যাবহারিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিশন পাঠক্রমকে দুটি অংশে বিভক্ত করেন— A কোর্স এবং B কোর্স। স্থির হয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষালাভের পর ছাত্ররা তাদের ইচ্ছামতো A কোর্স বা B কোর্স বেছে নিতে পারে। B কোর্সের মধ্যে ছিল ব্যাবহারিক শিক্ষা।

(গ) **মাধ্যম প্রসঙ্গে :** শিক্ষার মাধ্যম ব্যাপারে কমিশন একেবারেই নীরব ছিল। এ থেকে মনে হয় কমিশন ইংরেজি ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চেয়েছিল। নিম্নশ্রেণির ক্ষেত্রে কী মাধ্যম ব্যবহৃত হবে এ ব্যাপারও স্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না।

সমালোচনা :

‘বি’ কোর্সের প্রবর্তন হল বটে তা কার্যকরী হল না, অল্পকিছু সরকারি বিদ্যালয়ে এই কোর্স চালু ছিল। এতে বৃত্তি শিক্ষার নির্দেশ থাকলেও এই কোর্সের বিস্তৃত বিবরণ ছিল না। ভাষার মাধ্যম কী হবে তা স্পষ্ট ছিল না।

উচ্চশিক্ষা : যদিও উচ্চশিক্ষা কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না, তবুও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়—

- উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সরকার ক্রমশ নিজেদের দূরে রাখবে ও বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারের ক্রমশ সরে আসা ও প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বায়ত্তশাসনের হাতে দেওয়ায় সরকারি দায়িত্ব সংকোচনের নীতি প্রকট হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে আমরা প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে পারি—

১) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা।

২) প্রাথমিক শিক্ষার যুগোপযোগী পাঠক্রমের সুপারিশ।

৩) মাধ্যমিক স্তরে দ্বিমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তনের সুপারিশ।

৪) কলেজ স্তরে বিকল্প পাঠক্রমের প্রবর্তনের সুপারিশ।

৫) আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার সুপারিশ।

৬) নারীশিক্ষা, অনগ্রসরদের শিক্ষা প্রবর্তন।

৭) নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম নারীর পৃথক স্কুলে পঠন-পাঠনের সুপারিশ।

৮) ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যপুস্তক রচনার সুপারিশ।

৯) ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধকরণ।

১০) প্রাইভেট কলেজকে সুযোগদানের সুপারিশ।

১১) মাধ্যমিক পাঠক্রমের বাস্তবতা ও উপযোগিতা প্রভৃতি।

১.৩.৯ লর্ড কার্জন-এর শিক্ষানীতি (Curzon’s Education Policy)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন — ১৯০২ : (Indian University Commission - 1902)

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সিমলা সম্মেলনের শিক্ষা সমীক্ষার ভিত্তিতেই লর্ড কার্জন ১৯০২ খিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। ১৯০২ সালের ২৯ জানুয়ারি কার্জন স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে এক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। প্রথমে কোনো ভারতীয় সদস্য আমন্ত্রিত না থাকলেও পরে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

প্রধান সুপারিশ (Main Recommendations)

(১) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

(২) শিক্ষণ ও গবেষণা

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

(৪) পরিদর্শন ও অনুমোদন

(৫) ছাত্রকল্যাণ

(৬) পাঠক্রম ও পরীক্ষাগ্রহণ

(১) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (Establishment of New University)

বাঙ্গালোরে, তিরুচিরাপল্লী, ত্রিবান্দ্রম, আলিগড়, নাগপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে বাতিল করার জন্য কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন। কমিশন মন্তব্য করেন দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই।

(২) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা : কমিশন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধেও মত পোষণ করেন। কারণ, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এখনই শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গঠন করা সম্ভব নয়। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজস্ব অধ্যাপক নিযুক্ত করে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠিত করা যায়। তাই কমিশনের সুপারিশ ছিল প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণ করা এবং কলেজীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করা।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন

- সিনেটের সদস্য সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশ করা দরকার।
- সদস্যদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর, তবে প্রতি বছর পাঁচভাগের এক ভাগ সদস্য যাতে অবসর গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক, পণ্ডিত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী প্রভৃতি যাতে সিনেটে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।
- সিন্ডিকেটে থাকবেন ৯ থেকে ১৫ জন সদস্য।

(৪) পরিদর্শন ও অনুমোদন

- কোনো কলেজকে অনুমোদনদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- অনুমোদিত কলেজের শিক্ষা ও পরিবেশগত মান যাতে ঠিক থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।

(৫) ছাত্রকল্যাণ :

ছাত্রকল্যাণের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা অনুসারে বেতন হার প্রবর্তনের ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

পাঠক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি :

- ইংরেজি ভাষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকবে না।
- স্নাতকোত্তর স্তরে (M.A.) ইংরেজি ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষা বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার মানোন্নয়ন করে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সকে তুলে দিয়ে একেবারে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।
- বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আরও কঠোর করতে হবে।

কমিশনের সমালোচনা : নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ায় ভারতীয়দের মনে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। শিক্ষাসংস্কারের নামে শুধু পরীক্ষা ও পরিচালন ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে দেশবাসী সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং কলেজ অনুমোদন প্রসঙ্গে কড়াকড়ি, দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজের বিলোপসাধন প্রভৃতি দেশবাসী ভালোভাবে নিতে পারেনি।

তবে বহু ব্যাপারে কমিশন প্রশংসনীয় পদক্ষেপও নিয়েছিলেন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯০৪ (Indian University Act: 1904)

১৯০৪ খ্রিঃ ১১ মার্চ লর্ড কার্জন-এর সরকারি সিদ্ধান্তের আকারে সরকারের শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। এই আইনের কিছু উজ্জ্বল দিক—

- সেনেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল।
- সেনেট ও সিন্ডিকেটের অধিবেশন নিয়মিত বসায় অনেক সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হল।
- শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগল ও তারাই পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের সবিস্তারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বীক্ষণাগার, গবেষণা প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে লর্ড কার্জনের সুপারিশ :

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্জন যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে বললে বলা যায়—

- প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অংশের সিংহভাগই ব্যয় করা হবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যই। শিক্ষাদানে সংগৃহীত আঞ্চলিক তহবিলের অর্থ প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করা যাবে না।
- পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রথার বিলোপ ঘটাতে হবে।
- অঞ্চলের প্রয়োজনের ভিত্তিতে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত পাঠ্যতালিকা তৈরি করতে হবে। মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।
- শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কার্জনের সুপারিশ

(১) সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোনো মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

(২) সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত থেকে হোক না হোক — উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানকে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয়ের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

(৩) বেসরকারি ও অননুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ভরতি করা নিষিদ্ধ হয়।

শিক্ষার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ক্ষেত্রে কার্জনের পদক্ষেপগুলি যে কেবলমাত্র সেই সময়ে সঠিক ছিল তাই নয়, পরবর্তী সময়েও এর যথেষ্ট তাৎপর্য অনুভূত হয়েছিল। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল—

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে :

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কার্জনের উদার হস্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হয় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-এর উপর।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আঞ্চলিকভাবে কর আদায় করা।

(ঘ) পাঠক্রম পুনর্গঠন করা

(ঙ) মাতৃভাষা হবে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার মানকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। সরকারি অনুমোদনের সঙ্গে আর্থিক সাহায্যকে যুক্ত করা।

(খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্যদান।

(গ) মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাশিক্ষার সুযোগদান।

(ঘ) বিদ্যালয় অনুমোদনদানে কঠোরতা অবলম্বন করা।

(ঙ) বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা ভালো করা।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে

(ক) উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের পুনর্গঠন এবং আইনগত অধিকার দান।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী করা।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমানা নির্দিষ্ট করা।

(ঙ) নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

(চ) পাঠক্রমের পরিবর্তন।

শিক্ষার বিভিন্ন দিক :

(ক) বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ।

(খ) শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং কৃষি গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(গ) আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করা।

(ঘ) প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১.৩.১০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন, ১৯১৭-১৯ (Calcutta University Commission or Sadler Commission, 1917-19)

লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর পার না হতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তথা সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোর পর্যালোচনা ও সংস্কার করার প্রয়োজন হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের উপলক্ষ্যে কমিশন গঠিত হলেও সমগ্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কীভাবে সংস্কার করা যায় কমিশন সেই আলোচনা করেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সবরকম শিক্ষারই বিস্তৃত আলোচনা এই রিপোর্টে ছিল। এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন মাইকেল স্যাডলার।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে শিক্ষাব্যবস্থা (১৯৩৭-৪৭)

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইনের ফলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ১১টি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু হয়। নতুন শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীরা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হন। ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হওয়ার ফলে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ সুগম হয়। এই যুগটির শিক্ষাব্যবস্থাই হল স্বাধীনতার ঠিক আগের (Pre-Independence) যুগের শিক্ষাব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির (CABE) সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সরকারের এই সময় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি হল—

(i) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির (CABE) পুনর্গঠন।

(ii) শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সচিবালয় গঠন।

(iii) Central Bureau of Education গঠন করা।

(iv) UGC গঠন করা।

(v) ব্রিটিশ সরকার ভারতের বৃত্তি ও পেশা সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনার জন্য Abbot Wood Report প্রকাশ করেন।

(vi) যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনাও তৈরি করেন।

(vii) বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থাকেও এই সময় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই যুগের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর (Secondary Education)

এই যুগের শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য দেখা দিল মাধ্যমিক স্তরে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার যে ত্রুটিগুলি ছিল তা রয়ে যায়। ফলে শিক্ষক অসন্তোষ দেখা দেয়। যুদ্ধের কারণে সামগ্রিক অর্থনৈতিক চাপ বাড়ে। এই স্তরের ভাষা সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। অনেক পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচিত হয়। আঞ্চলিক পরিভাষাও তৈরি করা হয়। শিক্ষকরা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে অভ্যস্ত হন।

এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। প্রাদেশিক সরকারগুলি কারিগরি, বাণিজ্য ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। বিশ্বযুদ্ধ কারিগরি শিক্ষার চাহিদাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সময়ে আরও কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। গ্রামীণ বালিকা বিদ্যালয়ের উপযোগী কোনো আলাদা পাঠক্রম তৈরি হয়নি। এই সময়ে মাধ্যমিকে অকৃতকার্যতার পরিমাণ খুব বেশি ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যা।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ যুগের সবথেকে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মহাত্মা গান্ধি রচিত বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা। কংগ্রেসি মন্ত্রীদের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রসারের ক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিল তার উপর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গুরুত্ব দিয়েছিলেন— এ ব্যাপারে মন্ত্রীসভার পদক্ষেপগুলি নীচে বলা হল—

(i) স্কুলবিহীন গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(ii) স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অনুদান দিয়েছিলেন।

(iii) অতিরিক্ত বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন।

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষাসম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (University Level)

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংখ্যাগতভাবে সম্প্রসারিত হয় এবং ছাত্রসংখ্যা ১০ বছরে ১,২৬,২২৮ থেকে বেড়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ২,৪১,৭৯৪ জন। ছাত্রসংখ্যা বাড়ার কারণ ছিল— মাধ্যমিক শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ, মহিলা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি। শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ ইত্যাদি।

এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বৃত্তি ও পেশা সংক্রান্ত শিক্ষা, আইন শিক্ষা, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছিল।

১.৩.১১ বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic Education ১৯৩৭)

ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং এর জন্য তিনি ইংরেজ সরকারকেই দায়ী করেন। শিক্ষাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য এবং সাত বছরের সার্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে হরিজন পত্রিকায় তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। সেটি পরবর্তী সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা বা ওয়ার্ধা কর্মসূচি বলে গণ্য হয়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে জাতীয় শিক্ষার প্রথম অধিবেশন হয়— এখানে যে প্রস্তাব গ্রহণ হয় তা হল—

(ক) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা জাতীয় স্তরে কার্যকরী হবে।

(খ) মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।

(গ) উৎপাদনশীল কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা কার্যকরী হবে।

(ঘ) শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের বেতন দেওয়া হবে।

সম্মেলনে জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার দায়িত্ব ছিল উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বুনিয়াদি শিক্ষার একটি পাঠক্রম প্রস্তুত করা, জাকির হোসেন রিপোর্ট বুনিয়াদি শিক্ষার একটি মৌলিক দলিল বলে গৃহীত হয়।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য : বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধিজির ব্যাখ্যা ও পরবর্তী কমিটি এবং সম্মেলনসমূহে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তারই ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হল—

(১) একটি মূল শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্যবস্থা চলবে। এই মূল শিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হবে।

(২) স্বনির্ভর এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের বেতনের জন্য অর্থ আসবে এবং শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর হবার ব্যবস্থা থাকবে।

(৩) দৈহিক শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে— যাতে শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা জীবন জীবিকা নির্বাহের শিক্ষা পায়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় অহিংসার কথা থাকবে— যাতে একজন অপরের জীবনের প্রতি হিংসা বোধ না করে।

(৪) শিশুর শিক্ষার সঙ্গে তার গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামের শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির সমন্বয়সাধন করতে হবে।

(৫) বুনিয়াদি শিক্ষায় ৪টি স্তর—

(I) প্রাক্-বুনিয়াদি স্তর (৭ বছরের পূর্ব পর্যন্ত)

(II) জুনিয়র বুনিয়াদি স্তর (৭ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত)

(III) সিনিয়ার বুনিয়াদি স্তর (১১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত)

(IV) উত্তর-বুনিয়াদি স্তর (১৪ বছরের অধিক)

(৬) মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।

(৭) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে অভ্যন্তরীণ। দৈনন্দিন কার্যাবলির ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে।

(৮) এ শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক।

বুনিয়াদি-শিক্ষা-পরিকল্পনার উপযোগিতা ও গুরুত্ব (Importance of planning of Basic Education)

- ভারতে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়। Zakir Hussain Committee-র মতে "বুনিয়াদি শিক্ষা স্বয়ং শক্তিশালী শিক্ষানীতির ভিত্তিতে এটি গঠিত"।
- এই শিক্ষা পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে সহায়তা করে। কারণ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বুনিয়াদি শিক্ষা গড়ে উঠেছিল।
- শিক্ষাকে গণ-শিক্ষায় পরিণত করেছিল বুনিয়াদি শিক্ষা। কারণ এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত ছিল।
- এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিভেদ দূর করে।
- শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
- বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে।
- এটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
- বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
- এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সৃজনাত্মক এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
- বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। এতে করে শিক্ষার্থীরা উত্তম নাগরিকে পরিণত হয়।

বুনিয়াদি শিক্ষার ত্রুটি (Demerits of Basic Education)

বুনিয়াদি শিক্ষার একাধিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তা সার্থক হতে পারেনি। কারণ এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ণ করা হয়নি। বিভিন্ন কারণে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল—

- এই শিক্ষা পরিকল্পনা কখনোই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। সমাজে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে নিম্নমানের বলে মনে করত।
- যথেষ্ট অর্থের অভাব ছিল।
- যোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব ছিল।
- শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় কারখানাতে পরিণত হয়েছিল।

১.৩.১২ সার্জেন্ট পরিকল্পনা (Sargent's Report (১৯৪৪))

মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসলীলার পর সকল দেশেই শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা হয় এবং জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধের পর ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের (C.A.B.E) উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করে। সার্জেন্ট (Sargent) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়, একেই বলা হয় সার্জেন্ট কমিটি।

১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়— ‘‘যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন’’ এই নামে সর্বপ্রথম একটি সর্বাঙ্গীণ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করল।

এই রিপোর্ট নতুন কোনো শিক্ষা পরিকল্পনা নয়। সার্জেন্ট নিজে কোনো নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করেননি। স্যাডলার কমিশন থেকে শুরু করে বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত হার্টন কমিটি, সাপ্রু কমিটি, এ্যাবট-উড রিপোর্ট, বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্কার বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। তাদের মূল্য বিচার করে ও সমন্বয় সাধন করে যুদ্ধোত্তর ভারতের সামগ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন বিচার করে সার্জেন্টের শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে CABE একটি যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা সরকারের কার্যকারী সমিতিকে জমা দেয়। এটিই Sargent Report।

এই Sargent Report-এর উদ্দেশ্য ছিল ন্যূনতম ৪০ বছরের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ইংল্যান্ডের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার স্তরে উন্নীত করা। এই উদ্দেশ্যে কমিটি কিছু সুপারিশ করেন।

(১) **৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা :** শহরে শিশুদের জন্য আলাদা Nursery School থাকবে ও গ্রামে বুনিয়াদি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি যুক্ত থাকবে। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(২) **৬-১৪ বছরের শিশুদের জন্য সার্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক বুনিয়াদি শিক্ষা :** ৬-১১ পর্যন্ত নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার কাজের মাধ্যমে ১১-১৪ উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষার নীতিকেই গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

(৩) **মাধ্যমিক শিক্ষা :** ১১-১৭ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি পর্ব বলে মনে করলে চলবে না। মাধ্যমিক পাশ করেই যাতে জীবনধারণের উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিম্ন বুনিয়াদির ২০ শতাংশ মেধাবী ছাত্র উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবে। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য বেতন লাগবে ২০ শতাংশ। দরিদ্র ছাত্ররা অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। ইংরেজি হবে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান থাকবে।

(৪) **উচ্চশিক্ষা :** শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার থাকবে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিটির অনুসরণে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা : সার্জেন্ট রিপোর্টে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) প্রধান কর্মকর্তা ও গবেষণা কর্মী

(খ) নিম্নতর কর্মকর্তা, ফোরম্যান, চার্জহ্যান্ড ইত্যাদি

(গ) দক্ষ কারিগর

(ঘ) অর্ধ-দক্ষ কারিগর

(৬) **সামাজিক শিক্ষা :** ১০-৪০ বছর বয়স্ক প্রতিটি মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সমস্ত দেশে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৭) **স্বাস্থ্য শিক্ষা :** স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। স্কুলের সমগ্র শিক্ষাকালে অন্তত তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৮) **শিক্ষক-শিক্ষণ :** বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নতুন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ন্যূনতম স্নাতক শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। স্নাতক নন এরকম শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ স্কুল থাকবে। এখানে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুনিয়াদি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও হাই স্কুলের স্নাতক নন এমন শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(৯) **কর্মসংস্থা:** শিক্ষার শেষে চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য কর্মসংস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের সংস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১০) **সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষা :** সহ-পাঠক্রমিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে গঠনমূলক যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(১১) **প্রশিক্ষণ :** কেন্দ্রে একটি সুসংগঠিত (সুদৃঢ়) শিক্ষা বিভাগ খোলার কথা বলা হয়।

(১২) **শিক্ষার ব্যয় :** অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে বছরে ১০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এর জন্য ব্রিটিশ ভারতেই **১৮** লক্ষ শিক্ষকের দরকার।

সার্জেন্ট রিপোর্টের মূল্যায়ন : এই রিপোর্টে প্রথম একটি গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের যে শিক্ষার সমান সুযোগ লাভের অধিকার আছে সে কথা স্বীকার করা হয়। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপুরের আহার, বই, বৃত্তি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা সব কিছুর ব্যবস্থার কথা বলা হয়। শিক্ষার ব্যাপক অর্থ অনুধাবন করে স্বাস্থ্য, চরিত্র গঠন, সমাজসেবামূলক কাজ, অবসর বিনোদনের শিক্ষা সবকিছুকেই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে জীবনমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়। শিক্ষক সমাজের উন্নতির কথা বলা হয়। নার্সারি শিক্ষা থেকে শুরু করে বয়স্ক শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, তিন বছরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি নানা বিষয়ক শিক্ষার কথা বলা হয়।

নানা ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও এই কমিশনের কিছু ত্রুটি আছে যার জন্য ভারতীয় শিক্ষাবিদদের এই রিপোর্ট সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

কীভাবে দ্রুত উন্নতি করে শীঘ্রই ইংল্যান্ডের শিক্ষার মানে পৌঁছাবে সে সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার পথনির্দেশ করেনি। কেবলমাত্র একটি লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয় সেখানে ভারতকে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু আর্থিক খরচের দিক বিবেচনা করে কোনো বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ইংল্যান্ডকে আদর্শ করে ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। দুই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরাট পার্থক্যকে মাথায় রাখা উচিত ছিল।

নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে সার্জেন্ট রিপোর্টে যে খসড়া দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তী শিক্ষা-পরিকল্পনা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

অগ্রগতি নিরীক্ষা (Check Your Progress)

- দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডাম ক-টি রিপোর্ট পেশ করেন।

  (ক) একটি (খ) তিনটি

  (গ) দুটি (ঘ) চারটি

- প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল—

  (ক) সর্বস্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার না করা।

  (খ) প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন না করা।

  (গ) শিক্ষার মধ্য দিয়ে শোষণব্যবস্থা।

  (ঘ) উচ্চস্তরের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বদান।

- **গান্ধিজি কত খ্রিস্টাব্দে 'বুনিয়াদি শিক্ষা' সম্পর্কে তাঁর হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করেন?**

  (ক) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে

  (গ) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে

- **আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীনতার কোন্ শিক্ষা কমিশনের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়?**

  (ক) হান্টার কমিশন (খ) উডের ডেসপ্যাচ

  (গ) কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (ঘ) স্যাডলার কমিশন

১.৪ স্বাধীনোত্তরকালে ভারতীয় শিক্ষা (Education in Post-Independence India)

১.৪.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯) [University Education Commission or Radhakrishnan Commission (1948-49)]

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যেসব সর্বভারতীয় কমিশন নিয়োগ করা হয় তাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই কমিশন তৈরি হয়েছিল ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর। ড. রাধাকৃষ্ণণ ছাড়া এই কমিশনে ছিলেন ড. লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র, ড. জাকির হোসেন, ড. তারাচাঁদ, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. এন কে সিদ্ধান্ত। কমিশনে তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদ ছিলেন তাঁরা হলেন— ড. জেমস এফ ডাফ, ডা. আর্থার ইমরগ্যান, ডা. টি গার্ট।

কমিশন যেসব বিষয় অনুসন্ধান করেছে তা হল—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য।

(২) পাঠক্রম ও শিক্ষার বাহন।

(৩) শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার মান।

(৪) গবেষণা।

(৫) ছাত্রদের স্বাস্থ্য, আবাসন, নিয়মানুবর্তিতা।

(৬) উচ্চশিক্ষার প্রশাসন

(৭) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ যেখানে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার পরীক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় আলোচনার মধ্যে রয়েছে।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Higher Education)

সামাজিক আদর্শের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সম্পৃক্ততা বজায় থাকার ব্যাপারটি মাথায় রেখে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের পরিস্থিতিকে মনে রেখে কমিশন উচ্চশিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্ধারণ করেন—

- নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
- ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা।
- জ্ঞানের চর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়তা করা
- গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করা
- কৃষ্টির সংরক্ষণ ও তার উন্নয়ন।

- গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
- নৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা।
- প্রজ্ঞার উন্মেষসাধন।
- ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ।
- সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা।
- মানবিক গুণাবলীর বিকাশসাধন।
- সহপাঠক্রমিক শিক্ষা।
- মাতৃভাষায় শিক্ষা।
- ধর্ম ও নীতি শিক্ষা।
- কৃষিবিদ্যা শিক্ষা
- কারিগরি শিক্ষা।
- বয়স্ক শিক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঠামো (Structure of University Education): প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম পরিচালনার জন্য একটি সুসংগঠিত কাঠামো থাকবে। এই কাঠামোতে থাকবে যেমন— (১) পরিদর্শক, (২) আচার্য (৩) উপাচার্য (৪) সেনেট (৫) সিন্ডিকেট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (৬) একাডেমিক কাউন্সিল (৭) ফ্যাকাল্টিজ (৮) বোর্ড-অফ-স্টাডিজ (৯) অর্থ কমিটি (১০) নির্বাচন কমিটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম (Curriculum) কমিটি সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছেন।

সাধারণ শিক্ষা :

- ১২ বছর বিদ্যালয় শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বা বিজ্ঞান শাখায় ভরতি হতে পারবেন।
- পাস ও অনার্স উভয় শ্রেণির জন্য ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স থাকবে। পাস কোর্সের ছাত্র দু-বছর পর এবং অনার্স কোর্সের ছাত্র তিন বছর পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করবে ।
- ডিগ্রি কোর্সে পাঠ্য থাকা উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা (সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয়-ভাষা) ইংরেজি এবং মাতৃভাষা অথবা একটি প্রাচীন ভাষা, মানবীয় বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞান।
- স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন হোমাইড হেডের কথা স্মরণ করে বলেন, একটি সমাজের প্রগতি তিন ধরনের মানুষের উপর নির্ভর করে— বিদ্বান, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা : কমিশন পেশাগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কমিশন মোট ৬টি বিষয়ের উল্লেখ করেছে।

১. কৃষি
২. বাণিজ্য
৩. শিক্ষাতত্ত্ব
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি / প্রযুক্তিবিদ্যা
৫. আইন শিক্ষা
৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান

পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার (Examination Reform) : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ভারতের পরীক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুপারিশও করেন।

- কমিশন প্রথমেই বলেছেন— সরকারি উচ্চপদে কর্মী নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে না। কর্মী নিয়োগের জন্য নিয়োগকর্তারাই প্রয়োজনমতো বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

  কমিশনের মতে তিন বছরের শেষে একটিমাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষা না নিয়ে তিন বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এবং সমগ্র পাঠ্যসূচিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনটি এককে ভাগ করে নিতে হবে।

- অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে পরীক্ষক নিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- পরীক্ষা রচনাধর্মী না করে যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক (Objective) করে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- স্নাতকোত্তর পরীক্ষা ও বৃত্তিগত পরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক পরীক্ষার নীতি গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষার মান : রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতে, শিক্ষা ও পরীক্ষার সবোর্চ্চ মান রক্ষাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক কর্তব্য।

শিক্ষক সম্পর্কে কমিশনের মত : শিক্ষক তাঁর আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন। বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবেন। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে পদোন্নতি হবে।

ধর্মশিক্ষা : কমিশনের মতে ধর্মশিক্ষা ছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত হতে পারে না। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বদলে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব ধর্মের সাম্যের কথা বলা হয়েছে। ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কমিশনের মত : উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজির পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরে বিদ্যার্থীকে তিনটি ভাষা যথা—আঞ্চলিক ভাষা, সর্বভারতীয় ভাষা ও ইংরেজি শিখতে হবে।

উচ্চতর শিক্ষা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারগুলি মাধ্যমিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সর্বভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইংরেজি শেখানো হবে।

নারীশিক্ষা (Women Education) : কমিশন নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পরামর্শ দেন। বলা হয়েছে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করা চলবে না, বরং সুযোগ বাড়াতে হবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University)

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে এক-একটি গ্রামীণ কলেজ। কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাঠামো :

(১) ৭/৮ বছরব্যাপী নিম্ন ও উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষা

(২) ৩ কিংবা ৪ বছরের উচ্চবুনিয়াদি ও মাধ্যমিক শিক্ষা।

(৩) ৩ বছরের গ্রামীণ কলেজ।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা।

গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা পরিষদ (National Council of Rural Higher Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে উক্ত পরিষদ ভারতের ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে

গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে নির্বাচন করে। যেমন— শ্রীনিকেতন (পশ্চিমবঙ্গ), গান্ধিগ্রাম (তামিলনাড়ু), জামিয়ানগর (দিল্লি), উদয়পুর (রাজস্থান), অমরাবতী (মহারাষ্ট্র), ওয়ার্ধা (মহারাষ্ট্র), ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ), সভাপুর (কেরল), সানোযোয়া (গুজরাট) প্রভৃতি।

উপরোউক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য হিসাবে যেসব কোর্স চালু করা হয় সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) গ্রামসেবা বিজ্ঞানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স

(২) গ্রামীণ বিজ্ঞানে দু-বছরের সার্টিফিকেট কোর্স

(৩) কৃষি বিজ্ঞানে দু-বছরের সার্টিফিকেট কোর্স

(৪) সিভল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্স

(৫) ১ বছরের স্যানিটারি ইন্সপেকটার কোর্স

সমালোচনা : রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের প্রতিবেদনটি স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এক ঐতিহ্যপূর্ণ তথ্যবহুল যুগান্তকারী দলিল। কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে নব ভারত গঠনের মৌলিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে উন্নত কৃষিবিদ্যার অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে সুদৃঢ় করা হয়েছে কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে।

তবে ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, টোল, মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল না।

তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ভারতের উচ্চশিক্ষার রূপান্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

১.৪.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩) [Secondary Education Commission or Mudaliar Commission (1952-53)]

স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (**CABE**) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব অনুসারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন উপাচার্য ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন **শ্রীমতী হংস মেহেতো, শ্রী জে. এ. তারপোরওয়ালা, ড. কে. এল. শ্রীমালী, শ্রী. এম. টি ব্যাস, শ্রী. কে. জি. জঙ্গদিয়ান, শ্রী. অনাথনাথ বসু, জন ক্রিস্টি** (ইংল্যান্ড), **কে. আর. উইলিয়ামস্** (আমেরিকা)। ড. লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের নাম অনুসারে এটি মুদালিয়র কমিশন নামেও পরিচিত।

মুদালিয়র কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশ (Main Recommendations of Mudaliar Commission)

- **মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য : (Aims of Secondary Education) :**

১. প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি করা।

২. ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ।

৩. যুবসমাজের চরিত্র গঠন।

৪. উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা।

৫. নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা তৈরি করা।

৬. জাতীয় সংস্কৃতি গঠন।

৭. বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক গুণাবলির বিকাশ।

৯. ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব সৃষ্টি।

১০. বাস্তব অভিজ্ঞতা সৃষ্টি।

১১. জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি।

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো (Structure of Secondary Education)

মুদালিয়র কমিশন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত কাঠামো সুপারিশ করেন—

১. প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদি শিক্ষা — চার অথবা পাঁচ বছর।

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে থাকবে দুটি শিক্ষাস্তর—

 (ক) নিম্নমাধ্যমিক — তিন বছরের শিক্ষাস্তর

 (খ) উচ্চমাধ্যমিক — চার বছরের শিক্ষাস্তর

৩. ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলোপ করে এই কোর্সের ১ বছর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যুক্ত হবে এবং অপর ১টি বছর যুক্ত হবে ডিগ্রি কোর্সের সঙ্গে।

৪. ডিগ্রি কোর্সের সময়কাল হবে ৩ বছরের।

৫. যারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করবে তাদেরকে এক বছর প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অধ্যয়ন করে তবে ডিগ্রি কোর্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৭. যারা উচ্চতর মাধ্যমিক অথবা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স শেষ করবে তারাই কেবলমাত্র পেশাগত শিক্ষার কলেজে ভরতি হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮. বৃত্তি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১ বছরের প্রাক্-বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করতে হবে।

৯. বহুমুখী বিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

১০. প্রতিটি রাজ্য সরকারকে গ্রামীণ বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Secondary Education) :

(১) নিম্নমাধ্যমিক স্তরে যে বিষয়গুলি থাকবে সেগুলি হল— (a) ভাষা (b) সামাজিক শিক্ষা (c) সাধারণ বিজ্ঞান (d) গণিত (e) কলা ও সংগীত (f) হাতের কাজ (g) শিল্প (h) শারীর শিক্ষা।

(২) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে— শিক্ষার্থীর রুচি, যোগ্যতা, প্রবণতা অনুযায়ী বহুমুখী বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয় হবে আবশ্যিক পাঠ্য এবং কয়েকটি হবে ঐচ্ছিক বিষয়। এ ছাড়াও অতিরিক্ত বিষয় থাকবে।

(৩) আবশ্যিক বিষয় (Core Subject)

(i) ভাষা

(ii) সমাজ বিজ্ঞান

(iii) সাধারণ বিজ্ঞান

(iv) গণিত

(v) একটি শিল্প

(B) ঐচ্ছিক বিষয় (Elective Subject)

এই বিষয়গুলিকে কমিশন ৭টি বিভাগে ভাগ করেছেন, যে-কোনো বিভাগ থেকে তিনটি বিষয় নিতে হবে—

(i) **মানবিক বিজ্ঞান (Humanities) :** (a) প্রাচীন ভাষা বা অন্য একটি ভাষা, (b) ইতিহাস, (c) ভূগোল, (d) অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান, (e) মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র, (f) গণিত, (g) সংগীত, (h) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

(ii) **বিজ্ঞান (Science):** (a) পদার্থবিদ্যা, (b) রসায়ন বিদ্যা, (c) জীববিদ্যা, (d) ভূগোল, (e) গণিত, (f) শারীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

(iii) কারিগরি (Technical) : (a) ব্যবহারিক গণিত ও জ্যামিতি অঙ্কন (b) ব্যবহারিক বিজ্ঞান (c) যন্ত্র বিজ্ঞান (d) তড়িৎ বিজ্ঞান।

(iv) বাণিজ্য (Commerce) : (a) ব্যাবহারিক বাণিজ্য (Commercial practice), (b) বুক কিপিং, (c) অর্থনৈতিক ভূগোল, (d) শর্ট হ্যান্ড টাইপ রাইটিং।

(v) কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Science) : (a) সাধারণ কৃষিবিদ্যা, (b) পশুপালন, (c) উদ্যান রক্ষা ও নির্মাণ, (d) কৃষি বিষয়ক রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা।

(vi) চারুকলা (Fine Arts) : (a) কলাবিদ্যার ইতিহাস, (b) অঙ্কন ও ডিজাইন শিক্ষা, চিত্রকলা, (c) মডেলিং, (d) সংগীত, (e) নৃত্য

(C) অতিরিক্ত বিষয় (Optional or Additional Subject) : উপরোক্ত বিভাগের বিষয়গুলি থেকে আরও একটি বিষয়কে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিতে পারে।

শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম (Medium of Instruction) :

সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে।

- জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে অন্ততপক্ষে দুটি ভাষা শিখতে হবে। প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের শেষে ইংরেজি অথবা হিন্দি পাঠ্য হবে। একই বছর দুটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া চলবে না।

- উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অন্তত দুটি ভাষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

- মাধ্যমিক স্তরে একজন বিদ্যার্থীকে অন্তত তিনটি ভাষা শিখতে হবে। তার মধ্যে একটি হবে বিদেশি ভাষা।

পরীক্ষা সংস্কার (Reforms of Examination)

- কমিশন বার বার বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন এবং যতদূর সম্ভব বহিঃপরীক্ষা কমিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেন। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা দুই প্রকারই থাকবে। তবে বহিঃপরীক্ষা কমিয়ে আনতে হবে।
- রচনামূলক (Essay type) পরীক্ষার বদলে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার (Objective text) প্রচলন করতে হবে।
- প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে তার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান পরিমাপ করা সম্ভব হয়।
- পরীক্ষায় নম্বরের পরিবর্তে সাংকেতিক পদ্ধতি (যেমন— A-অতি উত্তম, B-উত্তম, C-সাধারণ, D-মন্দ ও E-অতিমন্দ) ব্যবহার করতে হবে।
- সরকারি পরীক্ষায় (Public Examination) কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার প্রবর্তন করা দরকার।

তা ছাড়া প্রতি বিদ্যালয়ে সর্বাত্মক পরিচয় সংকলিত রেকর্ড কার্ড রাখার পরামর্শ দেন কমিশন। স্কুল রেকর্ড কার্ডে বিদ্যার্থীর সব দিকের উন্নতির বিচার করা সম্ভব।

কমিশনের সমালোচনা : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর আমাদের দেশের প্রতিটি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি প্রবর্তিত হয়। এই পাঠক্রম আধুনিক, প্রয়োজনভিত্তিক এবং প্রগতিশীল বলে সমাদৃত হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এর দুর্বলতা ধরা পড়ে। উচ্চতর একাদশ শ্রেণির শিক্ষার সাফল্যের জন্য যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল তার আংশিক মাত্র গ্রহণ করা হয়। তাই তার ফল ভালো হয়নি।

নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানুন (Check your Progress)

১) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) মুদালিয়র কমিশনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে?

(গ) মুদালিয়র কমিশনে শিক্ষামাধ্যম সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

১.৪.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) [Indian Education Commissions or Kothar: Commission (১৯৬৪-৬৬)] :

শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের জন্য ভারত সরকার ড. ডি. এস. কোঠারি-এর সভাপতিত্বে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ড. কোঠারির নাম অনুসারে এই কমিশন কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এটি হল তৃতীয় শিক্ষা কমিশন। এই কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন জে পি নায়েক, কে জি সায়ায়িদান (Saiyidain), ড.টি সেন, মিস এস. পানানদিকার, এম. ভি. মাথুর, আর এ গোপালস্বামী প্রমুখ। এছাড়াও ২০ জন বিদেশি পরামর্শদাতা কমিশনের কাজে সাহায্য করেছেন।

এই কোঠারি কমিশনই প্রথম কমিশন যেখানে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ ও সবরকমের শিক্ষার নানান দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

এই কমিশন ১২টি কাজের উপর জোর দিয়েছিল (Task Force) এবং ৭টি দলের (Working Group)-এর নির্বাচন করেছিল।

- **বারোটি কাজ হল (Task Force on) :**
  - (i) বিদ্যালয় শিক্ষা (School Education)
  - (ii) উচ্চতর শিক্ষা (Higher Education)
  - (iii) কৃষি শিক্ষা (Agriculture Education)
  - (iv) কারিগরি শিক্ষা (Technical Education)
  - (v) বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)
  - (vi) বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা (Science Education and Research)
  - (vii) শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Teacher's Training)
  - (viii) ছাত্র উন্নয়ন (Student Welfare)
  - (ix) নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল (New techniques and Methods)
  - (x) মানব শক্তি (Manpower)
  - (xi) শিক্ষাগত পরিকাঠামো (Educational Infrastructure)
  - (xii) শিক্ষাসংক্রান্ত আর্থিক সংস্থান (Educational Finance)
- **সাতটি দল হল (Working Group on) :**
  - (i) নারীশিক্ষা (Women Education)
  - (ii) শিক্ষা ও অনগ্রসর শ্রেণি (Education of backward classes)
  - (iii) বিদ্যালয় উন্নয়ন (School Development)
  - (iv) রাশিবিজ্ঞান (Statistics)
  - (v) বিদ্যালয় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক (School Community Relation)
  - (vi) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-Primary Education)
  - (vii) বিদ্যালয় পাঠক্রম (School Curriculum)

কোঠারি কমিশনের উদ্দেশ্য

- জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট করা।
- নতুন সমাজের বিন্যাস করার জন্য গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সবার জন্য একটি যুক্তিসংগত আদর্শ জীবনযাপন, শিল্পের দ্রুত বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে হবে।
- সর্বস্তরে গুণগত ও পরিমাণগত শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।
- শিক্ষার সমগ্র দিকগুলির সার্ভে করা।
- বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন।
- জাতীয় বিকাশ কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য।

কোঠারি কমিশনের মতে শিক্ষার কাঠামো (Educational Structure)

কমিশন বিদ্যালয় এবং কলেজে শিক্ষার গঠন ও শিক্ষাদানের মানকে বাড়িয়ে তোলার জন্য কিছু সুপারিশের কথা বলেন—

(i) সাধারণ শিক্ষাকে ১০ বছর শিক্ষাকালের মধ্যে রাখতে হবে (৪ বছর নিম্ন-প্রাথমিক, ৩ বছরের উচ্চ-প্রাথমিক এবং ৩ বছরের নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা)।

(ii) প্রথম শ্রেণিতে (Class-I) ভরতির বয়স ৬ বছরের কমে হবে না।

(iii) সার্বিক শিক্ষা কাঠামোটি হবে ১০+২+৩+২।

(iv) উচ্চশিক্ষার স্তরে ৩ বছরের বা তার চেয়ে বেশি সময়ের শিক্ষান্তে প্রথম ডিগ্রি লাভের শিক্ষা।

(v) দু'ধরনের বিদ্যালয় হবে — (a) একটি হাই স্কুলে ১০ বছরের শিক্ষা দেওয়া হবে (b) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ানো হবে।

পাঠক্রম (Curriculum) :

কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম ১০ বছরের সাধারণধর্মী পাঠক্রম (Common Curriculum) এবং তারপর ২ বছরের বিশেষধর্মী পাঠ্যক্রম (Special Curriculum) নির্ধারিত হয় (There would be a single curriculum stream from class I to X and there could be no streaming or specialization in this general course)। এই পাঠক্রমে ১০ বৎসর ব্যাপী সাধারণ-ধর্মী জ্ঞান আহরণ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক করা হয়। এই সময়ের মধ্যে তাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং যথাযথ নির্দেশনার সাহায্যে সে ভবিষ্যতে কোন্ বিষয়টি নির্বাচন করবে তা বুঝতে পারবে।

(i) নিম্ন-প্রাথমিক স্তর (Lower primary stage I-IV) :

- মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা (Mother tongue or regional language)
- গণিত (Mathematics)
- বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান (Scientific and Social Studies)
- সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপ (Creative activities)
- কর্ম অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিসেবা (Work Experience and Social Service)
- স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

(ii) উচ্চ প্রাথমিক স্তর (Higher Primary Stage V-VIII) **:**

- দুটি ভাষা— মাতৃভাষা এবং হিন্দি অথবা ইংরেজি
- গণিত
- সামাজিক বিজ্ঞান
- বিজ্ঞান
- কলা
- কর্মশিক্ষা
- শারীরশিক্ষা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

পাঠ্যক্রম ধীরে ধীরে বিস্তৃত করা হবে। ওই স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি ভাষা প্রবর্তন হবে। কমিশন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম (Enrichment Programme) রচনার কথা বলেছে।

Lower Primary : পাঠ্যক্রম সহজ সরল হবে। শিক্ষার্থী ভাষা, অঙ্কের প্রাথমিক জ্ঞান এবং পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবে। তার লেখা ও পড়ার ক্ষমতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সে গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করতে শিখবে। প্রথম চার বছরের শিক্ষায় মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে না।

(iii) নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর (Lower Secondary Stage VIII-X) :

এই স্তরে শিক্ষণীয় বিষয় গভীরতম ও কঠিনতর হবে। তৃতীয় ভাষাকে আবশ্যিকরূপে পাঠ্যক্রম স্থান দিতে হবে। কোঠারি কমিশন নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে নিম্নলিখিত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছে—

- তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, হিন্দি, ইংরেজি এবং একটি প্রাচীন ভাষা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক পাঠ্য হিসেবে নেওয়া যেতে পারে)
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা
- কারুশিল্প
- কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা (Work Experience)
- সমাজসেবা (Social Service)
- শারীরশিক্ষা
- আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা।

(iv) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর (Higher Secondary Stage XI-XII) :

দশবছর বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থী প্রথম বহিঃপরীক্ষা (External Examination) দেবে, তারপর শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং যোগ্যতা বিবেচনা করে তাকে যথাযথ পরিচালনা ও পরামর্শ দিতে হবে যাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার বিষয়টি বেছে নিতে পারে।

এই স্তরে ব্যাপক বহুমুখী শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করা যায় দশম শ্রেণির শিক্ষার শেষে ৫০% শিক্ষার্থী পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট ৫০% সাধারণ শিক্ষা (General education) নেবে।

সাধারণ শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় থেকে পছন্দমতো যে-কোনো তিনটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে পারবে। প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম নমনীয় হবে ও শিক্ষার্থীর মিশ্র বিষয় গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে। যেমন— বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী ছাত্র পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব অথবা তর্কশাস্ত্র নিয়ে পড়তে পারবে।

কমিশন দু-বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দিয়েছে—

a. যে-কোনো দুটি ভাষা (Modern Indian Language or Foreign Language)

b. নীচের যে-কোনো তিনটি বিষয়—

- একটি অতিরিক্ত ভাষা (An Additional language)
- ইতিহাস (History)
- ভূগোল (Geography)

- অর্থশাস্ত্র (Economics)
- তর্কশাস্ত্র (Logic)
- মনস্তত্ত্ব (Psychology)
- সমাজবিদ্যা (Sociology)
- শিল্প (Industry)
- রসায়ন (Chemistry)
- গণিত (Mathematics)
- প্রাণিবিদ্যা (Zoology)
- ভূবিদ্যা (Geology)
- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science)

c. কর্ম অভিজ্ঞতা

d. শারীরশিক্ষা

e. কলা অথবা শিল্প

f. নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা।

উচ্চ শিক্ষা (Higher Education) :

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে—

(১) প্রথম ডিগ্রি স্তর তিন বছরের কম হবে না। দ্বিতীয় ডিগ্রি স্তরের স্থিতিকাল হবে দুই বা তিন বছর।

(২) উচ্চশিক্ষার স্তরের কোনো ক্ষেত্রে ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তবে আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা বা প্রাচীন ভাষা Elective বিষয় হিসেবে উচ্চশিক্ষার স্তরে থাকবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম দিকে প্রথম ডিগ্রি স্তরে আঞ্চলিক ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তবে দ্বিতীয় ডিগ্রি স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি।

(৪) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষককে যথাসম্ভব দুটি ভাষা জানা দরকার (আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরেজি), দ্বিতীয় ডিগ্রি স্তরের ছাত্রদের দুটি ভাষা জানা দরকার।

(৫) ইংরেজি ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বিদেশি ভাষা বিশেষ করে রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই স্তরে।

(৬) প্রথম ডিগ্রি স্তরে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার সময় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রয়োজন।

(৭) মাস্টার্স ডিগ্রি স্তরে পাঠক্রমের পুনর্নবীকরণ প্রয়োজন। পাঠক্রম হওয়া উচিত General Based.

(৮) PhD Course-এর প্রথম বছর শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা এবং Advanced Nature-এর Tutorial-এ অংশগ্রহণ করতে হবে যাতে তার Master Degree Level-এ যে অসুবিধাগুলি ছিল সেগুলি সে দূর করতে পারে।

(৯) প্রতিটি PhD শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় একটি বিশেষ ভাষা জানতেই হবে।

(১০)প্রথম ডিগ্রি স্তরে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে শিথিলতা দেওয়া প্রয়োজন। যে-কোনো গ্রুপের বিষয়ের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের একসঙ্গে পঠন পর্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(১১)গবেষণা কাজের জন্য বিশেষ Training-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। Data Processing, Statistical Analysis ও Consultation-এর জন্যও বিশেষ Training-এর ব্যবস্থা করা উচিত।

(১২)বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও তাত্ত্বিক কাজের মধ্যে সমতা বিধান করা দরকার। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক কাজের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করতে হবে। জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Micro-organism Study এবং সেক্ষেত্রে ওষুধের ভূমিকা বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এছাড়া কৃষিশিক্ষার প্রতি বেশি নজর দেওয়া উচিত। Astronomy ও Astrophysics-এ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ইত্যাদি।

পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার (Reforms of Examination) :

শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করছে শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস ও শিক্ষকদের Instruction-এর পদ্ধতি। এটি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীকে পারদর্শিতা যাচাই করতে সাহায্য করে না, এটি শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উন্নয়নে সাহায্য করে।

এই সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি হল : (১) লিখিত পরীক্ষার এমনভাবে সংস্কার প্রয়োজন যাতে এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সঠিক পারদর্শিতার পরিমাপ করা যায়। (২) প্রতিটি স্তরের মূল্যায়নের জন্য কমিশনের সুপারিশ হল—

(i) নিম্ন-প্রাথমিক স্তর :

(A) এই স্তরে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে শিশুদের মধ্যে সাধারণ দক্ষতা (basic skill) ও সঠিক অভ্যাস এবং আগ্রহ গড়ে উঠেছে কিনা তা পরিমাপ করা।

(B) I-IV পর্যন্ত শ্রেণিকে একটি একক ইউনিট হিসেবে ধরা যেতে পারে। যেখানে এটি করা সম্ভব নয় সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এরপর এদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— (a) Slow Learner ও (b) Fast Learner।

এই স্তরের শিশুদের জন্য থাকবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

(ii) উচ্চ-প্রাথমিক স্তর : এই স্তরে শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই পরীক্ষাগুলি হবে অভ্যন্তরীণ। দুর্বলতা নির্ণায়ক পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে অভীক্ষাগুলি হবে শিক্ষক দ্বারা নির্মিত। সর্বাত্মক পরীক্ষাপত্র থাকবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য, যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছে কিনা জানা সম্ভব হবে।

(iii) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে বহিঃপরীক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে শিক্ষার্থীরা National Standard-এ পৌঁছেছে কি না তা দেখার প্রয়োজন, তথাপি একটি আবশ্যিক বহিঃপরীক্ষা প্রতিটি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন আছে বলে কমিশন মনে করেন না। তবে কমিশন মনে করেন, শিক্ষার মান সঠিক আছে কি না অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের Level of Achievement পরীক্ষা করার জন্য জেলা বিদ্যলয় পরিদর্শকগণ মাঝে মাঝে স্কুলগুলিকে Survey করতে পারেন বা State Evaluation Organisation দ্বারা তৈরি অভীক্ষার মাধ্যমে স্কুলে তথা ছাত্রছাত্রীদের মান যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

(iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তুলনা করার জন্য বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থা : District Educational Authority প্রাথমিক স্তরের শেষে বিভিন্ন জেলায় আদর্শায়িত অভীক্ষাপত্রের মাধ্যমে সাধারণ পরীক্ষা নিতে পারেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির Level of Performance-এর তুলনা করা সম্ভব হবে। তবে এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না।

(v) প্রাথমিক শিক্ষার শেষে বিদ্যালয়গুলিই সার্টিফিকেট দেবে। এই সার্টিফিকেটের সঙ্গে সর্বাত্মক পরিচয়পত্রও দেবে এবং সাধারণ পরীক্ষার ফলাফল দেবে (যেসব শিক্ষার্থী ওই পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরকে)।

(vi) প্রাথমিক শিক্ষার শেষে বৃত্তি দেওয়ার জন্য বা Certificate of merit দেওয়ার জন্য অথবা মেধাবী শিক্ষার্থী শনাক্তকরণের জন্য সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

(vii) **বহিঃপরীক্ষার উন্নয়ন :** বহিঃপরীক্ষার উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত paper setter দরকার। প্রশ্নপত্রের প্রকৃতির পরিবর্তন ও মানোন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া দরকার, স্কোরিং পদ্ধতিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করা প্রয়োজন এবং স্কোরিং Script ও ফলাফল নির্ধারণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার।

(viii) **বোর্ড এবং স্কুল প্রদত্ত সার্টিফিকেট :** State Board of School Education বহিঃপরীক্ষার ভিত্তিতে যে Certificate দেবে তাতে পরীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর Performance কীরকম হয়েছে তা লেখা চলবে। তবে পরীক্ষার্থী পাশ বা ফেল করেছে কি না এরকম মন্তব্য Certificate-এ থাকবে না। শিক্ষার্থীকে পুনরায় পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে। সে ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা দিতে পারে অথবা যে পেপারে সে খারাপ করেছে কেবলমাত্র সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিতে পারে।

(ix) শিক্ষার্থীরা স্কুল থেকেও সার্টিফিকেট পাবে। ওই সার্টিফিকেটে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের রেকর্ড ও সর্বাত্মক পরিচয়পত্র থাকবে। এগুলি বোর্ডের সার্টিফিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

(x) **পরীক্ষামূলক স্কুল প্রতিষ্ঠা :** কতকগুলি নির্বাচিত স্কুলকে তাদের নিজেদের ছাত্রদের মূল্যায়নের দায়িত্ব এবং তাদেরকে দশম শ্রেণির পর শেষ পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার দেওয়া উচিত। এদের দ্বারা প্রদত্ত ফলাফল State Board of School Education- এর দেওয়া ফলাফলের সমতুল্য হবে। State Board একটি কমিটি তৈরি করবে যাদের উপর ওই ধরনের স্কুলগুলি নির্বাচনের দায়িত্ব থাকবে। এই ধরনের স্কুলগুলিকে নিজেদের পাঠক্রম তৈরি, টেক্সট বুক নির্বাচন ও শিক্ষামূলক কার্যাবলি ইত্যাদি পরিকল্পনা তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

(xi) প্রতিটি স্তরের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

স্কুল যে সমস্ত লিখিত পরীক্ষা নেবে সেগুলির মানোন্নয়নের প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলকে বহিঃপরীক্ষার সঙ্গে আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের অনুকূল শিক্ষণ, পূর্ণ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

(xii) দশম ও একাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের দুটি বহিঃপরীক্ষা দিতে হবে। যেখানে নবম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠক্রম integrated, সেক্ষেত্রে দশম শ্রেণির শেষে বহিঃপরীক্ষা না হলেও চলবে।

(xiii) দশম বা একাদশ শ্রেণির পর যে পরীক্ষাগুলি হবে তা পরিচালনা করবে Board of Secondary Education। আবার ওই বোর্ড দ্বাদশ শ্রেণির শেষে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। যেহেতু উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে তাই কমিশনের সদস্যদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, সাধারণ পরীক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বোর্ড কেবলমাত্র সাধারণ পরীক্ষা নেবে, আবার রাজ্যে বৃত্তিমূলক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আলাদা বোর্ড থাকা উচিত।

(xv) উচ্চশিক্ষায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বহিঃপরীক্ষার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (শিক্ষক দ্বারা) ব্যবস্থা করতে হবে।

(xvi) বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ কলেজসমূহ দ্বারা অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বহিঃপরীক্ষার পরিপূরক হবে।

(xvii) UGC একটি Central Examination Reform Unit প্রতিষ্ঠা করেন যেটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগ রাখবে মূল্যায়নের ব্যাপারে। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য বিশেষ ইউনিট খুলবে।

(xviii) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নতুন ও উন্নত মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য সেমিনার, আলোচনা ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(xix) পরীক্ষকদের খাতা দেখার জন্য কোনো অর্থ দেওয়া উচিত নয়।

(xx) পরীক্ষা ব্যবস্থায় নম্বর দানের বদলে গ্রেড প্রথা চালু করা উচিত। সুতরাং তৎকালীন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যে ত্রুটিগুলি ছিল সেগুলিকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করে কোঠারি কমিশন যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি করেছিল, কমিশনের সুপারিশের আরও ৪০ বছর অতিক্রান্ত হলেও সেগুলি সবকিছু কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি অথবা কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, ফলে এখনও পর্যন্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ।

স্কুলজোট (School Complex) :

কোঠারি কমিশনের সুপারিশে স্কুলজোটের কথা বলা হয়। কমিশনের সুপারিশে এই সম্পর্কে বলা হয়, কাছাকাছি তিন অথবা চারটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১০ এবং ২৬ টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় একসঙ্গে করে স্কুলজোট তৈরি করা হবে।

স্কুলজোট তৈরির উদ্দেশ্য :

(i) বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন মনোভাব দূর করা।

(ii) তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

(iii) মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে প্রয়োগের কোনো উপযুক্ত পদ্ধতি নিরূপণ করা।

(iv) অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের উপযুক্ত শিক্ষার মান উন্নীত করা।

(v) প্রতিটি স্কুলের বাৎসরিক শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা স্কুলজোটের স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকগণ আলোচনার মাধ্যমে স্থির করবেন। তাঁরা একত্রে স্কুলের উন্নতি বিধানে চিন্তাভাবনা করবেন।

(vi) প্রাথমিক স্কুলজোট এবং এই সমস্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত। এই সীমিত শিক্ষকদের মধ্যে কেউ ছুটি নিলে স্কুলের পঠনপাঠনে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাই স্কুলজোট তৈরি করে দু-একজন reserve শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাঁরা, প্রয়োজনমতো বিভিন্ন স্কুলে সাহায্য করতে পারবেন।

(vii) স্কুলজোটগুলি নতুন Text book-এর মূল্যায়ন করবে। শিক্ষকদের পরিচালনা করতে সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক প্রদীপন তৈরি করবে।

(viii) স্কুলজোটগুলি নির্দিষ্ট থাকার মাধ্যমে পাঠক্রমের পরিবর্তন করবে।

(ix) ওই স্কুলজোটের অধীনে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কাছাকাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করবেন অন্তত মাসে একবার। একইভাবে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। তাঁরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

(x) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের উচ্চবিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে দেখানোর ব্যবস্থা করবে। স্কুলজোটের সদস্যরা হবেন কাছাকাছি বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, উচ্চ-প্রাথমিক ও নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিছুসংখ্যক বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সহযোগী শিক্ষক, জেলার শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষাসংক্রান্ত অফিসার।

স্কুলজোটের পরিকল্পনা কোঠারি কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। এর মাধ্যমে কাছাকাছি বিভিন্ন নিম্নমাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যলয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য এই ধরনের সুপারিশ কার্যকর করলে নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। তবে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এর জন্য সরকারি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method) : কমিশন শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন—

(i) শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতিতে গতিশীলতা ও পরিবর্তন আনতে হবে।

(ii) শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে।

(iii) নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে হবে।

(iv) যে শিক্ষক নতুনভাবে কোনো পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে চান তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

কোঠারি কমিশন দেশ থেকে যথাসম্ভব দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করেন।

(১) প্রতিটি ৫-১১ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা যারা শিক্ষাগ্রহণ করেনি বা শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই স্কুল ত্যাগ করেছে, তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) ১৫-৩০ বছর বয়স্কদের জন্য আংশিক সময়ের সাধারণ এবং বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

নারীশিক্ষা :— কোঠারি কমিশনের পূর্বে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নারীশিক্ষা পরিষদ, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে হংস মেহেতা কমিটি এবং ভক্তবৎসলম কমিটি নারীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা সুপারিশ করে। কোঠারি কমিশনও ওই তিন কমিটির সুপারিশগুলির সঙ্গে একমত হন এবং উক্ত কমিটির নির্দেশগুলি অনুসরণ করে প্রত্যেক রাজ্যে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কথা বলে।

অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতিকল্পে কোঠারি কমিশনের অভিমত—

- SC/ST সম্প্রদায়গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যেসব সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে পাবেন সেগুলি বহাল থাকবে এবং সুবিধা আরও বাড়াতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণির জন্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকাতে আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- অনুন্নত শ্রেণির ছেলেমেয়েদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা এবং বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- উপজাতিদের ভাষায় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হবে।
- উপজাতিদের জন্য স্কলারশিপ আরও বাড়াতে হবে।

❑ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রসঙ্গে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ

কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের সমস্যা ও তার সমাধানের উপর আলোকপাত করে এবং শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য নানা সুপারিশ করেছে।

স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) প্রত্যেকেই প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এ ব্যাপারে তাদের মূল্যবান সুপারিশগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাপ্রবাহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দৈনন্দিন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তা ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান হয় মাঝারি বা খুব নিম্ন প্রকৃতির। এইসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং এখানে বাস্তবতা বর্জিত পাঠক্রম ও গতানুগতিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হয়। এইজন্য কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে।

❑ শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ও বিচ্ছিন্নতা এবং এর প্রতিকার (Removing the Isolation of Teacher-Education) :

কমিশনের মতে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা উন্নতি করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূর করতে হবে। কমিশন তিন প্রকার বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছে। এগুলি হল—

(i) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা : বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাধারণ ধারা থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিতান্ত অবহেলিত হয়।

এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কমিশন শিক্ষাকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ করেছে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাবিজ্ঞানকে ইলেকটিভ বিষয় হিসেবে চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানে দু' বছরের (M.A.) ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই শিক্ষাদানের অনুশীলন বাধ্যতামূলক করতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ গবেষণা প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য একটি শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে।

(ii) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্নতা : কমিশনের মতে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির যোগাযোগ নেই। ফলে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, চাহিদা, সমস্যা ও পঠনপাঠন সম্পর্কে ধারণা ছাড়াই শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কার্য চলে।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হলে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে হবে। এই কাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি সম্প্রসারিত বিভাগ (Extension Department) থাকবে। এই বিভাগের কাজকর্মের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি করে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সংঘ গড়ে তুলতে হবে। মাঝে-মাঝে এই সংঘে সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া সাধারণভাবে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য আরেকটি পন্থা হল প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের কোনো বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা ও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা। এর জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এমন কতকগুলি বিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা এই কাজে উৎসাহিত করতে হবে। সহযোগী স্কুল ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।

(iii) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা : বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিচ্ছন্নতা দূর করার জন্য প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করতে হবে। এদের বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য শারীর শিক্ষা, হস্তশিল্প শিক্ষা, কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের যে বিদ্যালয় আছে সেগুলিকে সামগ্রিক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই সঙ্গে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ বলে কমিশন বর্তমানে তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছিল। যথা—

(i) Comprehensive College স্থাপন করে এখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

(ii) ১৫-২০ বছরের মধ্যে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলেজ স্তরে উন্নীত করতে হবে।

(iii) প্রতি রাজ্যে State Board of Teacher Education প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই বোর্ডের কাজ হবে শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন (Improving the Quality of Teacher-Education) : কমিশনের মতে শিক্ষক-শিক্ষণ মানের যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন কয়েকটি মূলনীতির সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশগুলি হল—

১. পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২. বৃত্তিমূলক পাঠের উন্নয়ন করতে হবে।

৩. শিক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৪. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে।

৫. বিশেষ পাঠস্তর ও কর্মসূচির উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৭. কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্ব হবে দুই বছর। মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্বও দুই বছর হওয়া উচিত। তবে অর্থনৈতিক কারণে যতদিন তা সম্ভব না হয় ততদিন এক বছর হবে এবং শিক্ষাবর্ষের কাজের দিন ১৮০-১৯০ থেকে বাড়িয়ে ২৩০ দিন করা যেতে পারে।

৮. শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় করার চেষ্টা করতে হবে।

৯. ভারতীয় পটভূমিতে কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়ন করা যায় তার জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়াশোনা ও আলোচনার অধিকতর সুযোগ দিতে হবে।

১১. পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দ্বারা শিক্ষণ অনুশীলন এবং তথ্যমূলক ও প্রয়োগমূলক শিক্ষার নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. শিক্ষণ অনুশীলনের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন Demonstration School স্থাপন করতে হবে।

১৩. শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তার সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম ও কর্মসূচি নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে।

১৪. প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য দক্ষ শিক্ষণের ব্যবস্থা (Inservice Training for School Teacher) : বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সংগঠনগুলি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য 'Inservice Training'-এর ব্যবস্থা করবে।

শিক্ষকরা যাতে প্রত্যেক পাঁচ বছর চাকুরির পর ২-৩ মাসের Inservice Training পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশের প্রাথমিক পর্যায়ের ফলশ্রুতি

কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৮ সালের ১৭ জুলাই তারিখে ভারত সরকার সর্বপ্রথম একটি শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে—

➢ সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন অপরিহার্য।

➢ সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি, সামাজিক স্তরের উচ্চপর্যায়ে তাঁদের স্বীকৃতি দান এবং আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা।

➢ ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রবর্তন এবং আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

➢ বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

➢ কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

➢ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান উন্নয়ন এবং অতি অল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।

➢ জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ছয় শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়।

➢ কর্মপ্রকল্প এবং জাতীয় সেবাকর্মের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান।

উল্লিখিত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষা-সম্পর্কিত একটি কার্যকরী সংস্থা (Working Group of Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটির কাজ হল জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশকে শিক্ষা প্রকল্প রূপায়ণে নিয়োজিত করা। কার্যকরী সংস্থার সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকেই ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। তাঁরা সকলেই মনে করতেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নতি একমাত্র শিক্ষার সফল রূপায়ণের উপরেই নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করতে পারলেই ভারতীয় অর্থনীতিতে নতুন জীবন ফিরে আসবে। ভারতবাসীর উন্নতির জন্য যেসকল জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে সেই সকল প্রকল্পের উন্নতি নির্ভর করবে শিক্ষা-প্রকল্পের সাফল্যের উপরে।

এই মৌলিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য শিক্ষা-প্রকল্পসমূহকে রূপায়িত করতে নতুন কর্ম-উদ্যোগ প্রয়োজন—

➢ সকল ভারতবাসীকে শিক্ষায় সমান সুযোগ দান, শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষসাধন, সর্বস্তরের ভারতবাসীর সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সমান অংশগ্রহণ।

ভারতের প্রত্যেকটি যুবক যুবতী এবং পূর্ণবয়স্ক নাগরিকদের এক সুষম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগদান।

১.৪.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮ (National Education Policy -1968)

স্বাধীন ভারতবর্ষে এই শিক্ষা নীতি ছিল একটি মূল্যবান ও সর্বাত্মক শিক্ষা দলিল। কমিশনে আলোচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল এইরকম—

(ক) প্রত্যেক নাগরিকই সে দেশের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ এবং সেই সম্পদের যথাযোগ্য বিকাশ ঘটায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। তাই ভারতের সমাজব্যবস্থায় সর্বদাই শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই জাতির উন্নতিতে শিক্ষার ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। গান্ধিজি বুনিয়াদি শিক্ষা

পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যেখানে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনমূলক শিক্ষার সমন্বয়ের কথা বলে হয়েছে। এই সময় গ্রাম-জীবনভিত্তিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে আরও অনেক জাতীয় নেতাদের জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে নানা অবদান আছে।

(খ) ভারত সরকার উপলব্ধি করে যে, ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিশন যে ব্যাপক শিক্ষা পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়েছে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, জাতীয় সংহতিবোধ জাগ্রত করার জন্য আদর্শ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা উপলব্ধির জন্য শিক্ষা পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় যোগসূত্র রচনা করা, শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার সর্বস্তরের মানের উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের জন্য শিক্ষানীতির ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

(গ) উপরোক্ত নানা প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ভারত সরকার শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে—

১. **অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা :** সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫নং ধারার বাস্তব রূপ দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। এখানে আরও বলা হয়, ১৪ বছর পর্যন্ত সব শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক উন্নত মানের কার্যকর শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভরতি নিশ্চিত করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. **শিক্ষকদের যোগ্য মর্যাদাদান, বেতন প্রদান ও যোগ্য শিক্ষাদান :**

(i) যেসব কারণে শিক্ষার মান ও জাতির বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা নির্ভর করে, তাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলি, চরিত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাদানের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণগুলির উপর শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করে। তাই শিক্ষককে সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। তাঁদের যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুসারে তাঁদের বেতন ও চাকুরির সুবিধা দিতে হবে।

(ii) শিক্ষকরা যাতে স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন গবেষণা-পত্র প্রকাশ করতে পারেন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে ও লিখতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁদের সুযোগ দিতে হবে।

(iii) শিক্ষকদের শিক্ষালাভ, বিশেষত চাকুরিরত অবস্থায় শিক্ষণলাভের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৩. **ভাষাসমূহের উন্নতি :**

(i) আঞ্চলিক ভাষাসমূহ : ভারতীয় ভাষাগুলির ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি না ঘটলে দেশবাসীর সৃজনাত্মক দিকটির বিকাশ ঘটবে না, শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না, জ্ঞানের বিস্তার হবে না এবং বুদ্ধিজীবী মানুষ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এদের ব্যবহারকে প্রসারিত করতে হবে।

(ii) ত্রিভাষা সূত্র : মাধ্যমিক স্তরে রাজ্য সরকারের ত্রিভাষা সূত্র কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। ত্রিভাষা সূত্র বলতে বোঝায় একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দিভাষী রাজ্যে যেটি একটি দক্ষিণী ভাষা হওয়া উচিত এবং অহিন্দিভাষী রাজ্যে যেটি আঞ্চলিক ভাষা হবে), হিন্দি এবং ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে উন্নত মানের হিন্দি ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) **হিন্দি ভাষা :** হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। হিন্দিকে একটি যোগসূত্রকারী ভাষা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে ও খেয়াল রাখতে হবে সংবিধানে নির্দেশিত ৩৫১নং ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখতে যেন ভারতের গৌরবব্যঞ্জক বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সব উপাদান প্রকাশ করা যায়। অহিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যে হিন্দিশিক্ষার জন্য কলেজ ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যেখানে থাকবে হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার উৎসাহ।

(iv) **সংস্কৃত:** ভারতীয় সমস্ত ভাষাগুলির উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের একটি বিশেষ অবদান আছে। কারণ সংস্কৃতকেই ভারতের যাবতীয় ভাষাসমূহের জননী বলে অধিকাংশ শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন। তাই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে। এই ভাষাশিক্ষার জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। স্নাতক স্তরে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাশিক্ষা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভারত তত্ত্ব, ভারতীয় দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভাষার শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হবে।

(v) **আন্তর্জাতিক ভাষা :** ইংরেজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বে জ্ঞানের ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, অভাবনীয় উন্নতি হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার। ভারত শুধু এই উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে না, তাকে এইসব ক্ষেত্রে নিজের বিশ্বজনীন অবদানও রাখতে হবে। স্বাভাবিক কারণে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা একান্তই প্রয়োজন।

৪. **শিক্ষার সমসুযোগ প্রস্তাবে বলা হয় শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। সেই সুযোগ বণ্টনের বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি দেওয়া হয় :**

(i) শিক্ষালাভের সুযোগের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য আছে তার সংশোধন করতে এবং গ্রামীণ এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) সামাজিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিশন যে 'কমন স্কুলের' কথা বলেছেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধি করতে হবে, 'পাবলিক স্কুল' বা 'বিশেষ স্কুলে' মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভরতি করতে হবে। কিছু মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। সংবিধানের ৩০নং ধারায় যে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার সুযোগের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(iii) বালিকাদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য নয়, সামাজিক উন্নতির জন্যেও বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

(iv) অনুন্নত শ্রেণি বিশেষত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

(v) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তারা যাতে সাধারণ স্কুলে পড়তে পারে সে জন্য সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করতে হবে।

৫. **মেধার অন্বেষণ :** বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের বিশেষ মেধা বা প্রতিভা আছে যতশীঘ্র সম্ভব তা অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে। তাদের প্রতিভা স্ফুরণের যথোচিত ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৬. **কর্ম-অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিসেবা :** পারস্পরিক পরিষেবা ব্যবস্থা ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে বিদ্যালয় ও সমাজকে পরস্পরের কাছে আসতে হবে। কর্ম অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিষেবার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করা

শিক্ষাসূচির একটি অঙ্গ। এই কর্মসূচি জাতীয় পুনর্গঠনেও সাহায্য করে। এর ফলে স্বনির্ভরতা, চরিত্রগঠন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মনোভাব গড়ে উঠবে স্বাভাবিকভাবে।

৭. **বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণা :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার গবেষণার একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮. **কৃষিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা :** বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে এই দুটি শিক্ষা বিষয়ে।

(i) কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। সুতরাং প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেই খুব ভালো হয়। তবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৃথক পৃথক কলেজেও পড়াবার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ii) শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণলাভ করার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিল্পকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে নিয়ত যোগাযোগ ও সহযোগিতা করার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বিশেষভাবে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে হবে।

(iii) দেশের কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের চাহিদা কতখানি তা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এবং চাহিদা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মানবশক্তি জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতে স্বচ্ছল উপার্জনের সুযোগ সর্বদা থাকে।

৯. **পাঠ্যপুস্তক রচনা :** প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ যেন শিক্ষার মানোন্নয়নে উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন সেজন্য তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে এবং যোগ্য সম্মান দিতে হবে। স্কুল ও কলেজের জন্য উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্য বই-এর দাম সীমিত রাখতে হবে যেন তা ছাত্ররা সহজে কিনতে পারে।

একটি ‘স্বশাসিত পুস্তক আয়োগ’ গঠন করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সারা দেশে কয়েকটি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক চালু করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু পাঠ্যপুস্তক ও আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুস্তক রচনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১০. **পরীক্ষাব্যবস্থা :** পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে যাতে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা বজায় থাকে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উন্নয়ন বিচার করা সম্ভব হবে।

১১. **মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা :**

(i) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নতির একটি অন্যতম পদ্ধতি। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ii) কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তবে এই ধরনের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে খতিয়ে দেখা দরকার উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন কতখানি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ওষুধ শিল্প ও জনস্বাস্থ্য, গৃহ ব্যবস্থাপনা, শিল্পকলায় এই বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করতে হবে।

১২. **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা :**

(i) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভরতির সংখ্যা স্থির করতে হবে।

(ii) বিশেষ বিবেচনা করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করে তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষার মানও বজায় রাখতে হবে।

(iii) স্নাতকোত্তর স্তরের পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) উন্নত শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে আরও সংগঠিত করতে হবে এবং এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নিয়ে 'গুচ্ছ' তৈরি করে সর্বোচ্চ মানের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(v) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণাগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অধীনে রাখা উচিত, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগরক্ষা করে তাদের কাজ করা উচিত।

১৩. আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষা :

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে মাধ্যমিক স্তরে, শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্যও। পূর্ণ সময়ের শিক্ষার সমমর্যাদা দিতে হবে এ ধরনের শিক্ষাকে। এর ফলে যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় অথচ আরও শিক্ষালাভে ইচ্ছুক থাকে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

১৪. সাক্ষরতা প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষা :

(i) জাতীয় উন্নতির দ্রুত প্রসার এবং সার্থকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হলে সাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে হবে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক, শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের কার্যকারী সাক্ষরতা অবশ্যই দিতে হবে। সরকার অধিকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। শিক্ষক ও ছাত্রদের সাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(ii) কমবয়েসি কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষরতাদানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর কাজের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১৫. খেলাধূলা :

দেশের খেলাধুলার বিশেষ উন্নতি ঘটাতে হবে। যারা এ বিষয়ে প্রতিভাবান তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ ছাত্রদেরও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও খেলোয়াড়সুলভ শারীরিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে খেলার মাঠ বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা নেই সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেইসব সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

১৬. সংখ্যালঘুদের শিক্ষা : সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

১৭. শিক্ষাকাঠামো : দেশের সর্বত্র মোটামুটি একই ধরনের শিক্ষাকাঠামো থাকা বিশেষ সুবিধাজনক। শিক্ষাকাঠামো হওয়া উচিত ১০ + ২ + ৩। যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেই অনুযায়ী + ২ স্তরের শিক্ষা স্কুলে বা কলেজে দেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) উপরিউক্ত শিক্ষা-পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিগুলি কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ অন্তত শিক্ষাখাতে ব্যয় করা প্রয়োজন।

(ঙ) ভারত সরকার উপলব্ধি করেছে যে, শিক্ষা পুনর্গঠন করা খুব সহজ কাজ নয়। শুধু অর্থের ঘাটতি নয়, আরও নানা জটিল দিক আছে। শিক্ষার, বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন দেশের বস্তুগত ও মানবসম্পদের

যথাযথ ব্যবহারের জন্য। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজস্ব কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিকাশের জন্য যেসব কর্মসূচি রাজ্য সরকারগুলি গ্রহণ করছে, সেক্ষেত্রেও সাহায্য করবে। এখানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হবে।

(চ) ভারত সরকার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে ও ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য নির্দেশনা দেবে।

১.৪.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (National Education Policy 1986)

ভারতবর্ষের শিক্ষার সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আগস্টে রাজীব গান্ধি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি নিজেদের সকল শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহমতের ভিত্তিতে Challenge of Education : A Policy Perspective নামে একটি আলোচনা পত্র প্রকাশ করেন। ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে এপ্রিল মাসে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। CABE উক্ত খসড়া (জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া) প্রস্তাবটি বিচার বিশ্লেষণ করে তা অনুমোদন করে এবং এটিকে গ্রহণের সুপারিশ করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে পাঠান। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে (National Development Council) তা অনুমোদন করার পর ১৯৮৬ সালের মে মাসে বিলটি সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত হয়।

ভারত সরকার ঘোষিত ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ১২টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি 'ভূমিকা' এবং শেষ অংশটি 'ভবিষ্যৎ' নামে পরিচিত। বাকি ১০টি অধ্যায়ে দেশের শিক্ষার গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এখানে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপিত করে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন প্রকাশের পর স্বভাবতই নানা ধরনের আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। সমস্ত সমালোচনাকেই যে যথোচিত মূল্য দেওয়া হয়েছে তেমন নয়। কিছু কিছু সংশোধনী অবশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। যাই হোক ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত জাতীয় শিক্ষানীতির মূল বিষয়গুলি হল—

১। শিক্ষায় অসাম্য দূর করা হবে।

২। অসাম্য দূর করবার জন্যই মেয়েদের শিক্ষায় নজর দেওয়া হবে।

৩। তপশিলি বর্ণ ও উপজাতির শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বঞ্চিতদের প্রতি নজর দেওয়া হবে।

৫। ১৫-৩৫ বছরের বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

৬। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৭। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

৮। বিদ্যালয়-ছুট (drop-out) ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৯। বিশেষ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য উৎকর্ষ স্কুল 'নবোদয় বিদ্যালয়' স্থাপন করা হবে।

১০। স্বশাসিত উৎকর্ষ কলেজ করা হবে।

১১। শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার করা হবে।

১২। গণপ্রচার মাধ্যম এবং দূরাগত শিক্ষার সাহায্যে সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা হবে।

১৩। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডাকযোগে শিক্ষার সাহায্যে বয়স্কদের উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ করা হবে।

১৪। পাঠক্রমে সাংস্কৃতিক বিষয়কে যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে।

১৫। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার করা হবে।

১৬। চাকরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্ন করা হবে।

১৭। শিক্ষাকে রাজনীতি মুক্ত করা হবে।

১৮। শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হবে।

১৯। বৃত্তিশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হবে এবং সাধারণ শিক্ষা থেকে বৃত্তিশিক্ষার দিকে ছেলেমেয়েকে নিতে হবে।

২০। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে এবং শিক্ষকদের আচরণবিধি অনুসরণ করতে হবে।

২১। শিক্ষার ব্যবস্থাটি হবে ১০ + ২ + ৩ অর্থাৎ (৫ বছরের প্রাথমিক, ৩ বছরের নিম্ন-প্রাথমিক, ২ বছরের মাধ্যমিক — মোট ১০ বছর এবং ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক ও ৩ বছরের স্নাতক স্তর।)

২২। ত্রিভাষা সূত্রই (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত) চালু থাকবে।

২৩। ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রতিটি জেলায় District Institute of Education and Training প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক, নন্-ফরম্যাল ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের চাকুরিরত অথবা চাকুরি-পূর্ব অবস্থায় (in service ও pre-service) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এগুলি SCERT-র কার্যের পরিপূরক হবে।

২৪। NPE ১৯৮৬-তে শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নের জন্য National Council for Teacher Education (NCTE)-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর প্রধান কাজ হবে সারা দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি নজর রাখা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানের উন্নয়ন ঘটানো।

এ ছাড়াও রয়েছে অনেক ছোটোখাটো কথা, যেমন— শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষার সমসুযোগ, মেধা অন্বেষণ, কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় সেবা প্রকল্প, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা, কৃষিশিক্ষা, উঁচু মানের বই লেখানো এবং প্রকাশনা, খেলাধুলার ব্যাপক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন প্রকাশিত হওয়ার পরে সারা দেশে নিরন্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে ওই নীতি প্রয়োগের কাজ শুরু হয়েছে।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল—

১। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সারা দেশে ৪৮টি অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়।

২। বিদ্যালয়ের ৩ জন করে শিক্ষককে কম্পিউটার সাক্ষর করে তোলার জন্য বলা হয়েছে।

৩। প্রথামুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও বর্তমান কেন্দ্রগুলির উন্নয়নসাধন।

৪। দূর শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা চ্যানেলের মাধ্যমে দূরদর্শনে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান ক্রয় করার কথা বলা হয়।

৫। বেশ কয়েকটি গতি নির্ধারক বিদ্যালয় বা নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। জমি, ব্যয়ভার নিয়ে টানাপোড়েনের জন্য নবোদয়ের যথার্থ উদয় হয়নি।

৬। উৎকর্ষ কলেজ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের কর্মসূচি (১৯৮৬) : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর তা রূপায়ণের জন্য একটি প্রোগ্রাম অফ্ অ্যাকশন রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কারণে ২৩টি টাস্কফোর্স গঠন করে। প্রত্যেককে একটি করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে এই প্রোগ্রাম অফ্ অ্যাকশনটি সংসদে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। এখানে যে সমস্ত মূল ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয় সেগুলি হল —

প্রোগ্রাম অফ্ অ্যাকশন-এর মূল ক্ষেত্র :

আর্লি চাইল্ড হুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষা, নন-ফর্মাল এডুকেশন এবং অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড। মাধ্যমিক শিক্ষা ও নবোদয় বিদ্যালয়। শিক্ষার বৃত্তিকরণ। উচ্চশিক্ষা, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দূরাগত শিক্ষা, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি এবং ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন। চাকরি থেকে ডিগ্রিকে পৃথক করা ও জনশক্তি পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন, নারীর সমানাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা, তপশিলি জাতি, উপজাতির শিক্ষা। সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পরীক্ষা সংস্কার, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ, শিক্ষক ও তাঁদের প্রশিক্ষণ।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি :

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এবং ভারতবর্ষেও বর্তমান সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীনতা দান করার কাজটি অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই সঙ্গে এও উপলব্ধি করা হয়েছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে যে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সফলতা কেবলমাত্র একখাতে চলতে থাকা প্রথাবদ্ধ শিক্ষার মাধ্যমে আসবে না। এর জন্য চাই বহুমুখী উদ্যোগে একাধিক প্রণালী। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান সময়ে প্রথামুক্ত শিক্ষাকে একটি সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে স্কুল-ছুটদের (Drop-out) শিক্ষাদান করা সম্ভব হচ্ছে। বাস্তবিক ফর্মাল স্কুল ব্যবস্থা বা শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিপূরকতা দান করতে সক্ষম এই বিকল্প নন-ফর্মাল শিক্ষাদান পদ্ধতিটি।

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন :

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা ও সেই নীতি রূপায়ণের জন্য কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ঘোষণার সময় থেকেই ভারতীয় শিক্ষার সর্বস্তরে উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শিক্ষার একটি সার্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়। তাদের চাহিদাও প্রয়োজনভিত্তিক হয়। নানা বয়সের নানা ধরনের শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

নন-ফর্মাল শিক্ষাব্যবস্থা :

নন-ফর্মাল শিক্ষা প্রসঙ্গে, একটি নিয়মানুগ বৃহদায়তনিক নন-ফর্মাল কর্মসূচি গ্রহণের কথা নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল। বিদ্যালয়-ছুট বা বিদ্যালয়ে নেই এমন কোনো অঞ্চলের শিশুদের জন্য, কর্মরত শিশুদের জন্য বিশেষত কন্যাসন্তানদের জন্য, যারা সারাদিনের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে অপারগ তাদের জন্য বিশেষভাবে এই নন-ফর্মাল শিক্ষাব্যবস্থা স্তরের কথা বলা হয়েছে। আর এসব নন-ফর্মাল শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় গুণসম্পন্ন ও আগ্রহী উৎসাহী যুবক-যুবতিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানের কথাও বলা হয়েছিল। ফর্মাল ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায়, নন-ফর্মাল ব্যবস্থার শিক্ষার মান সমভাবে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম :

Early Childhood Care and Education শিশু এবং শিশুশিক্ষার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্বদান করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এই আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার বা প্রাক্‌শৈশব অবস্থা থেকেই শিশুর প্রতি যত্ন নেবার কথা বলে। বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিশুরা বা যেসমস্ত শিশু প্রথম প্রজন্ম হিসাবে শিক্ষার আঙিনায় আসবে। বিশেষভাবে ভারতের মতো বিকাশশীল দেশের ক্ষেত্রে।

শিশুর বিকাশে গুরুত্ব :

শিশুর বিকাশের সবকটি দিকের উপরই গুরুত্ব এবং নজর দিয়ে তার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, সামাজিক, মানসিক, শারীরিক, নৈতিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়। এই সুবাদে এই '**Early Childhood Care and Education (ECCE)**' সর্বাধিক গুরুত্ব পায় ও বলা হয় সর্বাত্মক শিশু বিকাশ পরিসেবা কার্যসূচির সঙ্গে সংগতির রেখেই এ ব্যাপারে উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হবে। **Day Care Centre**-গুলি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত কর্মরত মায়েদের দিকে তাকিয়েই এই ডে কেয়ার সেন্টারগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

ECCE-এর কর্মসূচি :

এই ECCE কর্মসূচি হবে শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশু বিকাশ সহায়ক। শিশুর স্বাতন্ত্র্যের দিকে নজর রেখে, খেলাধুলার উপর গুরুত্ব দিয়ে এই ক্ষেত্রের কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের চেষ্টা করা হবে। প্রথাগত পদ্ধতি ও তিনটি 'R'-এর অন্তর্ভুক্ত এইসব কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছে।

শিশুর যত্ন ও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এই দুই-এর মধ্যে একটা সমন্বয় বা সংহতি স্থাপনের কথা বলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের জন্য যে দুটিরই প্রয়োজন সর্বাধিক। সার্বিকভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার কর্মসূচিকে জোরদার করার লক্ষ্যেই এই ECCE কর্মসূচির আয়োজন। এই সুবাদেই স্কুল হেলথ্ প্রোগ্রামকেও পরবর্তী ধাপে জোরদার করা সম্ভবপর হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

১.৪.৬ রামমূর্তি কমিটির সুপারিশ : ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতির পরিবর্তিত খসড়া (Committee for Review of National Policy on Education, ১৯৮৬)

রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার ১৯৮৬ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরী করার জন্য **আচার্য রামমূর্তিসহ দেশের ১৭ জন শিক্ষাবিদকে** নিয়ে একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করেন। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন সুপারিশ করা এবং নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে তা বাস্তবায়িত করার জন্য-এর অধীনে ৬টি ছোটো কমিটি গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই কমিটিতে অন্যতম সদস্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ভাস্কর রায়চৌধুরী।

রামমূর্তি কমিটির উদ্দেশ্য :

১. শিশুর দেশ

২. শিশুর সর্বোত্তম ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

৩. শিক্ষার্থীর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রামীণ পুনর্গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; বিশেষত উন্নয়নের কাজ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই করতে হবে।

রামমূর্তি কমিটির মতে শিক্ষার লক্ষ্য :

কমিটির মতে - শিক্ষাকে সমাজের তৃণমূলে প্রসারিত করতে হবে। সকলেই যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে তাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও রামমূর্তি কমিটি :

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খুব সামান্য বেতন দেয়। তাই সরকারকে উচ্চশিক্ষার জন্য বেশি ভর্তুকি দিতে হয় যা গরিব মানুষের উপর অতিরিক্ত কর চাপতে বাধ্য হচ্ছে।

নবোদয় বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলেন, স্বয়ংশাসিত সংস্থা পরিচালিত হলেও এগুলি কেন্দ্রের বিষয়। রামমূর্তির মতে গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক স্তর অবধি শিক্ষা 'পঞ্চায়েতি রাজ' প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা উচিত।

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে রামমূর্তি কমিশনের মত :

শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে এবং শিক্ষার ব্যাপারে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানোর জন্য শিশুর মানসিক, সামাজিক, শারীরিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষাকে কর্মোপযোগী করে তুলতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জনগণের যৌথভাবে কর্মসূচি গড়ে তোলা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) সংশোধিত খসড়া (Revised Draft of National Policy on Education ১৯৮৬) :

১৯৯০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় মোর্চা সরকার ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি পুনর্বিবেচনা করে তা সংশোধন করবার জন্য আচার্য রামমূর্তির সভাপতিত্বে একটি রিভিউ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল—

(১) ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং তার যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা।

(২) এই শিক্ষানীতি সংশোধনের সুপারিশ করা।

(৩) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশোধিত শিক্ষানীতি রূপায়ণের কর্মসূচি স্থির করা।

কেন্দ্রীয় সরকার রামমূর্তি রিভিউ কমিটিকে যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বলেছিলেন সেগুলি হল—

(ক) তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে।

(খ) শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্য দরকার।

(গ) আমাদের সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করা ও কর্মের বন্দোবস্ত করা।

(ঘ) সমাজে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের বিকাশসাধন করা।

রামমূর্তি রিভিউ কমিটির সুপারিশ (Recommendations of Review Committee of Ramamurty) :

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিকে জাতীয় মোর্চা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সংশোধিত করে ১৯৯০ সালের ২৬ ডিসেম্বর রামমূর্তি রিভিউ কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) যে সংশোধিত খসড়াটি পেশ করেন তার শিরোনামটি ছিল Towards an Enlightened and Human Society। এই সংশোধিত খসড়াটির মূল সুপারিশগুলি হল—

(১) জাতীয় বিদ্যালয় প্রথার (Common School System) বিকাশসাধন করতে হবে। এর জন্য সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির মানের উন্নতিসাধন করতে হবে।

(২) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান সাধন করতে হবে। এর জন্য গ্রামাঞ্চল এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) নারীশিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

(৪) শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ করতে হবে।

(৫) পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করতে হবে।

(৬) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে ইংরেজি ভাষার অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য উচ্চশিক্ষা এবং চাকরি লাভের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

(৭) ভারতের শিক্ষার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে স্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে, যাতে তারা শিক্ষাদান এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সারাবছর ব্যাপী তাদের নিজস্ব পদ্ধতি চালু করতে পারে।

(৯) শিক্ষার সর্বস্তরে মূল্যবোধ শিক্ষাদানের (Value education) ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই শিক্ষার দ্বারা যাতে ছাত্রছাত্রীরা চারিত্রিক উন্নতি লাভ করতে পারে, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয় এবং মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(১০) শিক্ষার জন্য সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র বেতন ও পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

নন-ফর্মাল ব্যবস্থা : রামমূর্তি কমিটির সুপারিশে বলা হয় non-formalise the formal school. অর্থাৎ নন ফর্মাল বৈশিষ্ট্য ফর্মাল বিদ্যালয়ে অনুপ্রবিষ্ট করতে হবে।

- গ্রাম শিক্ষা কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে— শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে একেবারে সাতসকাল থেকে শুরু করে বিকেল, সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যালয় বসার ব্যবস্থা করতে হবে। দফায় দফায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এই স্কুলগুলি বসবে। একই বাড়িঘর বার বার ব্যবহার করা যাবে।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে বিজ্ঞানসম্মত। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, গল্প বলা, লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহকে সৃজনাত্মকভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- কর্মরত শিশুদের বিশেষত মেয়েদের সুবিধামতো দিনের কোনো সময় বা মাসে বা বছরের কোনো সময় তারা স্কুলে আসতে পারবে তা বিবেচনা করে, সেইমতো সুযোগ করে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে দিনে দুবার ক্লাস বসাতে হবে।
- আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন (ECCE) সারফল ০-৬ বছর বয়সি শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের বিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

প্যারা শিক্ষক নিয়োগ : যতদূর সম্ভব স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে থেকেই এই শিক্ষাকর্মী বা প্যারা টিচার নিযুক্ত হবেন। মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্যারা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। DIET থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১.৪.৭ কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা, ১৯৯২ (The Programme of Action - POA, ১৯৯২)

জনার্দন কমিটি সামগ্রিকভাবে রামমূর্তি কমিটির সংশোধিত খসড়াটিকে অনুমোদন করেন। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনার্দন কমিটি নতুন কতকগুলি সুপারিশ করেছিলেন। জনার্দন কমিটির সুপারিশগুলি অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) চূড়ান্ত খসড়াটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে পার্লামেন্টে ঘোষিত হয় এবং গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) ওই চূড়ান্ত খসড়া অনুযায়ী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তাকে POA বলা হয়। এই কর্মসূচির মূল বিষয়গুলি নীচে দেওয়া হল—

কর্মসূচি : শিক্ষাকাঠামো : ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মূল জাতীয় শিক্ষীনীতিতে ১০ + ২ + ৩ এই শিক্ষাকাঠামোর প্রথম দশ বছরকে ৫ + ৩ + ২ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪ বছরের ন্যূনতম আবশ্যিক শিক্ষাস্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা (৫ বছর) এবং উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা (৩ বছর)—এই দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। আর বাকি দু-বছরের জন্য ছিল উচ্চ বিদ্যালয় (High School) শিক্ষা।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের রূপায়ণ কর্মসূচিতে উপরোক্ত কাঠামোটি বজায় রাখা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে +২ স্তরের শিক্ষাকে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) সারা দেশে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ এই শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত।

বিদ্যালয় ছুট এবং জাতীয় মিশন :

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের রূপায়ণ কর্মসূচিতেও স্কুলছুটদের সমস্যার উৎপত্তি, কারণ ও সমাধানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখার জন্য সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন এমনকী অভিভাবকদের শাস্তিদানের কথাও বলা হয়েছিল। তবে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষানীতিতে যেখানে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত এদেশের সমস্ত শিশুকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেখানে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের রূপায়ণ কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল যে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার আগেই ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে সন্তোষজনক মানের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দিতে হবে। এই লক্ষ্যপূরণ করার জন্য একটি জাতীয় মিশন চালু করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ :

মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ সম্বন্ধে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল যে, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং শতকরা ২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বৃত্তিশিক্ষা দিতে হবে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের রূপায়ণ কর্মসূচিতে ওই সময়সীমাকে বাড়িয়ে যথাক্রমে ১৯৯৫ ও ২০০০ খ্রিস্টাব্দ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের অধিকাংশ যাতে চাকরি লাভ করে কিংবা স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিতভাবে বৃত্তিশিক্ষার পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা করতে হবে এবং সরকারকে চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি এমনভাবে পুনর্বিবেচনা করতে হবে যাতে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

এরনাকুলাম সার্বিক সাক্ষরতা প্রচার অভিযান :

কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প পর্ব থেকেই সাক্ষরতা প্রসার অভিযান কার্যক্রমে সক্রিয় থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কেরালায় সম্পূর্ণ সাক্ষরতা বিধানের উদ্দেশ্যে একটি ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলতে থাকে। এরপর NAEP-এর সীমাবদ্ধতার নিরিখে ওই পরিকল্পনাটি পুনর্বিবেচনা করে, অন্য আকারে রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বেচ্ছামূলক সাক্ষরতা বিস্তার কার্যসূচি থেকে লব্ধ অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং জনতার বিজ্ঞান আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে গণ সাক্ষরতা সৃষ্টি ও বিজ্ঞান চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই KSSP কাজ করতে থাকে। NLM লাগু হওয়ার পর এরনাকুলাম জেলাটিতে KSSP পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সার্বিক সাক্ষরতা প্রসারকামী উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি থেকে সরকারি সহায়তা, স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ যুগপৎ কাজে লাগিয়ে প্রকল্পটি লাগু করা হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই প্রকল্পটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে সমাপ্ত হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এরনাকুলাম ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৮৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৫ লক্ষ জন জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মান অনুযায়ী সাক্ষরতা ও গণক্ষমতা আয়ত্ত করে। এরনাকুলামের সাক্ষরতা ৭৭% থেকে ৯৮%-এ উন্নীত হয়। এই সাফল্য পূর্বের জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির নানাবিধ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠে, নতুনভাবে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মাধ্যমে সাক্ষরতা প্রসার অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে দিক্‌নির্দেশ করে। অতঃপর নব শিক্ষানীতি, ১৯৮৬-এর মধ্যেও প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশনের (POA) মধ্যেও পরিবর্তন আনা হয় এবং তা POA ১৯৯২-এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

অগ্রগতি নিরীক্ষা (Check Your Progress)

- স্বাধীনতার পরে ভারতে প্রথম কমিশন কোন্‌টি?

  (ক) মুদালিয়র কমিশন

  (খ) কোঠারি কমিশন

  (গ) রাধাকৃষ্ণণ কমিশন

  (ঘ) ভক্তবৎসলম কমিটি

- ভারতের কোন্ কমিশন সর্বপ্রথম সর্বস্তরের শিক্ষাকে পর্যালোচনা করেছে?

  (ক) লর্ড কার্জনের কমিশন

  (খ) মুদালিয়র কমিশন

  (গ) কোঠারি কমিশন

  (ঘ) জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)

- **বিদ্যালয় গুচ্ছ**-এর ধারণা কোন্ কমিশনে দিয়েছে?

  (ক) মুদালিয়র

  (খ) কোঠারি

  (গ) জাতীয় শিক্ষানীতি

  (ঘ) রাধাকৃষ্ণণ কমিশন

১.৫ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

এই এককটির প্রথমেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি পেয়েছি। তারা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করেছেন, গণ শিক্ষার পথকে রুদ্ধ করেছিল। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঔপনিবেশিক শোষণের কিছু পরিবর্তন পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক, নেতিবাচক এবং জাতীয় আন্দোলন শুরু এই তিনটি প্রভাব দেখতে পাই।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষাব্যবস্থায় আদি-খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদানকে স্বীকার করতে হয়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে লন্ডন মিশনারি, চার্চ মিশনারি, স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কার্যকলাপ বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিল। ১৮১৩ সনদ আইন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের পর মেকলের বক্তব্য। অ্যাডামের রিপোর্ট যা ভারতের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলে। উড-এর ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন, লর্ড কার্জন-এর শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে প্রশস্ত করেছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে CABE শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সচিবালয়, Central Bureau of Education, UGC গঠন করা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সার্জেন্ট রিপোর্ট ভারতে পরবর্তী শিক্ষা-পরিকল্পনা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

স্বাধীনোত্তরকালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রসারের কথা বলা হয়। মুদালিয়র কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচিত হয়। কোঠারী কমিশন প্রথম কমিশন যেখানে প্রাক্-প্রাইমারি থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সবরকমের শিক্ষার নানা দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা

রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬-তে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। অপচয়, বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। রামমূর্তি কমিশনে Common School System প্রথা চালু করার কথা বলা হয়েছে। POA-তে ১০+২+৩ শিক্ষাকাঠামোর কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয় ছুট রোধ করতে হবে। বৃত্তিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, KSSP জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু রাখা।

১.৬ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১. ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থা স্থায়ী করার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

২. ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করুন।

৩. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

৪. আদি পর্বের মিশনারিদের একটি তালিকা প্রদান করুন।

৫. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে কোন্ কোন্ মিশনারি সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল?

৬. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের ৪৩নং ধারায় কী বলা হয়েছিল?

৭. প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের অবদান কী ছিল?

৮. বুনিয়াদি শিক্ষা কী?

৯. সার্জেন্ট রিপোর্ট কী?

১০. জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)-তে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল?

১১. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশগুলির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১২. মুদালিয়র কমিশনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১৩. কোঠারি কমিশন প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কী সুপারিশ করেছিল?

১৪. জাতীয় শিক্ষানীতির সংশোধিত খসড়ায় প্রাক্-শৈশব ও প্রারম্ভিক শিক্ষা বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

১৫. জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)-র পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে রিভিউ কমিটির মূল নীতি কী ছিল?

১৬. Programme of Action-১৯৯২-এর কর্মসূচির মূল বিষয়গুলি কী ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জ (Reference)

১. Banerjee J.P., EDUCATION IN INDIA, March ২০১০.

২. B.R. Purkait, Milestones of Indian Education.

৩. India's Ancient Past - R.S.Sharma.

৪. Contemporary India and Education — Dr. Ms Sachdeva, K.K. Sharma, Chanchal Kumar & Sunita Sharma.

৫. দেবাশিষ পাল (২০১৫), প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে সমকালীন শিক্ষা, রীতা পাবলিকেশন।

অধ্যায় ২ ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রের কাঠামো (প্রাক্-স্বাধীন ও স্বাধীনোত্তর কাল)

(STRUCTURE OF INDIAN NATION STATE (PRE AND POST INDEPENDENCE ERA)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.৩ ভারতীয় জাতি ও রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; ঔপনিবেশিক কৌশলসহ ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতা (Institutional Structures of Indian Nation State; Continuities and Breaks with the Colonial apparatus)

২.৪ স্বাধীন ভারতবর্ষের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি : পূর্ব ও বর্তমান (Constitutional Vision of Independent India : Then & Now)

২.৫ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : দল ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী রাজনীতি কেন্দ্র এবং রাজ্য, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ (Democratic Systems and Institutional Structures : Party System and Electoral Politics, The Centre and the State, the Judiciary, Legislature and Executive)

২.৬ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। জাতি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আলোচনা করতে হলে প্রথমে জাতি কী, রাষ্ট্র গঠনের নানাবিধ প্রধান ও অপ্রধান উপাদান সম্পর্কে ধারণা গঠন প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক শাসনের নানা ওঠা-পড়া বা ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হলে তার নিজস্ব একটি সংবিধান থাকাও আবশ্যক।

ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার পূর্বেই সংবিধান রচয়িতাগণ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পূর্ব ও পরবর্তী দিক্-নির্দেশিকা তাঁদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সংবিধান ও তার প্রস্তাবনায় তুলে ধরেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রভাব তাই সংবিধানে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান তাই পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থেকে শুরু করে পিরামিডসদৃশ অখণ্ড বিচারব্যবস্থা সবই সংবিধানে স্থান পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সফল হতে গেলে একান্তই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল দলীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমেই শাসনক্ষমতার পালা বদল হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সরকারি ব্যবস্থাকে সাবলীল ও সচল থাকতে সাহায্য করে। সরকারের তিনটি বিভাগ পর্যালোচনা করলে তবেই ভারত রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ও তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব হবে।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা—

- জাতি ও রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভারত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে।
- দলীয় ব্যবস্থা ও নির্বাচনী রাজনীতি পর্যালোচনায় সক্ষম হবে।
- সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে।

২.৩ ভারতীয় জাতি ও রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; ঔপনিবেশিক কৌশলসহ ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতা (Institutional Structures of Indian Nation State; Continuities and Breaks with the Colonial Apparatus) :

সুদীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতবর্ষ একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা না থাকলে জাতি রাষ্ট্র গঠন জানা সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

- **জাতি :** গার্নার-এর মতে, ইংরেজি 'Nation' শব্দটি ল্যাটিন 'Natio' শব্দ থেকে উদ্ভূত। শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ জাতি। বাংলায় অবশ্য এই শব্দটিকে জাতপাত (Caste), বর্ণ (Varna), কুল (Race) অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই 'নেশন' শব্দটি সরাসরি বাংলায় ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ভাষায় ''নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তপ্রকৃতি গঠন করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত আর একটি বর্তমানে।...''

  বার্জেস-এর মতে, ''পরস্পর সন্নিহিত কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমাজ যদি একই ভাষা ও সাহিত্য, একই ইতিহাস ও ঐতিহ্য, একই ধরনের আচার-ব্যবহার, ন্যায়-অন্যায় ও সুখ-দুঃখের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় তবে তাকে জাতি বলা যায়।''

  লর্ড ব্রাইস বলেছেন, ''জাতি হল রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত এবং বহিঃশাসন থেকে মুক্ত বা মুক্তিকামী একটি জাতীয় জনসমাজ।''

আধুনিককালে জাতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে স্তালিনের উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, ''জাতি হল ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা একটি স্থায়ী জনসমষ্টি যা একই ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক জীবন এবং সংস্কৃতির মধ্যে অভিব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ভিত্তিতে গঠিত।''

অনেক সময় জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি পারস্পরিক প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু জনসমাজ বলতে শুধু ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়। অপরদিকে তা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয় যদি তার সাথে 'রাজনৈতিক চেতনা' যুক্ত হয় এবং তা জাতি হয় তখনই, যখন জাতীয় জনসমাজ 'বহিঃশাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য জাতীয়তাবোধে আপ্লুত হয়।' পরিশেষে, জাতি ও রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্র একটি আইনগত ধারণা। সূত্রাকারে বলা যায় :

জনসমাজ = ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি—রাজনৈতিক চেতনা;

জাতীয় জনসমাজ = জনসমাজ + রাজনৈতিক চেতনা;

জাতি = জাতীয় জনসমাজ + রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবোধ।

২.৩.১ রাষ্ট্র (State) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয় হল রাষ্ট্র। 'রাষ্ট্র' তথা 'State' কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত ১৫১৩ সালে প্রকাশিত নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' গ্রন্থে। আমরা যাকে রাষ্ট্র বলি প্রাচীনকালে গ্রিকরা তাকে 'পলিস', রোমানরা 'সিভিটাস' এবং জার্মানরা 'ল্যান্ডটাগ' বলত। পরবর্তীকালে টিউটন যুগে রাষ্ট্র অর্থে 'স্ট্যাটাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং এর থেকেই State বা রাষ্ট্র শব্দটির সৃষ্টি। অদ্যাবধি এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে মতপার্থক্য থাকায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে ঐক্যমত গড়ে ওঠেনি।

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, '' পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যখন কয়েকটি গ্রাম ও পরিবার একত্রিত হয়, তখন তাকে রাষ্ট্র বলে।''

মধ্যযুগে বোঁদা (Bodin) বলেন, ''রাষ্ট্র হল কতকগুলি পরিবার এবং তাদের সাধারণ মালিকানার একটি মিলিত সংস্থা—যা চূড়ান্ত ক্ষমতা ও যুক্তি দ্বারা পরিচালিত।''

আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হলের ভাষায়, ''রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, বহিঃশক্তির শাসন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত জনসমাজকে রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া যায়।''

প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলেন, ''রাষ্ট্র হল আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।''

হ্যারল্ড ল্যাস্কি'র মতে, ''আধুনিক রাষ্ট্র হল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ এমন এক জনসমাজ যা শাসক ও শাসিত নিয়ে গঠিত এবং যা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর চরম ক্ষমতা দাবি করে।''

লেনিনের ভাষায়, ''রাষ্ট্র শ্রেণিশাসনের যন্ত্র, রাষ্ট্রের মাধ্যমে একশ্রেণি অপর শ্রেণিকে শোষণ করে।''

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বিত রূপ হিসাবে আধুনিক রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা গার্নার দিয়েছেন—''রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্রের দিক থেকে রাষ্ট্র হল বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন একটি জনসমাজ যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং যার একটি সুগঠিত শাসনব্যবস্থা আছে—যে শাসনব্যবস্থার প্রতি অধিকাংশ জনগণ স্বাভাবিক আনুগত্য প্রকাশ করে।''

আধুনিক সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে রাষ্ট্রের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের সন্ধান মেলে। এগুলি—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার এবং (৪) সার্বভৌমিকতা। এই চারটি উপাদান রাষ্ট্র গঠনে আবশ্যিক এবং একটি উপাদানের অভাব ঘটলে সেই সংগঠন বা সংস্থাকে আর রাষ্ট্র বলা যাবে না। তবে চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া সাম্প্রতিককালের রাষ্টবিজ্ঞানীগণ আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য সংযোজনের কথা বলেন। যথা—(১) স্থায়িত্ব, (২) কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও (৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ।

জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ধারণার সূত্রপাত ঘটে ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই। তৎকালীন বুর্জোয়া শ্রেণি অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরির উদ্দেশ্যে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সোচ্চার হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' তত্ত্ব জনপ্রিয় হওয়ায় জাতি ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ভারতবাসীদের জাতি হিসেবে গণ্য করা যায় কি না এবং যদি তা ইতিবাচক হয়, তাহলে ভারতবর্ষ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণীয় কি না।

প্রাক্-স্বাধীন ভারতের ইসলামিক ও ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবাসীর জাতি গঠনের প্রাক্-শর্তগুলি পূরণ না করায় তাদের জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সার্বভৌমত্ব না থাকায় ভারতবর্ষকে সেই সময় রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করা যায় না। তবে স্বাধীনতার পর নিজস্ব সংবিধান রচিত হওয়ায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সার্বভৌমত্বসহ জাতীয় রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে স্বাধীন ভারত জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে সমগ্র বিশ্বের নিকট স্বীকৃত। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান; বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান—কথাটির বাস্তব রূপ ভারতবর্ষকে জাতীয় রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই—

- জাতির অর্থ ও সংজ্ঞা দাও।
- রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলি উল্লেখ করো।
- গার্নার প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করো।
- জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের শর্ত কী?
- 'নেশন' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখো।

২.৪ স্বাধীন ভারতবর্ষের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি : পূর্ব ও বর্তমান (Constitutional Vision of Independent India : Then and Now)

ভারতবর্ষের সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে ৭২ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। স্বাভাবিক কারণেই সময়ের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংবিধান প্রায় ১২০ বার সংশোধিত হয়ে বর্তমানে বৃহত্তম ও জটিল প্রকৃতির হয়েছে। ভারতের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির প্রতি আলোকপাত না করলে সংবিধানের প্রকৃতি জানা সম্ভব নয়। নিম্নে ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরা হল—

(১) বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান :

ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের ন্যায় লিখিত সংবিধান আছে। ব্রিটেনের মতো অলিখিত সংবিধান নয়। এ সংবিধান আকারে পৃথিবীর লিখিত সংবিধানের মধ্যে বৃহত্তম। ১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হওয়ার সময় এ সংবিধানে ৩৯৫ টি ধারা ছিল এবং ৯টি তালিকা ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতীয় সংবিধানের দীর্ঘতা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানের আরও ১২০ বার সংশোধিত হওয়ায় নতুন ধারা ও তালিকা সংযোজনে তা আরও স্ফীত হয়েছে।

(২) সংবিধানের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব স্পষ্ট :

১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাদের প্রভাবিত করেছিল। সংসদীয় বা মন্ত্রীসভা চালিত সরকার, বিচার বিভাগের কাঠামো, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং জরুরি অবস্থাজনিত বিধিব্যবস্থা হল ইংরেজ শাসিত ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিকাশেরই পরিণতি।

(৩) সংবিধানের প্রস্তাবনা :

ভারতীয় সংবিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর প্রস্তাবনা। সংবিধানের প্রণেতাগণ ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির সমমর্যাদা ও সুযোগ এবং জাতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব আদর্শের রূপায়ণের ঘোষণা তারা করেছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করার মাধ্যমে সামাজিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংহতি শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

(৪) মৌলিক অধিকার :

ভারতের নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য সংবিধানে সাতটি মৌলিক অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছিল প্রথমে। বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার হিসাবে না থাকায় ভারতীয় নাগরিকগণ ছয় প্রকারের মৌলিক অধিকার যথা—সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মাচারণের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং সংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ভোগ করে। এই অধিকারগুলি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক। তবে এই অধিকারগুলি অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়।

(৫) নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) :

ভারতের সংবিধানের অপর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আয়ারল্যান্ডের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির সংযোজন। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ নম্বর ধারা থেকে ৫১ নম্বর ধারায় এগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এগুলির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার-প্রতিষ্ঠা করা। অস্টিন এগুলিকে 'সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এই নীতিগুলির মধ্যে কর্মের অধিকার, বেকার অবস্থায় সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। তবে এগুলি মৌলিক অধিকারের মতো আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।

(৬) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র :

সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে স্বাধীন ধর্মাচারণের অধিকার থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষতার কথাটি উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। ভারতে নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করেন, ধর্মের ভিত্তিতেই এই ভূমি খণ্ডিত হয়েছিল। ধর্মীয় সংকীর্ণতা দেশকে কোথায় হাজির করে সে অভিজ্ঞতা থাকায় সংবিধানের প্রণেতাগণ ভারত রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্রের কোনো নিজস্ব ধর্ম থাকবে না। সকল ধর্মই রাষ্ট্রের কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী।

(৭) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সমন্বয় :

সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতীয় সংবিধানকে ব্রিটেনের মতো সুপরিবর্তনীয় অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দুস্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলেন নি। ভারতের সংবিধানে নতুন রাজ্যের গঠন, রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন, নাম পরিবর্তন প্রভৃতিতে শুধু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন প্রয়োজন। সংবিধানের কিছু অংশ যথা মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি প্রভৃতির পরিবর্তনে সংসদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ২/৩ অংশের অনুমোদন প্রয়োজন। আবার কিছু ক্ষেত্রে মোট সদস্যের অধিকাংশের এবং উপস্থিত ও ভোটাদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন পেলে এবং অর্ধেক অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এরপর তা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরদানের জন্য প্রেরিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের এই তিন প্রকার সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কার্যকর থাকায় সংবিধানটি উভয়ের সমন্বয়ীরূপ হিসেবে আখ্যায়িত হয়।

নিজ অগ্রগতি যাচাই—

- ভারতবর্ষের সংবিধানকে বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান বলা হয় কেন?
- সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে কী ধরনের রাষ্ট্র বলা হয়েছে?
- সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলি কী কী?
- ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে চিহ্নিত করা হয় কেন?

২.৫ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : দল ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী রাজনীতি, কেন্দ্র এবং রাজ্য, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ (Democratic Systems and Institutional Structures : Party System and Electoral Politics, The Centre and The State, The Judiciary, Legislature and Executive)

গণতন্ত্র শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ডেমোক্রেসি' (Democracy)। শব্দটি গ্রিক শব্দ Demos ও Kratos থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল যথাক্রমে জনগণ ও শাসন। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের অর্থ হল জনগণের শাসন।

একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় নয়; এটি নৈতিক আদর্শ ও আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার দ্যোতক। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতন্ত্র হল ''জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি তাই পর্যালোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

(i) প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার

(ii) সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

(iii) আইনের অনুশাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

(iv) ব্যক্তি অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা

(v) মতাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি

(vi) জনমতের প্রাধান্য

(vii) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

২.৫.১ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কাঠামো :

দল-ব্যবস্থা (Party System)

দল ব্যবস্থা ও নির্বাচনী রাজনীতি, কেন্দ্র ও রাজ্য, বিচারব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা।

দল ব্যবস্থার উদ্ভব : যূথচারিতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ একা থাকতে চায় না। দলবদ্ধভাবে বসবাস করে থাকে। এই দল বা গোষ্ঠী হল সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার ও পেজের ভাষায় ''... যে-কোনো জনসমষ্টি যারা সুনির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ''। অতীতকালে দলবদ্ধতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বর্তমানে আমরা যে গণতন্ত্রে বাস করি তা হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। বৃহদায়তন রাষ্ট্রে মানুষ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্যের অংশীদার হতে হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন করার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে জর্জ ওয়াশিংটন যখন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন তখন সেখানে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু ধীরে ধীরে রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য প্রতিনিধি নির্বাচন করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট দল গড়ে ওঠে।

২.৫.২ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা (Definition of Political Parties) :

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা : আর্নেস্ট বার্কার মনে করেন, ''রাজনৈতিক দল হল এমন একটি সামাজিক সংগঠন যা স্বেচ্ছামূলক সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা সংগ্রহের সামাজিক আধারের ভূমিকা পালন করে এবং দল রাজনৈতিক পথ বা মাধ্যম হিসাবে ওই সামাজিক আধার থেকে সংগৃহীত ধ্যান-ধারণা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকাকে সচল রাখে''।

অপরদিকে কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক দলকে গোষ্ঠী স্বার্থ ও ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, চার্লস মেরিয়াম বলেন, ''রাজনৈতিক দলের ভিত্তি হল ব্যক্তি স্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থ। তবে গোষ্ঠীস্বার্থই হল রাজনৈতিক দলের মূল ভিত্তি। এই স্বার্থের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়।'' ম্যাক্স ভেবারও বলেন ''রাজনৈতিক দলসমূহ ক্ষমতার দুর্গে বাস করে''। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার মন্তব্য করেন ''নীতি বা আদর্শের ভিত্তিতে কোনো সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হলে তাকে আমরা রাজনৈতিক দল বলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি''।

দল ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তিতে এস. নিউম্যান বলেন, ''রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমাজের সক্রিয় মানুষদের সুসংহত সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করা যায়। এঁরা সরকারি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিরুদ্ধ মতামতের অনুসারী অন্যান্য দল বা দলগুলির সঙ্গে জনসমর্থন লাভের আশায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন''। সম্ভবত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অ্যাভেরী লিজারসন আধুনিক রাজনৈতিক দলকে সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির বেসরকারি ও পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের 'এজেন্সি'' বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের মত অনুসারে প্রতিটি শ্রেণি তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দল। একটি শ্রেণির অধিক সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। যেমন - শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণি থাকার জন্য সেখানে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব মেলে।

গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা : তবে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ থাকলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়। **অ্যালান বল** যথার্থভাবেই তাই বলেন, ''রাজনৈতিক দলগুলিকে মূলত তাদের সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে করায়ত্ত করতে চায়—হয় একাকী অথবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায়''।

২.৫.৩ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Political Parties) :

(১) **মতাদর্শ :** একই রাজনৈতিক দলের সদস্যরা সম মতাদর্শে বিশ্বাসী। সেই মতাদর্শের ভিত্তিতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। সেই মতাদর্শের দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হন। যেমন - সি.পি.আই.(এম) সদস্যরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা সেই মতাদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হয়েছেন। অনুরূপভাবে কংগ্রেস দল গান্ধিবাদে বিশ্বাস করে।

(২) **কর্মসূচি :** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য দল সতত সচেষ্ট থাকে।

(৩) **জনমত গঠনের মাধ্যম :** প্রতিটি রাজনৈতিক দল জনগণের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে অবিরত মত প্রকাশ করে এবং এই মত প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

(৪) **জাতীয় স্বার্থে উদ্‌বুদ্ধ :** প্রতিটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়।

(৫) **নির্বাচনে জয়লাভ :** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে নির্বাচনে জয়ী হওয়া ও সরকার গঠন করা। নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্বীয় কর্মসূচি রূপায়ণে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে।

(৬) **প্রতীক :** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট প্রতীক থাকে। এই প্রতীকগুলি তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে।

(৭) **নাগরিকরা শুধু সদস্য :** রাষ্ট্র মধ্যে যেহেতু নাগরিকেরাই শুধু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে, তাই তারাই একমাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকারী।

(৮) **সংগঠন :** পরিশেষে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলীয় সংগঠনের অস্তিত্ব। প্রতিটি দলে নেতা ও কর্মীরা থাকেন। ফলে রাজনৈতিক দলের সংগঠনে ক্রমোচ্চ ধাপ বিরাজ করে।

একটি চিত্রে তা প্রকাশ করা যায়।

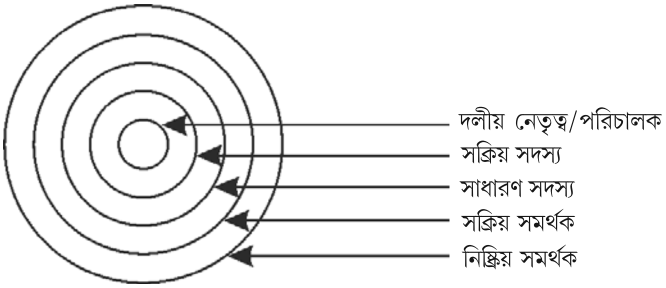

(৯) **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী :** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের মতোই একটি গোষ্ঠী, তারা সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে। অ্যালান বলের মতে, ''চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সরকারি পদে আনুষ্ঠানিকভাবে না থেকেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে''।

২.৫.৪ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি (Functions of Political Parties) :

রাজনৈতিক দলের কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে লাওয়েল, ব্রাইস, ফাইনার, অ্যালান বল এবং এ্যালমন্ড ও পাওয়েলের বক্তব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলোচনার সুবিধার্থে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে এবং কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করা যায়—

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

- **নির্বাচন পূর্ব**
  - (১) সমস্যা নির্বাচন
  - (২) নীতি নির্ধারণ— (ক) স্বল্পকালীন
    (খ) দীর্ঘকালীন
  - (৩) সমর্থন লাভের জন্য জনমত গঠন
  - (৪) প্রার্থী নির্বাচন
  - (৫) নির্বাচনী প্রচার
- **নির্বাচন উত্তর**
  - (১) আইনসভা গঠন
  - (২) সরকার গঠন
  - (৩) বিরোধী দলের ভূমিকা পালন
- **স্থায়ী**
  - (১) রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির পরিচালনা
  - (২) জনসেবামূলক কাজ
  - (৩) দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা

রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে আলোচিত হল—

১. **সমস্যা নির্বাচন :** বর্তমানে রাষ্ট্রগুলি আকারে বৃহৎ, জনসংখ্যা বিপুল; ফলে অগণিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি বেশি গুরুত্বের তা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্থির করা দুরূহ। রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে নির্বাচন করে এবং কীভাবে তার মোকাবিলা করা যায় সে ব্যাপারে আলোকপাত করে। বস্তুত সমস্যা নির্বাচন ও তার সম্ভাব্য সমাধানের পথনির্দেশ করাই হল রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ।

২. **নীতি নির্ধারণ ও জনমত গঠন :** প্রতিটি রাজনৈতিক দল যে সমস্যাগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরে সেগুলির সম্ভাব্য সমাধানকল্পে তারা স্বীয় দলের নীতি ও কর্মসূচি স্থির করে। সেই নীতি ও কর্মসূচির সমর্থনে সভা-সমিতি, প্রচার, বেতার-ভাষণ, কর্মী-বৈঠক, দেওয়াল-লিখন, পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, ইশতেহার প্রভৃতির মাধ্যমে জনমত গঠন করতে থাকে।

৩. **প্রার্থী নির্বাচন :** রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা। তাই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেওয়া ও তাকে মনোনয়ন দেওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজনৈতিক দল যদি সৎ, চরিত্রবান, দক্ষ, কর্মঠ, মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয় তাহলে নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।

৪. **নির্বাচকদের স্বার্থরক্ষা :** নাগরিকদের ভোটে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। ভোটদানের পূর্বে নাগরিকদের নাম নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এ কাজ যদিও সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি রাজনৈতিক দলসমূহই এ ব্যাপারে মূল উদ্যোগ নেয়।

৫. **সরকার গঠন :** যে দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সে দল সরকার গঠন করে। সুতরাং প্রতিটি দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার জন্য সতত চেষ্টা চালায় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে দল নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করলে তারা প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করবে, তাদের কর্মসূচিকে রূপায়ণ করবে।

৬. **বিরোধী দল হিসাবে কাজ :** নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনে সক্ষম হয় না, তারা বিরোধী দল হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বিরোধী দলের ভূমিকা ব্যাপক। যথা - সরকারি রাজনৈতিক দল যাতে

স্বৈরাচারী না হয়ে ওঠে বা দুর্নীতিগ্রস্তও না হয়ে পড়ে তার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সদাসতর্ক থাকতে হয়। সরকারের ভুলভ্রান্তি হলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। এমনকী সরকারি দল সরকারি পরিচালনায় ব্যর্থ হলে বিরোধী দলকে সরকার গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়।

৭. **সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন :** ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার একটি অন্যতম উপায় হল ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ। রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারে আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। এই বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন না হলে, প্রতিটি বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেবে তার ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। এমত অবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যেহেতু এই তিন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত, তাই তারা এই তিন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের সেতু রচনা করতে পারে।

৮. **রাজনৈতিক সংযোগসাধন :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দলসমূহ। সরকারি দল সরকারের নীতিসমূহ জনসমক্ষে প্রচার করে অনুকূল জনমত সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে বিরোধী দল সরকারের ভুলভ্রান্তি জনসমক্ষে প্রচার করে বা আইনসভায় আলোচনা করে। এর ফলে জনগণের সামনে সরকারি বক্তব্য ও সরকার-বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত হয়। জনগণও তাদের মতামত ব্যক্ত করে। এইভাবে জনগণের অভাব-অভিযোগ সরকারের উপলব্ধিতে আসে। ফলে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা সম্ভব হয়।

৯. **রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব রক্ষা :** প্রতিটি রাজনৈতিক দল ব্যাপক মানুষের সমর্থন লাভ ও সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে নিজেদের কর্মসূচি ও নীতি নির্ধারণ করে। তাই অ্যালান বল বলেন, ''রাজনৈতিক দলসমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ, সরলীকরণ এবং স্থিতিশীল করা''।

১০. **স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও গ্রন্থিকরণ :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে। এরা সরাসরি শাসনক্ষমতায় থাকে না, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে ও প্রভাব বিস্তার করে। এদের সব দাবি স্বীকার না করলেও রাজনৈতিক দল এদের দাবিসমূহের সমষ্টিকরণ ও গ্রন্থিকরণ করে কার্যপদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে।

১১. **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিরন্তন কাজ হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংগঠিত করা। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকে। এই মতাদর্শে যাতে সমস্ত সদস্যরা সমৃদ্ধ হন রাজনৈতিক দল তার জন্য নিয়মিত দলীয় শিক্ষা পরিচালনা করে।

১২. **সেবামূলক কাজ :** প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভের জন্য গড়ে উঠলেও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তাদের বহুবিধ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়।

১৩. **দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা :** প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বা চরম লক্ষ্যে পৌঁছালে তা ধরে রাখতে হলে দলীয় কর্মীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলতে হয়।

১৪. **রাজনৈতিক নিয়োগ :** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যপদে নিয়োগ করা। উদাহরণস্বরূপ কোন্ সদস্যকে দলের সম্পাদক পদে, কোন্ সদস্যকে মন্ত্রীপদে, কোন্ সদস্যকে কর্মী পদে নিয়োগ করা হবে তা ঠিক করে রাজনৈতিক দল।

সংক্ষেপে উপরোক্ত কাজগুলি হল রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্যসমূহ এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাই বলা হয়, রাজনৈতিক দলই হল গণতন্ত্রের প্রাণ।

২.৫.৬ বহুদল-ব্যবস্থা (Multi Party System) :

যে দেশে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল থাকে তাকে বহুদল-ব্যবস্থা বলে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাতে দুইয়ের অধিক দল থাকে, তবু দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়, কারণ সংশ্লিষ্ট দেশে দুটি দলই প্রধান এবং তারাই শাসনক্ষমতা পর্যায়ক্রমে দখল করে। অনুরূপভাবে, বহুদল-ব্যবস্থার অর্থ হল দুইয়ের অধিক সংগঠিত দল থাকা। ফ্রান্সে বহুদল-ব্যবস্থা আজও দেখা যায়, কারণ সেখানে প্রায় ১৫টি দল সমক্ষমতাসম্পন্ন।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেকগুলি সমক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল থাকায় কোনো দল নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। ফলে বহুদলীয় রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায় না। সাধারণভাবে এখানে একাধিক দলের সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এই দলীয় ব্যবস্থায় সরকার দুর্বল ও অস্থায়ী হয়।

ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ইটালি, ভারত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কিন্তু সব দেশের বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি এক নয়। এদের ভিন্নতা আছে। অ্যালমন্ড, অ্যালান বল প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা বহুদল ব্যবস্থাকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা —

(১) কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থা

(২) অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা

(৩) প্রভুত্বকারী বহুদলীয় ব্যবস্থা।

কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থা : কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থায় দুইয়ের অধিক বহু রাজনৈতিক দল থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বহু দল থাকা সত্ত্বেও দুটি দলই মূলত সরকার গঠন ও পরিচালনা করে, অ্যালান বলের মতে, ‘‘এই ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরকারের স্থায়িত্ব’’।

অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা : যখন দেশে অনেকগুলি দল থাকে এবং দলগুলির মধ্যে বোঝাপড়া কম থাকে, তখন তাকে অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। এরূপ ব্যবস্থায় সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়।

প্রভুত্বকারী দল-ব্যবস্থা : এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল থাকলেও সরকার গঠন ও পরিচালনা করে একটিমাত্র দল অর্থাৎ বহু দল থাকলেও একটি দলের প্রাধান্য দেখা যায়। অ্যালান বল বলেন ‘‘এ ধরনের দল-ব্যবস্থায় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও একটি দলেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়’’। মালয়েশিয়ায় এই ধরনের প্রভুত্বকারী দল-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

বহুদল ব্যবস্থার গুণ :

(১) জনমতের যথার্থ প্রতিফলন : দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে জনগণ তাদের ইচ্ছামতো মতামতকে ব্যক্ত করতে পারে ও সমর্থন জানাতে পারে।

(২) স্বৈরাচারের আশঙ্কা থাকে না : বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। ফলে আইনসভায় কোন দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত হয় : দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে কোনো দলের চূড়ান্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে সরকার গঠনের সময় শাসক দলকে অন্যান্য দলের সহযোগিতা নিতে হয়। স্বাভাবিকভাবে সেই সমস্ত ছোটো দলগুলির স্বার্থ রক্ষিত হয়।

(৪) কায়েমি স্বার্থ গড়ে ওঠে না : বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো একটি দল এককভাবে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ফলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একদলীয় বা দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় যেভাবে কায়েমি স্বার্থের ধারক ও বাহকে পর্যবসিত হয়, বহুদলীয় ব্যবস্থায় সেরূপ কায়েমি স্বার্থের সৃষ্টি হয় না।

(৫) **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে :** বহুদলীয় ব্যবস্থায় দেশে যে সমস্ত দলগুলি থাকে তারা স্বীয় মত অনুসারে আলাপ-আলোচনা করে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করে।প্রতিটি দল তাদের মতাদর্শ অনুসারে কর্মসূচি, ইশতেহার প্রভৃতি তৈরি করে জনসমক্ষে প্রচার করে।

(৬) **সহজে প্রতিনিধি নির্বাচন করা যায় :** দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে প্রতিনিধি নির্বাচন করার সহজ সুযোগ মেলে। ইচ্ছামতো প্রার্থীকে পছন্দ করে ভোট দেবার অধিকার বহুদলীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃত।

(৭) **মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব প্রতিরোধ করা যায় :** বহুদলীয় ব্যবস্থায় আইনসভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসেন। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা মন্ত্রীসভায় স্থান পান।

বহুদল ব্যবস্থার ত্রুটি :

(১) **সরকার অস্থিতিশীল হয় :** বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হল দেশে স্থায়ী সরকার গড়া যায় না কারণ বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দল অনেক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না।

(২) **জনগণের মঙ্গলসাধনে অক্ষম :** দেশে বহুদল ব্যবস্থা থাকলে যে সরকার গড়ে ওঠে তা অস্থায়ী হয়। ফলে ঐ সরকার জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী (Long term) সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না।

(৩) **প্রতিনিধি নির্বাচনের অসুবিধা :** বহু-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা স্ব-স্ব কর্মসূচী ও মতাদর্শ নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়। তাদের মধ্যে কাকে বা কোন্ দলকে সমর্থন করবে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে গড়ে।

(৪) **শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে ওঠে না :** দেশে বহুদল ব্যবস্থা থাকলে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ইটালি, ফ্রান্স ও ভারতে বহুদল ব্যবস্থা থাকায় শক্তিশালী বিরোধী দল দেখা যায় না অথচ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য।

(৫) **রাজনৈতিক দলত্যাগ প্রকট হয় :** বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলত্যাগ একটি ব্যাধি হিসাবে প্রকটিত হয়। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা বহুদল থাকায় প্রয়োজনমতো দল পরিবর্তন করে।

(৬) **বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় :** দেশে বহুদল ব্যবস্থা থাকলে সরকার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই অক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রাভ্যন্তরে নয়, বহির্জগতের ক্ষেত্রেও প্রকাশ লাভ করে।

(৭) **সমাজে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় :** বহুদলীয় ব্যবস্থায় বহুদল থাকায় অকারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কারণ প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থ পূরণের জন্য অপর দল সম্পর্কে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করে; দলীয় প্রয়োজনে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়।

ল্যাস্কির (Lasky) উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে বহুদল ব্যবস্থা নয় বরং ‘‘যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক বিরোধিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তা অধিক সন্তোষজনক এবং কাম্য।’’

২.৫.৭ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব (Importance of the Political Parties in Democracy) :

গণতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কারণ গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি জনগণের শাসন কিন্তু আজকের জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

বর্তমানে গণতন্ত্রের অর্থই হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে এবং সেই প্রতিনিধিরাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কীসের ভিত্তিতে এই প্রতিনিধিবর্গ নির্বাচিত হবেন? বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দলীয় ভিত্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা বিশেষত ম্যাডিসন এবং জর্জ ওয়াশিংটন দল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়াশিংটন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি পদে প্রথমে নির্বাচিত হয়েছিল দলীয় সমর্থন ছাড়া। তিনি দল ব্যবস্থার সমালোচনাও করতেন কিন্তু তাঁরই রাষ্ট্রপতিত্বকালে টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল যে অপরিহার্য তার বাস্তব ভিত্তি আছে। তাই এ প্রসঙ্গে বার্কার বলেন, ‘‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করলে দলীয় ব্যবস্থাকে আমাদের স্বীকার করতেই হয়।’’

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে বহু বিদগ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইতিবাচক দিকসমূহ :

(১) রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

(২) রাজনৈতিক দল সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করে।

(৩) সুশৃঙ্খলভাবে প্রশাসন পরিচালনার পরিবেশ গঠন করে।

(৪) রাজনৈতিক দল ঐক্যমত গঠনে সাহায্য করে।

(৫) জনগণকে সক্রিয় করে তোলে।

(৬) জনগণকে প্রতিবাদ করার সাহস জোগায়।

(৭) জনগণকে যুক্তিবাদী করে তোলে।

(৮) কোনো কাজের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে।

(৯) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

(১০) গণতন্ত্রকে রক্ষা করে।

(১১) শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব।

নেতিবাচক দিকসমূহ :

(১) যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

(২) দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

(৩) দলীয় স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়।

(৪) পারস্পরিক বোঝা পড়ার অভাব।

(৫) ক্ষমতাসীন দল তাদের দলের স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করে এবং অন্য দলকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করে।

২.৫.৮ বিচার বিভাগ (Judiciary) :

সরকারের একটি অপরিহার্য কাঠামো হল বিচার বিভাগ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। বিচার বিভাগ হল ন্যায়নীতির প্রতীক।

সংজ্ঞা : বিচারবিভাগ হল সরকারের সেই বিভাগ যার প্রধান দায়িত্ব হল আইন লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের বিচার করে শাস্তিপ্রদান। এ ব্যতীত নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা, জনস্বার্থ বিষয়ক অভিযোগের শুনানি প্রভৃতি কার্য বিচারবিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা : বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুপত্বপূর্ণ। বিচারপতি কেন্ট (Kent) গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, ন্যায়নীতির স্তম্ভ যদি ভেঙে পড়ে, তা হবে শেষ পতন। গোখেলও বিচাপতিদের দুর্নীতি মুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্বাধীন মনোভাব সম্পন্ন বিচারবিভাগ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার শর্ত : নিরপেক্ষ এবং সাহসের সঙ্গে বিচারব্যবস্থা কার্যকরীকরণে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা যায়, যেমন —

(১) বিচারপতিদের যোগ্যতা।

(২) বিচারপতিদের নিয়োগের পদ্ধতি।

(৩) বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ।

(৪) আইন ও শাসন-বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্তি।

(৫) বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা।

(৬) বিচারপতিদের পদচ্যুতির জন্য লিখিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার।

(৭) অবসর গ্রহণের পর আদালতে ওকালতি বন্ধের ব্যবস্থা।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি (Functions of Judiciary) :

নিম্নে বিচারবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

(১) আইন লঙ্ঘন ও অপরাধের বিচার।

(২) আইনের সঠিক ব্যাখ্যা।

(৩) সংবিধানের ব্যাখ্যা।

(৪) কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধ মীমাংসা।

(৫) আইনের সাংবিধানিকতা বা বৈধতা বিচার।

(৬) রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা।

(৭) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ।

(৮) পরামর্শদানমূলক ক্ষমতা।

(৯) জনস্বার্থ-বিষয়ক মামলার দায়িত্বগ্রহণ।

(১০) নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসা।

আদালত নিজের রায় এবং সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা এবং অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়েও ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামো চিত্র :

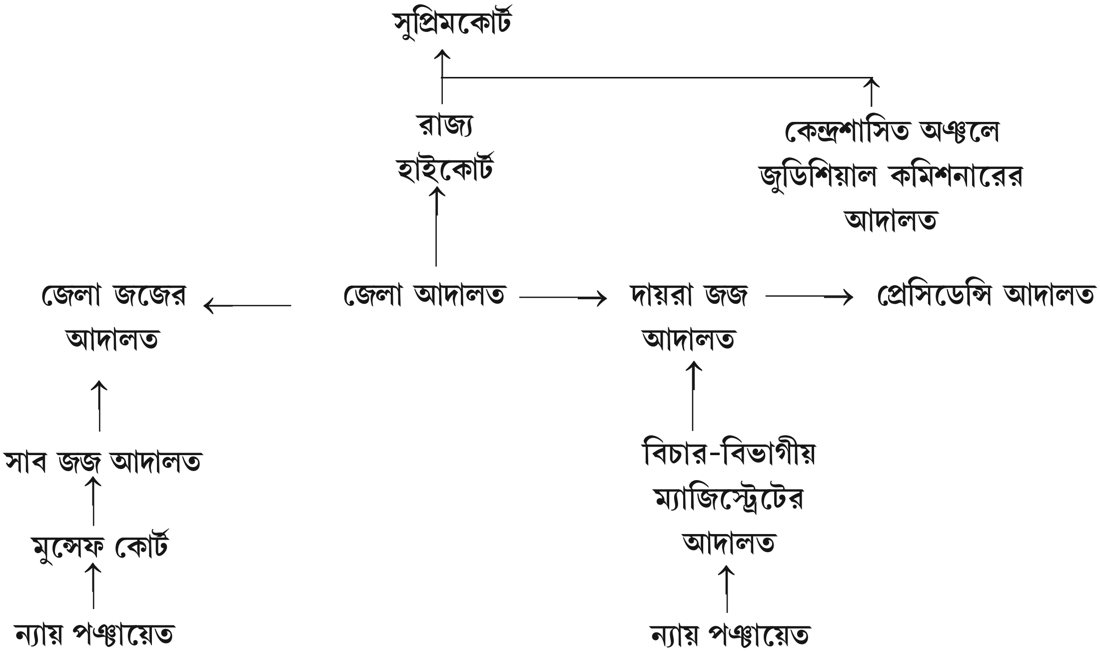

২.৫.৯ ভারতের বিচারব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য (Features of Indian Judiciary) :

ভারতে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট এবং সর্বনিম্ন আদালত হল ন্যায় পঞ্চায়েত। ভারতের বিচারব্যবস্থা অখণ্ড এবং ত্রিস্তরীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে বিচারব্যবস্থার দ্বৈতরূপ দেখা যায় না। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা আলোচিত হল।

(১) অখণ্ড বিচারব্যবস্থা : ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে সেখানেই দ্বৈত বিচারব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইন ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং রাজ্য আইন ও রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তির দায়িত্ব থাকে রাজ্য বিচারালয়ের উপর। ভারতে দ্বৈত বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে অখণ্ড বিচারব্যবস্থা চালু আছে। এখানে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট এবং সর্বনিম্ন আদালত ন্যায় পঞ্চায়েত। সুতরাং কোনো বিষয়ে নিষ্পত্তি করতে হলে নিম্ন আদালত থেকে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আপিল করা যায়। ডঃ আম্বেদকর ভারতে এই অখণ্ড বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা গণপরিষদে বলেন। কেউ কেউ বলেন ভারতের বিচারব্যবস্থা পিরামিড-সদৃশ। নিম্নে ছকের সাহায্যে বর্ণনা করা হল (সারণি) :

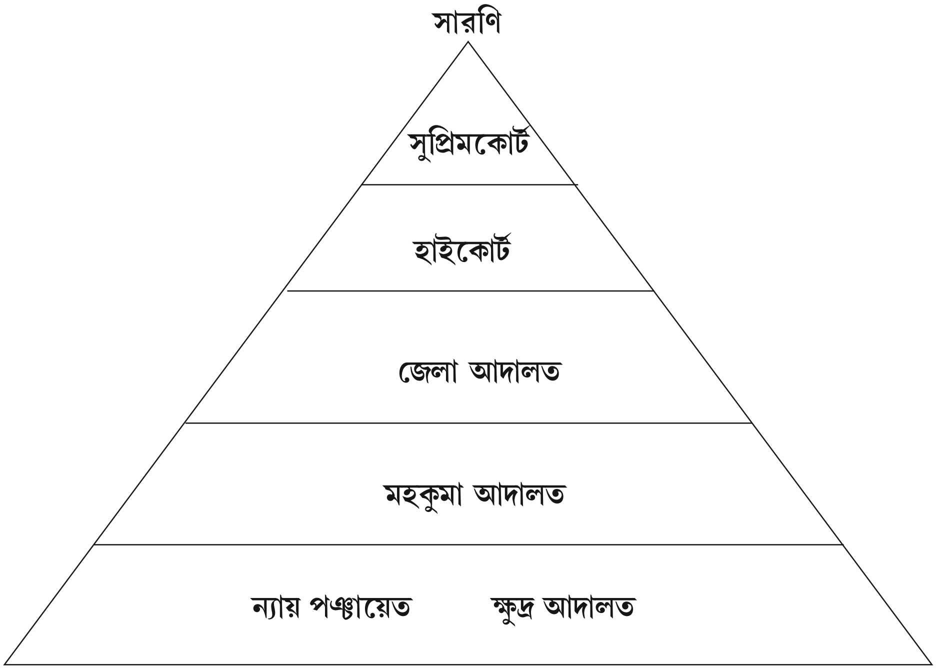

বস্তুত ন্যায় পঞ্চায়েত থেকে ধাপে ধাপে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আপিল করা যায়।

(২) **মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা :** ভারতীয় জনগণের যে ছ-ধরনের অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত সেই অধিকারগুলি সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট রক্ষা করে। উক্ত আদালতগুলি পাঁচ ধরনের লেখ জারি করে মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। তবে দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই অধিকার রক্ষার থেকে বঞ্চিত হয়।

(৩) **সারা দেশে একই ফৌজদারি বিধি :** ভারতে বিভিন্ন ভাষা, রীতি-নীতি ও ধর্মের লোক বসবাস করলেও সমগ্র দেশে একই রকমের ফৌজদারি বিধি চালু আছে। হিন্দুদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও চালু আছে।

(৪) **দরিদ্রদের জন্য আইনগত সাহায্যদান :** ভারতে যে সমস্ত পরিবারের আয় মাসিক ৫০০ টাকার কম তাদের কোনো মামলা থাকলে সরকার-কর্তৃক আইনগত সাহায্যদানের ব্যবস্থা কার্যকর আছে।

(৫) **বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা :** ভারতে জনগণ যাতে ন্যায়বিচার পায় এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা যাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, তার জন্য বিচারকদের (১) উপযুক্ত বেতনপ্রদান, (২) চাকুরির নিরাপত্তা-রক্ষা, (৩) অবসর-গ্রহণের পর আইনজীবী হিসাবে কাজ না করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারতে কার্যকর করা হয়েছে।

কিন্তু বিচারপতিদের রাজনৈতিক কারণে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বিচারপতির পদ থেকে অবসরগ্রহণের পর রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল, কমিশনের প্রধান পদে নিয়োগ ইত্যাদি বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

(৬) **দুর্বল বিচারব্যবস্থা :** ভারতে বিচারালয় যে সমস্ত রায় দেয় সেগুলিকে অতিক্রম করার জন্য প্রায়শই কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ শাহবানু মামলায় বিচার-বিভাগ তালাকপ্রাপ্ত মহিলার অধিকার রক্ষার সপক্ষে রায় দিলেও ভারতীয় সংসদ প্রণীত ‘‘মুসলিম মহিলা রক্ষা আইনে’’ বিচার-বিভাগের রায়কে বাতিল করে দেওয়া হয়।

(৭) **দীর্ঘসূত্রতা :** ভারতে বিচারের রায় প্রকাশ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। বহু মামলা আছে যেগুলি স্বাধীনতার পূর্বে দায়ের হয়েছিল, আজও নিষ্পত্তি হয়নি। শুধু সুপ্রিমকোর্টে দু-লক্ষের উপর মামলা আজও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদবাক্য আছে "Delayed justice means denied justice." (বিচার পেতে দেরির অর্থই হল ন্যায়-বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া)। (যেমন - আমার বয়স ৫০ বছর; আমি একটি মামলা দায়ের করলাম। ১৫ বছর পরে যখন ওই মামলার রায় বের হল, তখন হয়তো আমি আর ইহজগতে নেই। ফলে ওই মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা আমাকে ন্যায়-বিচার থেকে বঞ্চিত করবে।)

(৮) **ব্যয়বহুলতা :** পরিশেষে, ভারতে বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ হাইকোর্টের একজন ভালো অ্যাডভোকেটকে একবার নিয়োগ করতে হলে কমপক্ষে দশ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যয়বহুলতা সাধারণ মানুষকে আদালতবিমুখ করে তুলেছে।

২.৫.১০ আইনবিভাগ (Legislature) :

আধুনিক প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন বিভাগের গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আইনসভা হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্য পরিচালনার প্রভাবশালী কাঠামো। ভারতেও এর অন্যথা হয়নি। ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান মঞ্চ হল কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ। এইজন্যই নিম্নে সংসদের গঠন এবং কার্যাবলি সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল।

সংসদের গঠন : ভারতের রাষ্ট্রপতি, লোকসভা এবং রাজ্যসভা নিয়ে পার্লামেন্ট বা সংসদ গঠিত। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ— রাজ্যসভা এবং লোকসভা। রাজ্যসভা এবং লোকসভার গঠন এবং কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(i) রাজ্যসভার গঠন :

রাজ্যসভা হল ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের মধ্যে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন।

যে রাজ্য থেকে ব্যক্তি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন তাকে সেই রাজ্যের নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স হবে ন্যূনতম ৩০ বছর। রাজ্যসভার কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর।

রাজ্যসভার কার্য পরিচালনার পদ্ধতি : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বা সভাপতি। তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ওই কক্ষের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ৫ বছরের জন্য ডেপুটি চেয়ারম্যানে নির্বাচন করেন যিনি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সভার কার্য পরিচালনা করেন।

(ii) লোকসভার গঠন :

লোকসভা হল ভারতের সংসদের নিম্নকক্ষ। সংবিধান অনুযায়ী লোকসভার সর্বাধিক সদস্য হবেন ৫৫০ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন। রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হন ২ জন। তারা হবেন ইঙ্গ-ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

লোকসভার সদস্যপদের যোগ্যতা : তিনি ভারতীয় নাগরিক হবেন। বয়স হবে ন্যূনতম ২৫ বছর। যে-কোনো লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে। তিনি সরকারের অধীনে কোনো চাকুরিরত হবেন না। লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ হল ৫ বছর।

লোকসভার কার্য পরিচালনা : লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য নবগঠিত লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন অধ্যক্ষ এবং একজন উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হবেন।

লোকসভার কার্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—

(ক) **সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা :** সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হল আইন প্রণয়ন। কোনো বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করবেন তা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে।

(খ) **মন্ত্রীপরিষদ গঠন :** লোকসভা মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে। রাষ্ট্রপতি লোকসভা বা রাজ্যসভার যে-কোনো সদস্যকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করতে পারেন। মন্ত্রীপরিষদের মেয়াদ সাধারণত ৫ বছরের হয়।

(গ) **শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ :** সংসদের হাতে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। সাংসদগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন, বিলের উপর আলোচনা, মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকারও বিরোধী দলের আক্রমণ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে।

(ঘ) **বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা :** সংসদের বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাও আছে। সংসদ কোনো আদালতকে হাইকোর্টের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য হাইকোর্ট গঠন করতে পারে।

(ঙ) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা :** সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পিত হয়েছে। লোকসভা নতুন কর ধার্য, বিদ্যমান করের পরিবর্তন বা বিলোপসাধন করতে পারে।

(চ) **সংবিধান সংশোধন :** সংবিধান সংশোধনে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা এক। সংবিধান সংশোধন বিল রাজ্যসভা বা লোকসভার মধ্যে যে-কোনো কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু উভয় কক্ষের অনুমোদন ব্যতীত সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।

সংসদের উপরোক্ত কার্যাবলি এবং ক্ষমতাবলি ছাড়া আরও কিছু ক্ষমতা আছে যেমন রাজ্যগঠন ও পুনর্গঠন এবং বিধান পরিষদ গঠন ও বিলোপ সংক্রান্ত ক্ষমতা ইত্যাদি।

২.৫.১১ শাসন বিভাগ (Executive) :

ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। সংবিধান প্রণেতাগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের শাসনবিভাগ সংগঠনে ব্রিটেনের অনুকরণ করেছেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের শাসনবিভাগ মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্য, প্রচলিত রীতি এবং কার্যকারণগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে। বর্তমানে সংক্ষেপীকরণ করার জন্য কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের কথা উল্লেখ করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীপরিষদ। কেবলমাত্র এই তিন পদমর্যাদার ব্যক্তিগণ বা ব্যক্তি সকলের (যেমন - মন্ত্রীপরিষদ) ভূমিকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হল।

ভারতের রাষ্ট্রপতি (President of India) :

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রেট ব্রিটেনের আদলে রূপ পেয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনে রানির মতো ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির পদ আলংকারিক। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন না। তিনি পরোক্ষভাবে একটি জটিল পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। তাঁর মেয়াদকাল হল পাঁচ বছর।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং কার্যাবলি : রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। কেন্দ্রের শাসনবিভাগের সকল ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৩ (১) নং ধারা অনুসারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী ওইসব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। সুপ্রিমকোর্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অধস্তন কর্মচারী বলতে বোঝায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলি হল—

(ক) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা : যেমন—

(১) কেন্দ্রের নির্দেশ ও আদেশ কীভাবে কার্যকর হবে সেই বিষয়টি স্থির করবেন রাষ্ট্রপতি।

(২) রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সম্পর্কিত ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের সকল মন্ত্রী, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, রাষ্ট্রদূত, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রমুখকে নিয়োগ করেন।

(৩) সংবিধানের ২৫৬ এবং ২৫৭ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন এবং শাসন বিভাগের কার্যাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকারকে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিতে পারেন।

(খ) কূটনৈতিক ক্ষমতা : রাষ্ট্রের প্রধানরূপে রাষ্ট্রপতিকে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও হাইকমিশনার নিয়োগ এবং পদচ্যুত করেন। তিনি ভারতে বিদেশি কুটনীতিবিদদের পরিচয় পত্র গ্রহণ করেন।

(গ) সামরিক ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান। তিনি পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন।

(ঘ) আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা :

রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি—

(১) সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা।

(২) অধিবেশন বিষয়ক ক্ষমতা।

(৩) বিলে সম্মতিদান।

(৪) রাজ্য বিলে সম্মতিদান।

(ঙ) রাষ্ট্রপতির অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো অর্থবিল লোকসভায় পেশ করা যায় না। বাজেটের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব লোকসভায় পেশের অনুমতি তিনি দেন।

(চ) রাষ্ট্রপতির বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি কোনো অপরাধীর দণ্ডাদেশ মকুব ও হ্রাস করতে পারেন।

(ছ) রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা-সংক্রান্ত ক্ষমতা : সংবিধানের ৩৫২-৩৬০ নং ধারায় রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার অধিকার দিয়েছে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (Vice President of India) :

ভারতের সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতির পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের স্তরবিন্যাসে রাষ্ট্রপতির পরেই উপরাষ্ট্রপতির স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীদের বয়স অন্যূন ৩৫ বছর হতে হবে। রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। তাঁর মেয়াদ হবে ৫ বছর।

উপরাষ্ট্রপতির কার্যাবলি : সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতিকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যু,পদত্যাগ, পদচ্যুত বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ করতে পারবেন। অসুস্থতা, অনুপস্থিতি বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি যদি নিজে কাজ করতে অসমর্থ হন তাহলে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তবে সাংবিধানিক দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতি পদটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ছাড়া প্রকৃতপক্ষে উপরাষ্ট্রপতির তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers) :

সংবিধানে কেন্দ্রে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের কথা উল্লেখ আছে। সংবিধানের ৭৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি সম্পাদনে সাহায্য করা এবং পারমর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীগণের কার্যকালের মেয়াদ আইনগতভাগে রাষ্ট্রপতির আস্থার উপর নির্ভরশীল। বাস্তবে লোকসভার আস্থার উপর মন্ত্রীপরিষদের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

সংবিধানে মন্ত্রীপরিষদ গঠন, মন্ত্রীদের স্তরবিন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। **১৯৪৯** খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গার মন্ত্রীদের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে যে সুপারিশ পেশ করেছিলেন সেখানে তিন শ্রেণির মন্ত্রীর উল্লেখ ছিল — ক্যাবিনেট মন্ত্রী (Cabinet Minister), রাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী (Minister of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Minister)। বর্তমানে এই ত্রিস্তরবিশিষ্ট মন্ত্রীপরিষদ ছাড়াও সংসদীয় সচিব আছেন। প্রধানত প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন এবং যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়া হয়।

মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Power and Functions of Ministers) :

মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম হল —

(১) **নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ :** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাজ হল ওইগুলি প্রয়োগ করা।

(২) **আইন প্রণয়ন :** বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রয়োজন। মন্ত্রীদেরই আইন প্রণয়নের বিল উত্থাপনের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সংসদের উভয়কক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে ওই আইন অনুমোদিত হয়।

(৩) **আর্থিক নীতি প্রণয়ন :** অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ বিল ও বাজেট উত্থাপন সবক্ষেত্রেই মন্ত্রী পরিষদকে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

(৪) **শাসন বিভাগের পরিচালনা :** মন্ত্রীপরিষদ রাষ্ট্রপতির নামে শাসনবিভাগ পরিচালনা করে। সংসদ প্রণীত আইন কার্যকর করা, সকল বিভাগের কর্মসূচি নির্ধারণসহ শাসন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলিই মন্ত্রীপরিষদের হাতে ন্যস্ত।

(৫) **পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যাবলি :** মন্ত্রীপরিষদ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। সাধারণভাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য পৃথক মন্ত্রী থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আন্তর্জাতিক সদস্যদের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন।

(৬) **বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন :** মন্ত্রীপরিষদকে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন করতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের সাফল্যের মধ্য দিয়েই সরকারের অগ্রগতির পরিচয় মেলে। এর জন্য প্রয়োজন হল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা এবং মতবিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসা, যার দায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদের উপরই বর্তায়। মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকেই এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়।

(৭) **নিয়োগের ক্ষমতা :** কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদ রাষ্ট্রপতির নামে প্রয়োগ করে। রাজ্যপাল, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, অর্থ কমিশনের সদস্যগণ, নির্বাচন কমিশন, ভাষা কমিশন ইত্যাদি নিয়োগের মন্ত্রীপরিষদ বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

উপরোক্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছাড়াও জরুরি অবস্থাজনিত ক্ষমতা প্রয়োগ, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন অনুষ্ঠান, লোকসভা ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মন্ত্রীপরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ :

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্য সরকারের একাধিক বিভাগ আছে যার কার্যাবলি অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ। নিম্নে ওই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল—

(১) রাজ্যের শাসনবিভাগ (Executive of the State) :

রাজ্যপাল (Governor) এবং রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers) নিয়ে রাজ্যের শাসনবিভাগ গঠিত। রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক বা আলংকারিক প্রধান। তার নামেই রাজ্যের শাসনবিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। সংবিধান (১৫৫ নং ধারা) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন।

সাধারণভাবে রাজ্যপালের মেয়াদ ৫ বছর। রাজ্যপালকে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। তাঁর বেতন ও ভাতা আছে।

রাজ্যপালের কার্যাবলি : রাজ্যপালের কার্যাবলিগুলি হল—

(ক) শাসনবিষয়ক ক্ষমতা : রাজ্যপালের নামেই শাসনবিভাগের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ রাজ্যপালই করে থাকেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো হয়ে থাকে। মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো রাজ্যপাল করেন। এ ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যের ভূমিকা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অপসারণের ক্ষমতা, কেন্দ্রের প্রতিনিধির ভূমিকা ও তিনিই পালন করেন। প্রয়োজনবোধে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন পরিচালনা ইত্যাদিও রাজ্যপালকে করতে হয়।

(খ) রাজ্যপালের আইন-বিষয়ক ক্ষমতা : রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যপাল, বিধানসভা ও বিধান পরিষদ (যে রাজ্যে আছে) নিয়ে রাজ্য আইনসভা বা বিধানসভা গঠিত।

রাজ্যপালের আইন বিষয়ক ক্ষমতাগুলি হল—

- রাজ্য আইনসভার উভয়কক্ষে রাজ্যপালের ওপর সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।
- রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও তার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
- রাজ্য বিধানসভার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন।
- অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে।
- রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার যে-কোনো কক্ষে বা উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি ছাড়াও বিলে সম্মতিদান, অর্ডিন্যান্স জারি, আইনসভা পরিচালনা, প্রতিবেদন পেশ, বিশেষ আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদি রাজ্যপালকে দেওয়া হয়েছে।

(গ) রাজ্যপালের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা : রাজ্যপালের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল— জেলা জজ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি সম্পর্কে তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, রাজ্যপাল দণ্ডপ্রাপ্ত বক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন, দণ্ডাদেশ স্থগিত বা পরিমাণ হ্রাস করতে পারেন।

রাজ্য মন্ত্রীপরিষদ (The Council of Ministers in the State) :

ভারতের সংবিধানে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই মন্ত্রীপরিষদ হল রাজ্য প্রশাসন পরিচালনার প্রধান কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা।

মন্ত্রীপরিষদ গঠন : রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের পর রাজ্যপালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল মন্ত্রীপরিষদ গঠন। রাজ্যপাল প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ এবং পরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করেন।

মন্ত্রীদের স্তরবিন্যাস : মন্ত্রীদের তিনটি স্তর আছে —পূর্ণ বা ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী। এদের মধ্যে পূর্ণমন্ত্রীরাই হয় নীতি নির্ধারক। মুখ্যমন্ত্রীই মন্ত্রীদের স্তর স্থির করেন।

মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন : মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করেন।

মন্ত্রীপরিষদের মেয়াদ : মন্ত্রীসভার সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছেমতো পাঁচ বছরের পূর্বেই মন্ত্রীপরিষদ ভেঙে দিতে পারেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্যপালও মন্ত্রীপরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করার জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

মন্ত্রীপরিষদের কার্যাবলি : মন্ত্রীপরিষদের কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- নীতি নির্ধারণ, প্রয়োগ এবং সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা।
- শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- অর্থবিষয়ক ক্ষমতা, যেমন - বার্ষিক বাজেট পেশ করা এবং অর্থবিল উত্থাপন করা।
- মন্ত্রীপরিষদ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার নিয়োগ করা, বিভিন্ন কমিশন গঠন করা, বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন এবং বিধান পরিষদের সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন।

(২) রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা এবং কার্যাবলি (Power and Functions of the State Legislature) :

ভারতবর্ষে যে কটি রাজ্য আছে তার প্রত্যেকটিতে আইনসভা আছে। কয়েকটি রাজ্যে যেমন - বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদিতে আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যে আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট।

আইনসভার ক্ষমতা : আইনসভার ক্ষমতাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—

- অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা যেমন— বিধানসভার অনুমতি ব্যতীত সরকার কোনো কর ধার্য করতে পারবে না এবং সরকারি তহবিল থেকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারবে না।
- শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, যেমন— রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদ গঠন সম্পূর্ণরূপে বিধানসভার উপর নির্ভরশীল। মন্ত্রীপরিষদ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও তার প্রকৃত কার্যকাল বিধানসভার সদস্যদের উপর নির্ভর করে। মন্ত্রীপরিষদ যতদিন বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ততদিন পর্যন্ত তার পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব।

উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও বিধানসভাকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয় যেমন — তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন এবং জনসংযোগমূলক কার্যাবলি সম্পাদন।

(৩) রাজ্যের বিচারব্যবস্থা (Judicial System in State) :

হাইকোর্ট রাজ্যের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত, সংবিধানের ২১৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। হাইকোর্টের গঠন, বিচারপতিদের নিয়োগ, নিয়োগের যোগ্যতাবলী, বেতন-ভাতা ইত্যাদি সবই সংবিধানে নির্দিষ্ট আছে এবং প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করা হয়।

হাইকোর্টের ক্ষমতা এবং কার্যাবলি :

সংবিধানে হাইকোর্টের ক্ষমতা এবং কার্যাবলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ করা হত, বর্তমানেও সেইসব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সংবিধান এবং আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সীমার মধ্যে থেকে হাইকোর্ট তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই এর হাইকোর্টের মূল এলাকা এবং আপিল এলাকা আছে—

(১) **মূল এলাকা :** রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এই সংশোধন অনুসারে ওই ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোনো আপিল করা যাবে না। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪৩ তম **সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ওই অংশ বাতিল করে পুনরায় হাইকোর্টের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।**

(২) **আপিল এলাকা :** হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

হাইকোর্টের অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মধ্যে আছে হাইকোর্ট অভিলেখ আদালতরূপে কার্য পরিচালনা করেন, যেমন— আদালত অবমানননার জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা, লেখ জারির ক্ষমতা, বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ইত্যাদি।

রাজ্যের নিম্নতর আদালতসমূহ (Sub-ordinate Courts of the State) :

রাজ্যের বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত দিক থেকে সর্বনিম্নে অবস্থিত ন্যায় পঞ্চায়েত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে কোনো গ্রাম-পঞ্চায়েত বিচারকার্য সমাধানের জন্য ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করতে পারে। নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিচারকগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান বিচাপতি নির্বাচিত করেন। তিনিই ন্যায়-পঞ্চায়েতের সভাপতিত্ব করেন। ন্যায়-পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামের ছোটো-খাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

২.৫.১২ সংক্ষিপ্তসার (Summary) :

জাতি ও রাষ্ট্র কথা দুটি সমার্থক নয়। একটি জাতি কতকগুলি শর্তপূরণের নিরিখে রাষ্ট্র গঠন করে। ভারত রাষ্ট্রও গঠিত হয়েছে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে। সুদীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনে থাকায় রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান 'সার্বভৌমত্ব'ই অনুপস্থিত ছিল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করলেই পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানের প্রকৃতি ও চরিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব।

আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আলোচনা করতে হলে জানা প্রয়োজন রাজনৈতিক দল, গঠন ও তার ইতিবাচক কার্যাবলিগুলি কি? সরকারের মুখ্য তিনটি বিভাগ—আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ; যাদের উপর নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্রকাঠামো।

সংসদ : গঠন ও কার্যাবলি (Parliament : Composition and Functions) :

ভারতীয় সংবিধান : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে কেন্দ্রীয় আইন সভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। ব্রিটেনের আইনসভা বলতে যেমন 'রানিসহ পার্লামেন্ট' বোঝায় তেমন আমাদের দেশেও সংসদ বলতে 'রাষ্ট্রপতিসহ পার্লামেন্ট'-কে বোঝায়। ভারত সংবিধানের ৭৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে "ইউনিয়নের একটি সংসদ থাকবে যা রাষ্ট্রপতি ও দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে, সেগুলি যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভা নামে পরিচিত হবে।"

ভারতের সংসদ ব্যবস্থার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সুভাষ সি. কাশ্যপ বলেন ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রথম অস্পষ্ট রূপ দেখা যায়। তৎকালে এর নাম ছিল 'লেজিসলেটিভ কাউন্সিল।' তবে ভারতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার শুভ সূচনা হয় ১৯১৯ সালে। বর্তমান ভারত সংবিধানে কিছু পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

সারণি — ৬.১

একনজরে কেন্দ্রীয় আইনসভা

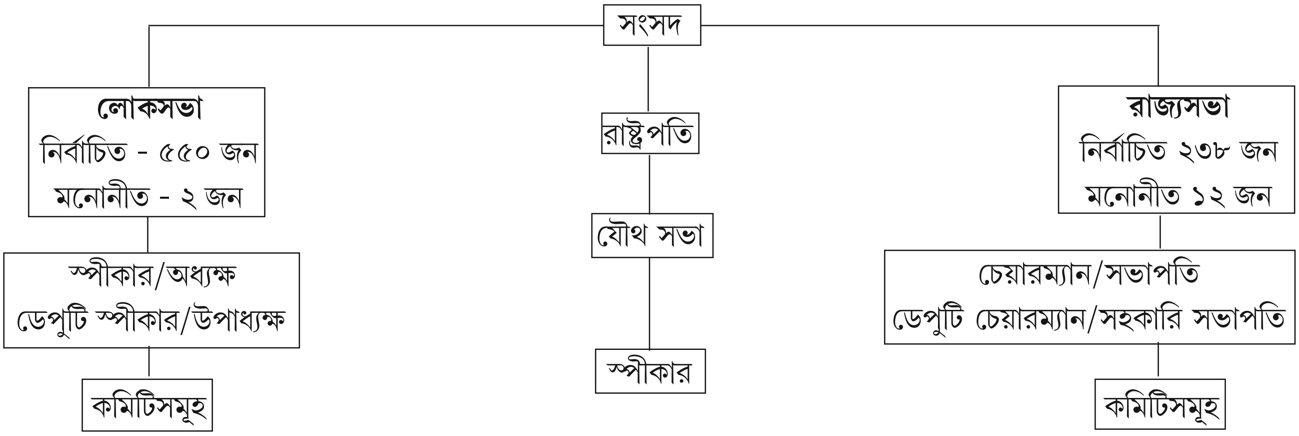

রাজ্যসভা : ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা সংসদের উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্যসভা। ব্রিটেনের উচ্চ কক্ষ লর্ডসভার অনুরূপ ক্ষমতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সেনেটের অনুরূপ গঠন পদ্ধতির অনুকরণে এটি গঠিত। ভারতীয় সংবিধানের ৮০ নম্বর ধারায় বলা আছে, রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা হবে অনধিক ২৫০; এর মধ্যে ২৩৮ জন নির্বাচিত ও ১২ জন হবেন মনোনীত। ২৩৮ জন বিভিন্ন রাজ্যের আইন সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন না। সংবিধানের **চতুর্থ তফসিলে** কোন রাজ্যসভায় কত জন সদস্য নির্বাচিত হবেন তা বলা আছে। সুইজারল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সব অঙ্গ-রাজ্য থেকে সমান সংখ্যক সদস্য প্রেরণের নীতি ভারতে গৃহীত হয়নি। যেমন - পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৬ জন, উত্তরপ্রদেশ থেকে ৩৪ জন, ত্রিপুরা থেকে ১ জন সদস্য রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্যকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন। যেমন - প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভায় মনোনীত হন।

সদস্যপদের যোগ্যতা : রাজ্যসভার সদস্য হতে হলে তাঁকে ভারতের নাগরিক এবং অন্তত ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে। যে রাজ্য বা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হবেন তাঁকে সেই রাজ্যের ভোটার হতে হবে। এছাড়া তাঁর দুটি ''না-সূচক যোগ্যতা'' থাকতে হবে, যথা — (১) তিনি সরকারি কোনো কাজে নিযুক্ত থাকবেন না এবং (২) তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক বা দেউলিয়া ব্যক্তি হবেন না।

কার্যকাল : রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ। রাজ্যসভার সদস্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি দু-বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। এই শূন্য আসনগুলি প্রতি দু-বছর অন্তর পূরিত হওয়ায় রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষে পর্যবসিত হয়েছে।

লোকসভার গঠন : ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। এটি ইংল্যান্ডের কমন্সসভা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার মতো জনপ্রতিনিধি সভা। এ কক্ষের সদস্যরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারত সংবিধানের ৮১ নম্বর ধারায় বলা আছে লোকসভার সদস্যসংখ্যা হবে অনধিক ৫৫২; তন্মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দুজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত হবেন। বর্তমান লোকসভায় ৫৪৩ জন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত এবং ২ জন রাষ্ট্রপতি-মনোনীত সদস্য আছেন। লোকসভার সদস্যসংখ্যা যেহেতু জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত, তাই লোকসভায়ও প্রতিটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে সমসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন না।

যোগ্যতা : লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হতে হলে রাজ্যসভার মতোই সব 'হ্যাঁ-সূচক' ও 'না-সূচক' যোগ্যতার প্রয়োজন। শুধু বয়সের ক্ষেত্রে ৫ বছর কম হলেও চলে। অর্থাৎ ভারতের নাগরিক ও ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। তিনি সরকারি চাকুরি করবেন না এবং বিকৃত মস্তিষ্ক বা দেউলিয়া ব্যক্তি হবেন না।

কার্যকাল : লোকসভার কার্যকালের সাধারণ মেয়াদ হল ৫ বছর। ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে এটি ৬ বছর করা হয়েছিল; ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন করে পুনরায় ৫ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে লোকসভা ৫ বছরের আগে ভেঙে যেতে পারে। তখন সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ তদনুরূপ নির্ধারিত হয়।

লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে এজকন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন।

অধিবেশন পার্লামেন্ট বা সংসদের অধিবেশন : সংসদের প্রতি কক্ষের অধিবেশন সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে বসে। অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। উদ্‌বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন। এ ছাড়া যুগ্ম অধিবেশনও বসতে পারে। রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন বা যে-কোনো কক্ষের অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন।

কোনো কক্ষের প্রথম অধিবেশন ও দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে ছ-মাসের বেশি ব্যবধান থাকবে না। উভয়কক্ষেই মোট সদস্যের এক-দশমাংশ উপস্থিত থাকলে সভার কাজ চলে। এই সর্বনিম্ন সংখ্যা **কোরাম** নামে পরিচিত।

অগ্রগতি যাচাই করো (Check your Progress) :

(১) জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের শর্তগুলি কী কী?

(২) ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করো।

(৩) দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যাবলি উল্লেখ করো।

(৫) শাসন ও আইন বিভাগের কার্যাবলি উল্লেখ করো।

Key Concept :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Democratic System)

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Institutional Structure)

বিচারব্যবস্থা (Judicial System)

আইনবিভাগ (Legislature)

রাজনৈতিক দল (Political Party)

২.৬ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১. ৫০০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

ক. পূর্ব ও বর্তমান স্বাধীন ভারতে সংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো। তুমি কী মনে করো, দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বর্তমান সমাজব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য?

খ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী? ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি সংক্ষেপে আলোচনা করো। এই কাঠামোর মধ্যে কী কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

গ. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। কার্যাবলিগুলির মধ্যে কী কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো, যুক্তিসহকারে বোঝাও?

ঘ. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কী কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে, যুক্তিসহকারে আলোচনা করো।

ঙ. বিচারবিভাগ, আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের কার্যাবলির মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করো। তুমি কী সমর্থন করো যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি বিভাগ একে অপরের উপর নির্ভরশীল?

চ. ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলিগুলি বিশদে আলোচনা করো।

ছ. মন্ত্রীপরিষদ কী? মন্ত্রী পরিষদকে ক-টি বিভাগে বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়? প্রতিটি বিভাগের কার্যাবলিগুলি আলোচনা করো। তোমার মতে সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনা করার জন্য কোন্ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কেন?

জ. সংসদ কী? সংসদের গঠন ও কার্যাবলিগুলি আলোচনা করো।

২. ২৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

ক. রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

খ. রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিগুলি আলোচনা করো।

গ. বহুদল ব্যবস্থা কী? এটিকে ক-টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়? প্রতিটি শ্রেণি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ঘ. বহুদল ব্যবস্থার গুণাবলি ও ত্রুটিগুলি আলোচনা করো।

ঙ. বিচারবিভাগ বলতে কী বোঝ? এই বিভাগের কার্যাবলিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

চ. বিচারবিভাগ ও আইনবিভাগের কার্যাবলির মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

ছ. রাজ্যের শাসনবিভাগের কার্যাবলিগুলি আলোচনা করো।

জ. রাজ্যের শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

৩. **২৫টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**

ক. রাষ্ট্র শব্দটির ব্যাখ্যা করো।

খ. মৌলিক অধিকার কী?

গ. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?

ঘ. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও।

ঙ. রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের পূর্বের কার্যাবলিগুলি লেখো।

চ. বিচারবিভাগের ধারণাটি ব্যক্ত করো।

ছ. ভারতের উপরাষ্ট্রপতির কার্যাবলি আলোচনা করো।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Milestones of Indian Education—B.R. Purakait
2. স্বাধীন ভারতের শিক্ষা—বেবী দত্ত, কল্পনা সেন বরাট, দেবিকা গুহ
3. Education in Emerging Indian Society – Madhumita Sharma
4. Constitution of India, 1950 – Lawmann's
5. Introduction to the Constitution of India – (2013) Durgadas Basu

অধ্যায় ৩ ভারতের সংবিধান ও শিক্ষা (CONSTITUTION OF INDIA AND EDUCATION)

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.২ উদ্দেশ্য (Objective)

৩.৩ সংবিধান এবং শিক্ষা (Constitution and Education)

৩.৪ ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার যুগ্ম অবস্থান (Concurrent Status of Education)

৩.৫ সমমাত্রিক সমাজ গঠনে সংরক্ষণ নীতি (Reservation as an Egalitarian Policy)

৩.৬ ভারতীয় সংবিধানে সাম্য এবং ন্যায়বিচার (Equality and Justice in the Indian Constitution)

৩.৭ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

৩.৮ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৩.১ ভূমিকা (Introduction) :

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় মৌলিক নিয়মকানুনসমূহের সমষ্টিকে সাধারণভাবে সংবিধান বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সর্বপ্রকার নিয়মকানুনকে বোঝায়। লিখিত নিয়মকানুন বলতে আইন এবং অলিখিত নিয়মকানুন বলতে প্রথা, প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিকে বোঝায়। কোনো একটি জাতির লক্ষ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও জনগণের জন্য নানা কল্যাণমূলক কাজের অঙ্গীকার নিয়ে সেই দেশের সংবিধান রচিত হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৫০ খ্রিঃ ২৬ জানুয়ারি প্রবর্তিত সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম এই সংবিধানের রচয়িতাগণ ভারতীয় সমাজের এইরূপ প্রকৃতির কথা মনে রেখেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি লক্ষ রেখেছিলেন। কারণ উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে সংবিধানের উদ্দেশ্য কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। সুতরাং সংবিধান রচনার সময় শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা সংযোজিত করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ব্যতিরেকে আরও তিনটি অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে— ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমতা। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যুগে আর্থিক সংগতির ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হয়েছে। এই বৈষম্য দূরীকরণে (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে) সম অধিকারের নীতিকে কার্যকর করার জন্য বিশেষ যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা সংরক্ষণ নামে পরিচিত। সমাজের এই বঞ্চিত জনগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল— তপশিলি জাতি, উপজাতি, পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু শ্রেণি এবং নারীসমাজ।

ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতবর্ষেও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে 'সাম্য' কথাটি একটি সামাজিক আদর্শ হিসেবেই চিহ্নিত। ভারতীয় সংবিধানে 'সাম্য' বিষয়টি যেমন সকল স্তরের ভারতীয় নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত, ঠিক তেমনি সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ন্যায়' শব্দটি নাগরিক মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সংযোজিত হয়েছে। একটি দেশ তথা জাতি গঠনে অন্যতম প্রয়োজন হল নাগরিকদের মধ্যে ন্যায়ের মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনার মূল ক্ষেত্র হল বিদ্যালয়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার প্রকারভেদে শিক্ষাব্যবস্থায় তাই পদ্ধতিগত ও প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা ছাড়াও মুক্ত বিদ্যালয় ও প্রতিবেশী বিদ্যালয় ব্যবস্থা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে—একথা বলাই বাহুল্য।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা—

- ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার অবস্থান ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সংবিধানে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণ ও সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ বিষয়ে সমমাত্রিক তত্ত্ব গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সংবিধানে সাম্য ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণ আলোচনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় ব্যবস্থা এবং প্রতিবেশী বিদ্যালয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.৩ সংবিধান এবং শিক্ষা (Constitution and Education) :

"Liberty of thought, expression, belief, faith and worship are the desired objectives of the Constitution of India"– Preamble of the Indian Constitution

ভারতবর্ষ হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই এই সংবিধানে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা, ৮টি তপশিলি ধারা নিয়েই ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান তার যাত্রাপথ শুরু করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কয়েকটি উপধারা বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধান রচয়িতাগণ একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য এবং ঐতিহ্যশালী ভারতের ঐক্য ও সংহতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। সুতরাং সমগ্র দেশকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এমন শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে সংবিধানে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা :

সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির ৪৫নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সংবিধান প্রচলন হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র, ১৪ বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করবে। এখানে 'রাষ্ট্র' বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনসভা, রাজ্য সরকার, বিধানসভা ও ভারত সরকারের শাসনাধীন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ।

এইভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সকলের সমন্বিত দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

(২) সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার :

মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে সংবিধানের ৩০ নং ধারায় সংখ্যালঘুদের পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার স্বীকৃত বলে উল্লিখিত হয়েছে। ৩০(১) নং ধারায় বলা হয়েছে, সমস্ত ধর্মমত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজেদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে। ৩০(২) নং ধারায় বলা হয়েছে, ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে সংখ্যালঘু-এই অজুহাতে সাহায্যদানে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য রাখবে না।

সংবিধানের ২৯নং ধারায় বলা হয়েছে, ভারতের যেকোনো স্থানে বসবাসকারী নাগরিকের কোনো অংশের মধ্যে যদি পৃথক ভাষা বা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে তাহলে তা সংরক্ষণের অধিকার তাদের থাকবে। সরকার পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তির ক্ষেত্রে কোনো ভারতীয় নাগরিককে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৩৫০(খ) নং ধারায় বলা হয়েছে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন বিষয়ে স্বার্থরক্ষার জন্য অনুসন্ধান করতে একজন অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

(৩) সমাজের দুর্বল শ্রেণির শিক্ষা :

দুর্বল শ্রেণির (বিশেষত পিছিয়ে পড়া জনজাতি বা উপজাতি) শিক্ষার স্বার্থে ১৫, ১৭, ৪৬ নং ধারায় বক্তব্য আছে।

৪৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ভারতের দুর্বলতর শ্রেণির বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতি শিক্ষার স্বার্থে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাদের সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করার কথাও বলা হয়েছে।

১৫(৩) নং ধারায় নারী ও শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ সুবিধাদানের কথা বলেছে।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা :

সংবিধানের ২৫(ক) নং ধারায় সমস্ত নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম অনুশীলনের কথা বর্ণিত। সংবিধানের ২৪(ক) ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি অনুদানে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না।

২৪(খ) নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো 'এনডাউমেন্ট' বা ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থাপিত কোনো বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৩০নং ধারায় বলা হয়েছে, আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই তা সে ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন, কোনো পার্থক্য করা হবে না।

(৫) নারীশিক্ষা :

সংবিধানের ১৫(ক) নং ধারায় লিঙ্গের ভিত্তিতে সরকার নাগরিকদের কোনো পার্থক্য করবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬(ক) নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকারের অধীনে সমস্ত অফিসে নিয়োগ বা চাকরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার পাবে।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা :

সংবিধানে ৩৫১(ক) নং ধারায় প্রতিটি রাজ্য বা রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্তানরা যাতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে নির্দেশ জারি করতে পারেন।

(৭) হিন্দি ভাষার শিক্ষা :

৩৫১নং ধারায় বলা হয়েছে, হিন্দি ভাষার উন্নতির ও প্রসারের জন্য ভারত সরকার দায়বদ্ধ। যাতে এই ভাষার মাধ্যমে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির উপাদানসমূহের সমৃদ্ধিকে গ্রহণ করতে ও প্রকাশ করতে পারে সেজন্য সংস্কৃত বা অন্য ভাষায় শব্দ চয়ন করা যেতে পারে। এই কাজে প্রতিভা, গঠনরীতি, প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিমাতে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

(৮) জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ :

সংবিধানের ৪৯নং ধারায় বলা হয়েছে, লোকসভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধ, শিল্প, ঐতিহাসিক নিদর্শনকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার নেবে।

(৯) অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়ে সাহায্য :

সংবিধানের ৩৩৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে সাহায্য দেওয়া হবে। তারপর প্রতি তিন বছর বাদে এই সাহায্য ১০ শতাংশ হারে কমতে পারে। যেসব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলে অন্য সম্প্রদায়ের ৪০ শতাংশ ছাত্র ভরতি করা হবে না সেখানে সাহায্য দেওয়া হবে না।

নিজ অগ্রগতি যাচাই—

- সংবিধান বলতে কী বোঝ?
- সংবিধান কবে কার্যকর হয়?
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লিখিত বিষয়টি লেখো।
- সংবিধানের ৩০নং ধারা উল্লেখ করো।
- ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা কী?

৩.৪ ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার যুগ্ম অবস্থান (Concurrent Status of Education) :

দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার জাতীয় নীতি গঠনের দায়িত্ব কেন্দ্রের। দেশের উন্নতি ও সংহতি আসবে সুচিন্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে। যদিও ভারতীয় মূল সংবিধানে শিক্ষাকে মূলত রাজ্যের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে দেশের মূলগত ঐক্য বজায় রেখে শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাজ্য যাতে তার নিজস্ব সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করতে পারে, তার দায়িত্ব রাজ্যের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষার সমন্বয়মূলক চরিত্র বজায় রাখা, শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতিসাধন এবং সমগ্র শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব বহন করবে এবং রাজ্য সরকারগুলিকেও জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে সাহায্য করতে হবে। ভারতীয় সংবিধানের এইরূপ ব্যবস্থাকেই ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে একটি 'অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোভিত্তিক ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তপশিলিতে কেন্দ্রীয় স্তরে, রাজ্য স্তরে এবং যুগ্ম বা যৌথ স্তরে ক্ষমতা বিভাজিত আছে। আইন প্রণয়নের যেসকল ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ই আইন প্রণয়নের অধিকারী সে সকল বিষয় যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

যুগ্ম তালিকা বলতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়গুলিকে বোঝায়। যৌথ তালিকায় মোট ৪৭টি ধারার মধ্যে ৬টি ধারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত। এই ধারাগুলি নিম্নরূপ—

১৫নং ধারার ১নং উপধারায় ভারতীয় সমাজে শিক্ষার ব্যাপারে নারীদের সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

১৭নং ধারায় সমাজে সব শ্রেণির মানুষের বিদ্যালয় শিক্ষার অধিকার থাকবে। অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজে এক অভিশাপ। এই অভিশাপের হাত থেকে আমরা মুক্তি চাই।

২৪নং ধারায় উল্লেখ আছে ১৪ বছরের নীচে কোনো শিশুকে শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

২৪নং ধারার (i) উপধারায় সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোনো বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

২৪নং ধারার (ii) উপধারায় কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো ট্রাস্ট (Trust) দ্বারা পরিচালিত হলেও, সরকার পরিচালিত ও প্রশমিত হলেও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

২৪নং ধারার (iii) নং উপধারায় অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় শিক্ষা বা নির্দেশনামা গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, যদি প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

২৯নং (i) নং উপধারায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়েছে। ভারতের যে কোনো জায়গাতে, যে কোনো জনগোষ্ঠী থাকুক না কেন, তাদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার থাকবে।

২৯নং ধারার (ii) নং উপধারায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার কারণে সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীকে ভর্ত্তির বাধাদান করতে পারবে না।

৩০নং ধারার (i) নং উপধারায় ধর্মীয় ব্যক্তির নিজ পছন্দ অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে।

৩০নং ধারার (ii) নং উপধারায় ধর্মীয় অথবা ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত ও স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি সাহায্যের ব্যাপারে বিচ্ছেদ করা চলবে না।

৪১ নং ধারার (i) নং উপধারা অনুসারে ভারতের সমস্ত নাগরিকের শিক্ষার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৪৫নং ধারা অনুসারে সংবিধান কার্যকারী হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

৪৬নং ধারায় রাষ্ট্রকে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪৯নং ধারায় জাতীয় কৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সৌধগুলিকে রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৩৩৭নং ধারায় শর্তসাপেক্ষে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনুদানের কথা বলা হয়েছে।

৩৫০নং ধারার (i) নং উপধারায় বলা হয়েছে, ভারতের যে কোনো ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিযোগ জানানো যাবে।

৩৫০নং ধারার (ii) নং উপধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন অফিসার নিয়োগ করবেন। তিনি সমস্ত অভিযোগ নিয়মিত রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদ কক্ষে প্রেরণ ও সমাধানের ব্যবস্থা করবেন।

৩৫১নং ধারা — যেহেতু হিন্দি রাষ্ট্রীয় ভাষা, তাই এই ভাষার উন্নতিকল্পে দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রের।

নিজ অগ্রগতি যাচাই—

- সংবিধানের অর্থ কী?
- কখন ও কোন্ সংশোধনের দ্বারা শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত হয়েছিল?
- ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে কী ধরনের রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে?
- সংবিধানে যুগ্ম তালিকাভুক্ত যে-কোনো চারটি বিষয় উল্লেখ করুন।

৩.৫ সমমাত্রিক সমাজ গঠনে সংরক্ষণ নীতি (Reservation as an Egalitarian Policy) :

ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা শাসনকার্য পরিচালনা করার ফলে সাধারণ জনমানসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজদের অন্যায়, বঞ্চনার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত। অক্ষর জ্ঞানহীন অসংখ্য মানুষের ভিড়ে নিমজ্জিত প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ চিত্রও ছিল অভিশপ্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজিত ভারতীয় সমাজে

শিক্ষার আলো বেশিদূর প্রসারিত হতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে ধর্মভীরুতা ও নানাবিধ কুসংস্কার। সামাজিক স্তর বিন্যস্ত ভারতীয় সমাজে বেশিরভাগ মানুষই উচ্চবর্ণের মানুষের নিকট অবহেলিত ও বঞ্চিত থেকেছে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সংবিধান প্রণয়নকালে, সংবিধান প্রণেতাগণ সমাজের এই গভীর ক্ষত সারিয়ে তুলতে এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হয়। যুগ যুগ ধরে যারা বঞ্চিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শিক্ষার আলো আজও যাদের স্পর্শ করেনি, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পশ্চাৎপদতা। সামাজিক এই অভিশাপকে দূর করতে সংবিধানে সমমাত্রিক বা সমানাধিকার (Egalitarian) সমাজ গঠনে সংরক্ষণ নীতি যুক্ত করা হয়েছে। পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিশেষ ব্যবস্থাই সংরক্ষণ হিসেবে পরিচিত। সামাজিক বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়, সমাজে একশ্রেণির মানুষ সমাজ অগ্রগতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই সকল ব্যক্তিরা সমাজের মূল ধারা থেকে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করতে পারে না, ফলে দলগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পিছিয়ে পড়ে। তাদেরকেই বলা হয় 'পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী'। ভারতে অনেক মানুষই গরিব ও নিরক্ষর, তবে সব দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষই পিছিয়ে পড়া শ্রেণিভুক্ত নয়। পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে যারা চিহ্নিত, তারা হল— তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণির মানুষ (OBC), সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং নারীসমাজ। সংবিধানে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসকল ধারা ও নীতি সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ—

- **তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি :**

(ক) সংবিধানের ১৫নং ধারায় উল্লিখিত ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান, নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যতিক্রম করা হবে না। তবে সামাজিক কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারেন।

(খ) ১৬(৪) নং ধারানুযায়ী সংবিধানে সরকারি চাকুরিতে পদ সংরক্ষণের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

(গ) সংবিধানের ১৭নং ধারানুযায়ী দেশে সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্যতাকে আইনের দ্বারা দণ্ডণীয় অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) ৪৬ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্র পশ্চাৎপদ ও তপশিলি শ্রেণিভুক্ত মানুষদের শিখন ও আর্থিক স্বার্থে যাবতীয় উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করবে ও তাদের সামাজিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে।

(ঙ) ২৭৫(১) নং ধারানুযায়ী, তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ও তাদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) সংবিধানের ৩৩০নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, যে-কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

ছ) ৩৪০নং ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগণের অসুবিধাগুলির অনুসন্ধান এবং সেগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি আর একটি কমিশন নিয়োগ করতে পারেন।

- **সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ :**

সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ২৯(১) নং ধারায় উল্লেখিত, ভারতের যে কোনো স্থানে বসবাসকারী নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার থাকবে। এছাড়াও ২৯(২) নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকার পরিচালিত, অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা কোনো একটি বিষয়ের অজুহাতে কোনো নাগরিককে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংবিধানের ৩০নং ধারায় সংখ্যালঘুদের পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৩০নং ধারার ১ এবং ২নং উপধারায় ধর্মীয় অথবা ভাষাগত সংখ্যালঘু যে-কোনো ব্যক্তির নিজ পছন্দ অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

সংবিধানের ৩৫০(খ) ধারায় বলা হয়েছে যে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বার্থরক্ষার বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

- **নারীশিক্ষা :**

যে-কোনো রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নতিতে নারী এবং পুরুষ উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীশিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করা যাবে না। আর শিক্ষার সর্বজনীনতার ওপর যদি গুরুত্ব আরোপ করতে হয় তাহলে নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ভারতীয় সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। নারী প্রগতির বিষয়টি আজ আর উপেক্ষিত নয়। নারীশিক্ষার উন্নতিকল্পে নানাবিধ কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে এবং তাদের সুপারিশগুলি কার্যকর করার সচেষ্ট উদ্যোগের ফলে নারী শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে নারীশিক্ষা সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষ কোনো ধারা চিহ্নিত না থাকলেও সংবিধানের তৃতীয় অংশের ১৪, ১৫ ও ১৬ নং ধারায় সবার জন্য সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে আইনের চোখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব নাগরিকই সমান।

নিজ অগ্রগতি যাচাই

- সংরক্ষণ নীতি বলতে কী বোঝ?
- পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কারা?
- তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাগুলি কী কী?
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানে উল্লেখিত ধারাগুলি উল্লেখ করো।

৩.৬ ভারতীয় সংবিধানে সাম্য এবং ন্যায়বিচার; বিভিন্ন বিদ্যালয়ব্যবস্থা এবং সাধারণ প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের ধারণা (Equality and Justice in the Indian Constitution, Different School System and the Idea of Common Neighbourhood School)

মৌলিক অধিকার হল রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত সেইসব অধিকার যা ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য। অর্থাৎ নাগরিকগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে তার সবগুলিকেই মৌলিক অধিকার বলে না। সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুর মতে, মৌলিক অধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যা সংবিধান কর্তৃক লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২-৩৫ নং ধারায় নাগরিকদের জন্য যে ৬টি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে, তার মধ্যে 'সাম্যের অধিকার'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ১৪-১৮নং ধারায় সাম্যের অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। সাম্যের অধিকার বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, ধনী-দরিদ্র এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের আত্মবিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক সুযোগসুবিধা এবং দাবির স্বীকৃতিকে বোঝায়।

সংবিধানের ১৪নং ধারা অনুযায়ী, 'ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' অথবা আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার' অস্বীকার করতে পারবে না। এই ধারাটিতে যে দু-ধরনের সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা হল — (ক) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও (খ) আইনের সমান সংরক্ষণ।

১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ধর্ম-জাতি-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ এবং অবস্থান প্রভৃতি কারণে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। যেমন— সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত দোকান, হোটেল, স্নানাগার এবং বিনোদন স্থলে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতিকে ভিত্তি করে কোনো বিভেদমূলক আচরণ করা যাবে না।

সংবিধানের ১৬নং ধারায় বলা হয়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, জন্মস্থান ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কোনো নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কোনো চাকরির জন্য অনুপযুক্ত বলে গণ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ১৭নং ধারানুযায়ী অস্পৃশ্যতাকে বিলোপ করা হয়েছে, যে-কোনোভাবেই অস্পৃশ্যতাকে কার্যকর করার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় হবে।

১৮নং ধারায় বলা হয়েছে, সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র কোনো উপাধি দিতে পারবে না। কোনো ভারতীয় নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না [১২(২) নং ধারা]। সমমর্যাদা ও বিশেষ মর্যাদা পরস্পরের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। তাই কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদানের ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যদিও ১৯৫৪ খ্রিঃ থেকে 'ভারতরত্ন', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী' ইত্যাদি খেতাব প্রদান চালু হয়েছে। জনতা সরকার ওই প্রথা বাতিল করে দিলেও ১৯৮০ খ্রিঃ থেকে ইন্দিরা সরকার পুনরায় চালু করে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিকদের যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা হল— ন্যায়বিচার (Justice), স্বাধীনতা (Liberty) এবং সাম্য বা সমতা (Equality)। এর মধ্যে 'ন্যায়' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— (ক) সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) (খ) অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার (Economic Justice) এবং (গ) রাজনৈতিক ন্যায়বিচার (Political Justice)।

সংবিধান এবং ন্যায় (Constitution and Justice) :

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ন্যায়' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

(ক) সামাজিক ন্যায় (Social Justice)

(খ) অর্থনৈতিক ন্যায় (Economic Justice) এবং

(গ) রাজনৈতিক ন্যায় (Political Justice)

(ক) সামাজিক ন্যায় (Social Justice) : সামাজিক ন্যায় বলতে বোঝায় সমাজের প্রতিটি সদস্যকে সমমর্যাদা এবং সমসুযোগ প্রদান করা। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—

(১) শিক্ষার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে।

(২) প্রতিটি নাগরিক জ্ঞানের বিকাশ এবং আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাবে।

(৩) অস্পৃশ্যতাকে আইন দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(৪) সামাজিক স্তরবিন্যাস থাকবে না।

(৫) পশ্চাদ্‌বর্তীদের বিশেষ সুযোগ দিতে হবে।

(৬) কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার দিতে হবে।

(খ) অর্থনৈতিক ন্যায় (Economic Justice) : ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার হিসাবে অর্থনৈতিক ন্যায়-নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের অর্থ উপার্জন, অর্থসঞ্চয় এবং অর্থনৈতিক সুযোগ ভোগ করার অধিকার আছে। উপার্জনের জন্য ব্যবসা বা কাজের অধিকার আছে।

(গ) রাজনৈতিক ন্যায় (Political Justice) : রাজনৈতিক ন্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল—

(১) ভোটাধিকার।

(২) সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার।

(৩) নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার।

(৪) সরকার গঠনের অধিকার।

(৫) সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার ইত্যাদি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ন্যায়নীতির গুরুত্ব হল—

প্রথমত, শিক্ষার্থীকে সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল্যবোধকে উৎসাহিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যুগ যুগ ধরে যারা বঞ্চিত, শারীরিক দিক থেকে যারা অক্ষম এবং মানসিক দিক থেকে যারা পিছিয়ে পড়ে আছে তাদেরকে বিশেষ সুযোগ দিতে হবে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের জন্য তাদের বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগ (Types of School) :

সপ্তম All India Educational Survey অনুযায়ী আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণিবিভাগগুলিকে নিম্নোক্ত ছকে রূপ দেওয়া হল।

বিদ্যালয় ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ (প্রশাসনভিত্তিক)

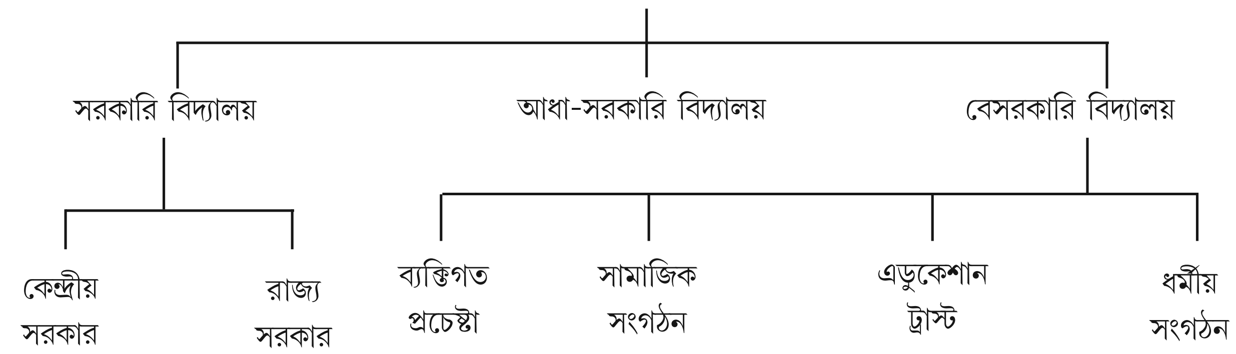

সরকারি বিদ্যালয় (Government School) :

যে বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়দায়িত্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই সরকারি বিদ্যালয় বলে। দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারের হাতে থাকলে বলা হয় রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়।

আধা-সরকারি বিদ্যালয় (Semi-Government Aided School) :

আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকার বহন করে। তবে বিদ্যালয়ের একটি পরিচালন সমিতি থাকে যারা বিদ্যালয় পরিচালন সংক্রান্ত দায়িত্বগুলি পালন করে।

বেসরকারি বিদ্যালয় (Private School) :

এই বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সংস্থান, পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষক নিয়োগ সবই নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিকে আবার কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

(ক) ব্যক্তিভিত্তিক বিদ্যালয় : এখানে যে ব্যক্তি বিদ্যালয় স্থাপন করেছে তারই ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যালয়ের আর্থিক সংস্থান, পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ, তাদের স্থায়িত্ব সবই নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) সংগঠনভিত্তিক বিদ্যালয় : আমাদের দেশে এমন অনেক ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সামজিক সংগঠন আছে যারা শিক্ষার প্রসারে বিদ্যালয় স্থাপন করে। যেমন— রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী দয়ানন্দ বিদ্যালয়, টাটা গোষ্ঠী এবং প্রেমজি গোষ্ঠী ইত্যাদি।

(গ) এডুকেশান ট্রাস্ট : অনেক সংস্থা আছে যারা প্রথমে একটি আইন অনুযায়ী ট্রাস্ট গঠন করে। ওই ট্রাস্ট সমাজসেবামূলক একাধিক কাজ করে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষার প্রসার। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ, যেমন— আর্থিক সংস্থান, পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ, তাদের চাকরির নিরাপত্তা ইত্যাদি ট্রাস্টের নিয়মানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ঘ) ধর্মীয় সংগঠন : অনেক ধর্মীয় সংগঠন আছে যারা ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বজায় রেখে শিক্ষার প্রসার করে। আমাদের দেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও নিম্নে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলিকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল—

বিদ্যালয় ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ

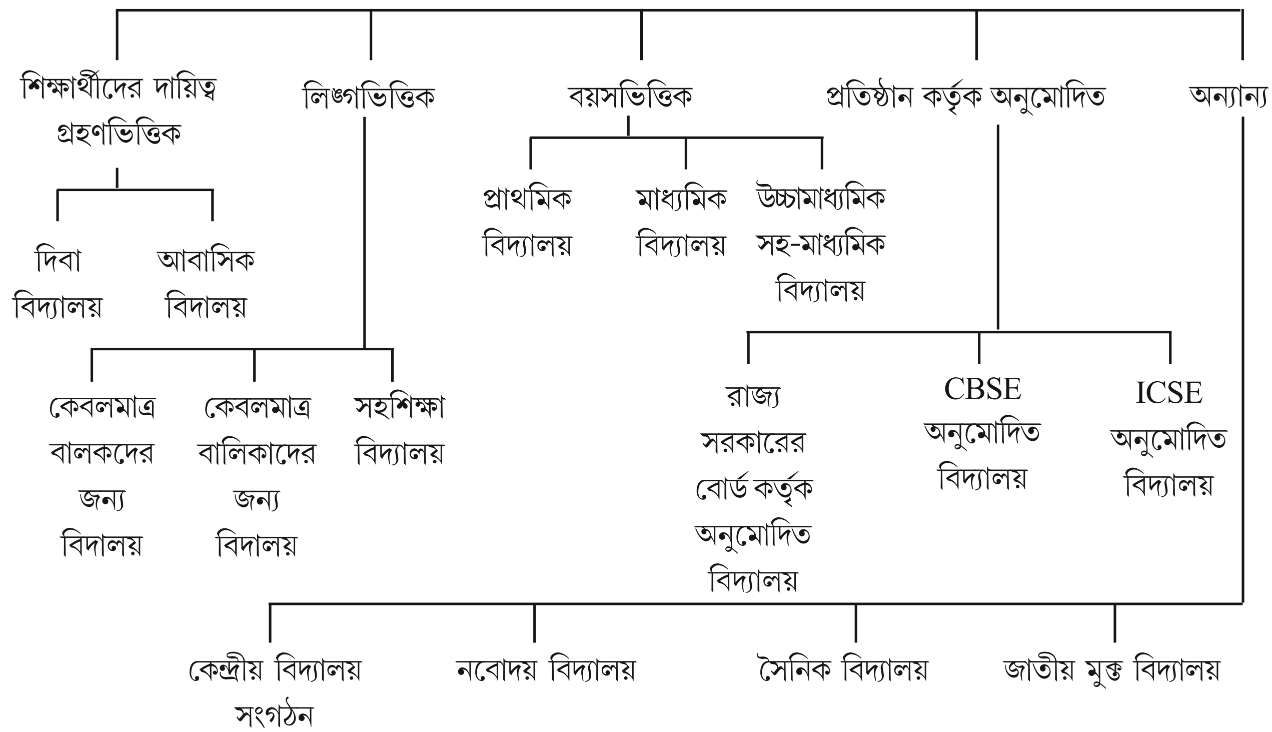

শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব গ্রহণভিত্তিক বিদ্যালয় (Responsibility-wise School) :

এই ধরনের বিদ্যালয়কে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(i) দিবা বিদ্যালয় : এই বিদ্যালয়গুলি দিনের নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু করে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়। বাড়ি থেকে যাতায়াত করে শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(ii) আবাসিক বিদ্যালয় : এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বাসস্থানে থাকতে হয়। তাদের থাকা, খাওয়া, পঠন-পাঠন সবই বিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

লিঙ্গভিত্তিক বিদ্যালয় (Gender-wise School) :

যে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বালকদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থাকে তাকে বালক বিদ্যালয় বলে। একইভাবে যে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বালিকারা শিক্ষাগ্রহণ করে আবার যে বিদ্যালয়ে বালক এবং বালিকা উভয়েই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তাদের যথাক্রমে বালিকা বিদ্যালয় এবং সহশিক্ষামূলক বিদ্যালয় বলে।

সময়কালভিত্তিক বিদ্যালয় (Age-wise School) :

যে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে। যে বিদ্যালয়ে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ আছে তাকে বলা হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং যে বিদ্যালয়ে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ আছে তাকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় বলে।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয় (Authority Affiliated School) :

অনুমোদনের সংস্থাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়গুলিকে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদিত, CBSE এবং ICSE সংস্থা থেকে অনুমোদিত।

অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয় (Other Schools) :

এই ধরনের বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(i) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন :

যেসব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের চাকরিতে স্থান পরিবর্তন করতে হয় (Transferable Job) তাদের সন্তানদের জন্য ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর থেকে চালু হয়েছে এই বিদ্যালয়। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান।

(ii) নবোদয় বিদ্যালয় বা পেস সেটিং বিদ্যালয় :

এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের কথা জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)-তে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ প্রতিভা বা প্রবণতাসম্পন্ন শিশুদের আর্থিক সংগতি বিবেচনা না করে যাতে তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল সমতা ও সামাজিক ন্যায় বজায় রেখে উৎকর্ষের উদ্দেশ্য পূরণে জাতীয় সংহতির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিভাসম্পন্ন শিশুদের একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা এবং তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক এবং আবাসিক হবে। এই ধরনের বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে পৃথক হবে।

(iii) জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় :

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সব রাজ্যে মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই মুক্ত বিদ্যালয়ের নাম হল রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়। যেসব ব্যক্তি কোনো কারণে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পায়নি বা পাঠ ত্যাগ করেছে তাদের জন্য মুক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটি দূরশিক্ষা ব্যবস্থার একটি শ্রেণি।

সাধারণ বিদ্যালয় (Common School) :

কোঠারি কমিশন (১৯৬৪) সাধারণ বিদ্যালয় বা Common School System সম্পর্কে সুপারিশ করে। সুপারিশে বলা হয় শিক্ষার সমসুযোগকে নিশ্চিত করতে সমগ্র দেশে এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই বিদ্যালয়গুলি উন্নতমানের হবে যদি অভিভাবকগণ বেসরকারি ব্যয়বহুল বিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তি করার প্রয়োজন বোধ না করেন। এজন্য কমিশন নিম্নে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার সুপারিশ করেন —

(1) সরকারি বা বেসরকারি যে কর্তৃপক্ষেরই অধীনে কাজ করুক না কেন, সব শিক্ষকগণই বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা সমানভাবে ভোগ করবেন। যেমন—

- সমান যোগ্যতা এবং দায়িত্বসম্পন্ন শিক্ষক সমবেতন পাবেন।
- সব শিক্ষকই একই রকম অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।
- চাকরির শর্ত এবং কাজের অবস্থা সব বিদ্যালয়ে একই হবে। চাকরিতে নিয়োগ পদ্ধতি একই হবে।

(2) চতুর্থ পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিকস্তর থেকে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ব্যবস্থা ক্রমশ তুলে দেওয়া হবে।

(3) স্থানীয় সরকারি এবং বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাজের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

(4) সুবিধাভোগী বিদ্যালয় এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood School) পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে খুবই প্রশংসনীয় সুপারিশ। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা মানা হয়নি। এর প্রধান কারণ হল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য। সরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থাকার জন্য বেসরকারি সংস্থা উন্নত পরিকাঠামোসহ অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দ্বারা পঠন-পাঠন ব্যবস্থা করতে সক্ষম। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকগণ সন্তানদের উন্নতমানের শিক্ষার জন্য আগ্রহী এবং সেই কারণেই এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের উন্নত পরিকাঠামোসহ উন্নতমানের বিদ্যালয় অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত অধিক বেতনের বিদ্যালয়ে ভরতি করান। এইভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

প্রতিবেশী বিদ্যালয়ব্যবস্থা (Neighbourhood School) :

আমাদের সমাজব্যবস্থায় অনেক বিধিনিষেধ আছে। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়গুলিও এই বাধানিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে আজও প্রভাবিত করে। জাতীয় সংহতি এবং ঐক্য স্থাপন এবং তাকে স্থায়ী করার জন্য এই বাধাগুলিকে উচ্ছেদ করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের কৌশল হিসাবে গ্রহণ করলে এই বিধিনিষেধের বাধাকে সহজেই অতিক্রম করা যায়। আঞ্চলিক সংহতি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবোচিত ও সুস্থায়ী করার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণ স্কুলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষার্থীর বাড়ির নিকটবর্তী প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রতিবেশী স্কুল বলে।

কোঠারী কমিশন তাঁদের সুপারিশে দেশের প্রায় সব অঞ্চলে প্রতিবেশী স্কুল স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রতিবেশী স্কুলের বৈশিষ্ট্য :-

(i) প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় স্থাপিত হবে।

(ii) শিশুর বাড়ি থেকে বিদ্যালয় হবে স্বল্প দূরত্বের যাতে বাড়ি থেকে শিশু হাঁটাপথে সহজে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে।

(iii) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিশুকে যাতে ১ কি.মি.-এর বেশি এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিশুকে যাতে ৩ কি.মি.-র বেশি হাঁটতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(iv) যাতায়াতে কোনো যানবাহনের প্রয়োজন না হওয়ায় জ্বালানির সাশ্রয় হবে, দুর্ঘটনার সংখ্যা কমবে এবং শিশুর পরিবারকে যাতায়াতের জন্য কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না।

(v) নিকটবতী এলাকার শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে।

(vi) প্রতিবেশী বিদ্যালয় নিজ এলাকায় হওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রতি এলাকার মানুষের মমত্ববোধ বাড়বে। বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের জন্য জনসমষ্টির সংযোগ সুদৃঢ় হবে।

- **নিজ অগ্রগতি যাচাই—**

(ক) সংবিধানে 'সাম্য' ও 'ন্যায়' কথাদুটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করো।

(খ) সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে 'সাম্য' কথাটি বিশ্লেষণ করো।

(গ) বিভিন্ন বিদ্যালয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

(ঘ) প্রতিবেশী বিদ্যালয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

৩.৭ সংক্ষিপ্তসার (Summary) :

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হল সংবিধান। পৃথিবীর বৃহত্তম ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকায় বিন্যস্ত। সংবিধানে শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও শিক্ষার একটি মর্যাদা সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে। সংবিধানে শিক্ষার প্রসারে কিছুক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সাম্য ও ন্যায় শব্দ দুটির গুরুত্ব সংবিধানে বিশেষ স্থান পেয়েছে। সাম্য ও ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে গণতন্ত্র কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না।

শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপ বিদ্যালয়। তাই বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়, তাদের কার্যাবলি আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজনীয় ধারণা (Key Concept) :

- অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (Free and Compulsory Education)
- সংখ্যালঘু (Minority)
- শিক্ষার যুগ্ম অবস্থান (Concurrent Status of Education)
- সংরক্ষণ নীতি (Reservation Policy)

৩.৮ অনুশীলনী (Unit End Exercise) :

(ক) সংবিধানে উল্লিখিত 'সাম্যের' নীতিটি ব্যাখ্যা করো।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে 'ন্যায়' কথাটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

(গ) বিভিন্ন বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রকারভেদ আলোচনা করো।

(ঘ) সংবিধানে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করো।

(ঙ) সংবিধানে যুগ্ম তালিকাভুক্ত শিক্ষার অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করো।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (References) :

- Contemporary India and Education – Dr. Ms Sachdeva, K.K. Sharma, Chanchal Kumar & Sunita Sharma
- The Past as Present – Romila Thapar
- Caste, Discrimination and Exclusion in Modern India – Vani Kant Borooah, Dilip G. Diwakar, Vinod Kumar Mishra
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিচিন্তা—ড. হিমাংশু ঘোষ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

অধ্যায় ৪

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯
(RIGHT TO EDUCATION ACT, 2009)

৪.০ শিক্ষার অধিকার আইনের ভূমিকা (Role of Right to Education Act)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ নীতি আইনের ধারা এবং সুযোগ সুবিধা (Policies, Acts and Provisions)

৪.৩ শিক্ষার অধিকার আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Perspective of Right to Education Act)

৪.৪ শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি (Right to Education Act, 2009 & Relevant Government Notifications in West Bengal)

৪.৫ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

৪.৬ অনুশীলনী (Unit-end Exercise)

৪.০ ভূমিকা (Introduction) :

ভারতবর্ষে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ১৮৭০ ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইনগুলি গৃহীত হলে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গণশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ নিজেকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের সংবিধান (Constitution of India)-ও ওই বছর থেকে কার্যকর হয়। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে— সংবিধান চালু হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে প্রতিটি শিশুর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এই নির্দেশাত্মক নীতির শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যপূরণ হয়নি। অবশেষে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principle) থেকে মৌলিক অধিকারে (Fundamental Right) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার— বিষয়টি সংবিধানের ২১ক ধারাতে স্থান দেওয়া হয়। শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত ধারাতে বলা হয়— রাষ্ট্র উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ৬-১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের সকল শিশুদেরকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে। অতএব এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন দেখা দিল। কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে ২০০৯ সালের আগস্ট মাসের ২৭ তারিখে 'বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯' (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে আইনটি কার্যকর হয়েছে। মোট সাতটি অধ্যায়ে, ৩৮টি ধারাতে (Section) এবং একটি সিডিউলে-এর বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়গুলির মধ্যে প্রারম্ভিক বিষয়, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার, প্রাসঙ্গিক সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকের দায়িত্ব, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের দায়িত্ব, পাঠক্রম এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণকরণ, শিশুদের অধিকারের সুরক্ষা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আইনের ধারা উপধারা নির্দেশ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট তফ্‌শিলে (Schedule) একটি বিদ্যালয়ের নিয়ম এবং মান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। বর্তমান এককটির (Unit) অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার আইনের অন্তর্গত সুযোগসুবিধা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আইন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তিগুলি সম্পর্কে জানব।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

- শিক্ষার অধিকার আইনের (২০০৯) নীতি, ধারা উপধারা এবং সুযোগসুবিধাগুলি (Provisions) সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- শিক্ষার অধিকার আইনটির (২০০৯) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যাবে।
- পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তিগুলি ব্যাখ্যা করা হবে।

৪.২ নীতি, আইনের ধারা এবং সুযোগসুবিধা (Policies, Acts and Provisions)

শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯)-এর পূর্ণ শিরোনাম হল 'শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯। শিরোনামে অন্তর্গত দুটি মূল শব্দগুচ্ছ হল— অবৈতনিক শিক্ষা (Free Education) এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা (Compulsory Education)। অবৈতনিক শিক্ষা বলতে—ছয় থেকে চোদ্দো বছরের প্রত্যেক শিশু এমন মাইনে বা খরচ দিতে বাধ্য থাকবে না যার জন্য সে তার মৌলিক শিক্ষাগ্রহণও সম্পূর্ণ করতে অপারগ হয়ে পড়ে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলতে— ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সের সমস্ত শিশুকে প্রারম্ভিক শিক্ষায় (Elementary Education) অন্তর্ভুক্তিকরণ (Enrolment), ধারণ (Retention) এবং সম্পূর্ণকরণ (Completion)-এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়তা দান করাকে বোঝায়। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনটির (২০০৯) বাস্তবায়নের সংস্থা (Implementing Agency) রূপে রয়েছে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রালয় (Ministry of Human Resource Development)। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রালয়, শিক্ষার অধিকার আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত স্বশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব আরোপ করে—

(ক) জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন (NCPCR)—এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত শিশুদের অধিকার সুরক্ষার কার্যকরভাবে প্রয়োগ।

(খ) জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT)—শিক্ষার জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা প্রস্তুত করা।

(গ) শিক্ষক-শিক্ষার জাতীয় পর্ষদ (NCTE)—শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের রূপরেখা দান করা।

শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ও উপধারাগুলির বিষয়বস্তু অধ্যায় অনুযায়ী এবার আলোচনা করব।

৪.২.১ প্রথম পরিচ্ছেদ

- শিশুর শিক্ষার অধিকার আইনটিকে শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ নাম দেওয়া হয়েছে।
- জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য বাদে ভারতের সর্বত্র এটি প্রযোজ্য।
- সরকারি গেজেট বিজ্ঞাপিত করে যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োগ করবেন, সেইদিন থেকে এই আইন প্রযোজ্য।
- মৌলিক শিক্ষা/প্রারম্ভিক শিক্ষা (Elementary Education) বলতে বোঝাবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি অবধি শিক্ষা।
- শিশুর অর্থ ছয় থেকে চোদ্দো বছরের ছেলে বা মেয়ে।
- ক্যাপিটেশন ফি বলতে বোঝাবে যে-কোনোরকম দান, চাঁদা বা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপিত মাইনের বাইরে কোনো খরচ।
- প্রাসঙ্গিক সরকার (Appropriate Government) বলতে —
    - (ক) কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত, নিয়ন্ত্রিত ও মালিকানার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অথবা বিধানসভাহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের অধীন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বোঝাবে কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government)।
    - (খ) বিধানসভা আছে এমন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, তার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের সরকার।
    - (গ) রাজ্যের বিদ্যালয়ের জন্য রাজ্য সরকার।

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (Local Authority) বলতে বোঝায় — পৌরসভা, জেলাপরিষদ, নগর পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত বা অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ যারা আইন বলে বিদ্যালয় প্রশাসনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা পেয়েছে। বিদ্যালয় (School) বলতে যে-কোনো অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়কে বোঝায় যা প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে এবং যার মধ্যে—

    (১) একটি বিদ্যালয় যা প্রাসঙ্গিক সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর স্থাপিত, মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত।

    (২) একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় যা প্রাসঙ্গিক সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের যাবতীয় বা আংশিক খরচ মেটানোর জন্য সাহায্য বা অনুদান পায়।

    (৩) নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত একটি বিদ্যালয়, এবং

    (৪) একটি বিদ্যালয় যা কোনোরকম সাহায্য বা অনুদান পায় না।

- নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয় (Specified Category) বলতে— প্রাসঙ্গিক সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিপত্রে বিশেষভাবে চিহ্নিত সে সমস্ত বিদ্যালয়কে বোঝাবে, যেমন— কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল বা যেসব স্কুলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

৪.২.২ দ্বিতীয় অধ্যায়/পরিচ্ছেদ

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার

- প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা অবধি ছয় থেকে চোদ্দো বছরের প্রত্যেক শিশু নিজের পাড়ার স্কুলে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার পাবে।
- শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরাও যে-কোনো বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিশুদের মতো সমানভাবে বিনামূল্যে মৌলিক শিক্ষা পাবে।
- ছয় বছরের বেশি বয়সি কোনো শিশু, যে-কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা কিছুদিন পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে, তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণিতেই ভরতি করতে হবে। প্রয়োজনে ওই শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণিতে পড়ার উপযুক্ত করে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যে-কোনো শিশু, যে-কোনো বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার জন্য তার বর্তমান বিদ্যালয়ের কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চাইতে পারে। বিদ্যালয় তাকে সেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য।

৪.২.৩ তৃতীয় অধ্যায়/পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং পিতামাতার কর্তব্য

- ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে ভরতি সুনিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত বিদ্যালয়ে আইন নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং নির্ধারিত মানের পরিকাঠামো থাকবে।
- বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক ভরতিকরণ, নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ করার অধিকার সুনিশ্চিত করা (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)।
- জাতিগত, লিঙ্গগত, গ্রাম, শহর, ধর্মীয়, ধনী-দরিদ্র বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সামাজিক কারণে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না এবং কোনো শিশুকেই তার চাহিদা অনুযায়ী স্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- আইনের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী প্রারম্ভিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রশিক্ষণ ও তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

- বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনা করা।
- মৌলিক শিক্ষার্জনের জন্য শিশুকে প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে ভরতি করা প্রত্যেক পিতামাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য হিসেবে গণ্য হবে।

৪.২.৪ চতুর্থ অধ্যায়/পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব

- বিদ্যালয় পরিবেশ হবে সর্বপ্রকার শিশু সহায়ক, ভীতিহীন, চাপমুক্ত ও আনন্দদায়ক।
- ভরতি হওয়া কোনো শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শ্রেণিতে আটকে রাখা যাবে না বা বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।
- বিদ্যালয় ছুট শিশুদের সারা শিক্ষাবর্ষ জুড়েই ভরতি করা যাবে।
- কোনো বিদ্যালয় বা ব্যক্তি ছাত্রের ভরতির জন্য ক্যাপিটেশান ফি চাইতে পারবে না। ওই শিশু বা তার বাবা-মা বা অভিভাবকের — কোনো বাছাই এ প্রক্রিয়ায় বাধ্য করতে পারবে না।
- বিদ্যালয়ের সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে এবং সেখানে নিরাপদ পানীয় জল, শৌচালয় (বালক ও বালিকাদের পৃথক), খেলার জায়গা এবং গ্রন্থাগারের সুযোগ থাকবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতি থাকবে। এই সমিতিতে নির্বাচিত সদস্যরা থাকবেন এবং সদস্যরা বিদ্যালয়ের উন্নতি পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।
- বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শতকরা ২৫ শতাংশ আসন পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিয়মিত এবং সময়ানুবর্তী হবেন।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গোটা পাঠক্রম সম্পূর্ণ করবেন।
- প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং তার ধারাবাহিক নথি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- শিশুদের উপস্থিতি, শিক্ষান্তর, শিক্ষণ, উন্নতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিকাশ সম্বন্ধে তথ্য অভিভাবকদের সভায় নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন।
- প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা গৃহশিক্ষকতার (Private Tuition) সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

৪.২.৫ পঞ্চম অধ্যায়/পরিচ্ছেদ

পাঠক্রম এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণকরণ

- পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন—
    ১. সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা,
    ২. শিশুর সার্বিক বিকাশ
    ৩. শিশুর জ্ঞান, ক্ষমতা ও মেধার বিকাশ
    ৪. দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ
    ৫. কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা, শিশুকেন্দ্রিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে আবিষ্কার, অন্বেষণ করা

৬. শিক্ষার মাধ্যম হবে (যতটা সম্ভব) শিশুর মাতৃভাষা

৭. শিশুকে ভয়, আতঙ্ক বা উদ্‌বেগমুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করা

৮. শিশুর অর্জিত জ্ঞান এবং তার প্রয়োগের ক্ষমতার সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করা।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিশুকে যেন পর্ষদ পরীক্ষায় বসতে না হয়।
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর প্রত্যেকটি শিশুকে শংসাপত্র (Certificate) দেওয়া হবে।

৪.২.৬ ষষ্ঠ অধ্যায়/পরিচ্ছেদ

শিশুদের অধিকারের সুরক্ষা

শিশু অধিকার রক্ষা আইন, ২০০৫, অনুযায়ী গঠিত জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন অথবা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে—

- শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলির পরীক্ষা ও পুনর্মূল্যায়ন করা এবং সেগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করা।
- শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের বিষয়ে অভিযোগগুলির অনুসন্ধান করা।
- শিক্ষা অধিকার আইনে উল্লিখিত শিশুর অধিকার সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ যে-কোনো ব্যক্তি সেখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁদের বক্তব্য রাখার পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়ে তিন মাসের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবেন।
- কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একটি নোটিস জারি করে যথাক্রমে জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ (National Advisory Council) এবং রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ (State Advisory Council) গঠন করবে। এই পর্ষদগুলির কাজ হবে এই আইনের বিভিন্ন ধারার বাস্তবায়নে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

৪.২.৭ সপ্তম পরিচ্ছেদ (বিবিধ)

- এই আইনের রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রাসঙ্গিক সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পথনির্দেশিকা দেখাবেন। এই আইনের রূপায়ণের জন্য প্রাসঙ্গিক সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- এই আইনের রূপায়ণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারবেন।
- এই আইনের অধীনে প্রত্যেকটি নিয়ম এবং Section ২০ এবং ২৩ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি বিজ্ঞপ্তি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্টের দুটি সভাতেই পেশ করতে হবে।
- রাজ্য সরকারকৃত প্রতিটি নিয়মাবলি বা নোটিফিকেশন রাজ্য বিধানসভাতে যথাশীঘ্র সম্ভব উপস্থাপন করতে হবে।

তফশিল (বিদ্যালয়ের নিয়ম ও মান)

- প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা :

  (ক) ৬০ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য ২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা,

  (খ) ৬১ থেকে ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা,

  (গ) ৯১ থেকে ১২০ জন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা

(ঘ) ১২১ থেকে ১৬০ জন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা

(ঙ) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হলে ৫জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও একজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।

(চ) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০০ জনের বেশি হলে প্রধান শিক্ষক ছাড়াও প্রতি ৪০ জন ছাত্রছাত্রী পিছু একজন করে একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন।

- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা :

(ক) প্রতিটি শ্রেণির জন্য একজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকতে হবে যাতে করে অঙ্ক-বিজ্ঞান, ভাষা এবং সমাজপাঠ (ইতিহাস-ভূগোল), প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।

(খ) প্রতি ৩৫জন ছাত্রছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকবেন।

(গ) বিদ্যালয়ে ১০০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী থাকলে—

- একজন পূর্ণ সময়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন।
- নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক থাকবেন।

(১) শিল্পকলা শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা এবং (৩) কর্মশিক্ষা।

- বিদ্যালয়ভবন (স্কুলবাড়ি)—

(১) সবরকমের আবহাওয়ার উপযোগী

(২) প্রতিটি শ্রেণীর জন্য অন্তত একটি শ্রেণিকক্ষ, এবং অফিস, জিনিসপত্র রাখার জন্য প্রধান শিক্ষকদের ঘর।

(৩) বাধাহীন যাতায়াতের সুবিধা

(৪) ছেলে ও মেয়েদের আলাদা শৌচাগার

(৫) প্রত্যেক শিশুর জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানীয় জল

(৬) বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন আহার ও রান্নাঘর।

(৭) নিরাপত্তার জন্য বিদ্যালয় গৃহকে বেড়া বা পাঁচিল দেওয়া

(৮) বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকতে হবে।

- একটি শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম বিদ্যালয়ের দিন—

(১) প্রথম দিন থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য বছরে ২০০ দিন বিদ্যালয় চলবে

(২) ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বছরে ২২০ দিন বিদ্যালয় চলবে

(৩) প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্তত ৮০০ ঘণ্টা পড়াশোনা চলবে

(৪) ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্তত ১০০০ ঘণ্টা পড়াশোনা হতে হবে

(৫) প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সপ্তাহে অন্তত ৪৫ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে পড়াতে হবে।

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে পাঠাগার (Library) থাকতে হবে যেখানে খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, গল্পের বই এবং অন্যান্য বই থাকবে।
- বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণিতে খেলার সরঞ্জাম থাকবে।

৪.২.৮. অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress)

(ক) শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর পুরো নাম কী এবং কবে থেকে এই আইন কার্যকরী হয়?

____

(খ) শিক্ষার অধিকার আইনে প্রারম্ভিক শিক্ষা (Elementary Education) বলতে কী বলেছে?

____

(গ) এই আইনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কী কী দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে?

____

(ঘ) শিক্ষার অধিকার আইনের মতে বিদ্যালয় কেমন হবে?

____

৪.৩ শিক্ষার অধিকার আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত (Historical Perspective of Right to Education Act)

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ইতিহাস শুরু হয় প্রায় দুশো বছর পূর্বে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১৮৭০

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন গৃহীত হলে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন।

১৮৮২

ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন, হান্টার কমিশন (১৮৮২)-এর কাছে প্রস্তাব আকারে Dadabhai Naoroji এবং Jyotiba Phule বোম্বে প্রেসিডেন্সির পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি রাখেন।

১৮৯৩

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমরেলি তালুকে (Amreli Taluka) বরোদার মহারাজা Sir Sahaji Rao Gaikwad বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা শুরু করেন। টানা আট বছর ধরে অভিজ্ঞতা নিরীক্ষণ করার পর, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র আমরেলি তালুকে এবং অবশেষে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করেন।

১৯১০

১৮ মার্চ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল কৃষ্ণ গোখেল British Imperial Legistative Council-এ, বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার জন্য একটি 'প্রাইভেট মেম্বারস্ বিল' প্রস্তাব করেন, কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়।

১৯১১

১৬ মার্চ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মহামতি গোখেল একই কাউন্সিলে "To make better provision for the extension of elementary education in India" নামাঙ্কিত একটি প্রাইভেট বিল (Private Bill) পেশ করেন। কাউন্সিলে বিলটি দু-দিন ধরে (১৭ এবং ১৮ মার্চ, ১৯১২) আলোচিত হয় এবং অবশেষে মেম্বারদের মধ্যে ভোটাভুটি হয় কিন্তু বিলটির সমর্থনে ভোট কম পড়ে এবং বাতিল হয়।

১৯১৭

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভিথালভাই প্যাটেল (Vithalbhai Patel) Bombay Legislative Council-এ বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন পেশ করেন এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এটি গৃহীত হয়। এটি প্যাটেল অ্যাক্ট (Patel Act) নামে পরিচিত। এটিই ব্রিটিশ সরকারাধীন ভারতে, শিক্ষার অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রথম আইন।

১৯৩৭

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধি সর্বজনীন শিক্ষার দাবি করেন। তিনি এর জন্য ‘নঈ তালিম’ (Nai Talim) নামে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেন। সেইমতো জাকির হোসেন কমিটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বুনিয়াদি শিক্ষার একটি জাতীয় রূপরেখা দান করেন (National Scheme for Basic Education)। এখানে সাত বছরব্যাপী দেশ জুড়ে বাধ্যতামূলক ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা চালু করার পরিকল্পনা নেন। তবে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন প্রদেশগুলোতে চালু হলেও পরে যুদ্ধের কারণে বন্ধ হয়।

১৯৪৪

Sargent Plan, 1944, ৪০ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সি শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা সুপারিশ করে।

১৯৪৮

B. G. Kher, (1948) কমিটি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৬০ সালের মধ্যে সকল শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুপারিশ করে।

১৯৫০

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষের সংবিধান চালু হয়। সংবিধানের ৪৫নং নির্দেশাত্মক নীতির ধারাতে উল্লেখ করা হয়— সংবিধান চালু হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে যতদিন না পর্যন্ত শিশু ১৪ বছরে উপনীত হয় ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। ৪৫নং ধারাতে প্রদত্ত শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যপূরণ করতে ভারত সরকার ব্যর্থ হয়। ভারত সরকার প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উদ্দেশ্যে একের অধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৮৬

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষাকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর কাছে প্রদান করার উদ্দেশ্যে Operation Black Board, Non-Formal Education, Mid-Day Meal Programme, District Primary Education Programme (DPEP) চালু করতে প্রস্তাব দেয়।

১৯৯১

রামমূর্তি কমিটির রিপোর্ট (১৯৯১) শিক্ষার অধিকারকে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত দেওয়ার জন্য সংবিধানের সংশোধন করার প্রস্তাব দেয়।

১৯৯২

১৯৯২ সালে ভারত United Nations Convention on Child Rights (UNCCR)-এর স্বাক্ষরিত সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে সুপ্রিমকোর্ট ‘Mohini Jain versus State of Karnataka Case, 1992’-এর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করে—সংবিধানে—ভারতের প্রত্যেক নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার আছে।

১৯৯৩

সুপ্রিমকোর্ট ১৯৯৩ সালে ‘Unnikrishnan versus State of Andhra Pradesh Case’-এর পরিপ্রেক্ষিতে রায় দেয় এই বলে—এই দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষার মৌলিক অধিকার আছে এবং এই অধিকার ২১নং ধারাতে অন্তর্নিহিত আছে।

২০০২

সুপ্রিমকোর্টের এরূপ রায় দেওয়ার পর থেকে, ভারত সরকার সংবিধান সংশোধনের জন্য একাধিক কমিটি, কনফারেন্স, সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু করে। অবশেষে ২০০২ সালে সংবিধানের ৪৫নং ধারাকে সংশোধন করে (৮৬তম সংশোধন) ২১ক একটি নতুন ধারা সংযোজন করে। ২১ক ধারাটি হল — শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকারটিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) গৃহীত হয় এবং ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সারা দেশে কার্যকরী হয়।

অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress)

(ক) শিক্ষার অধিকার সংবিধানে কত ধারাতে উল্লেখ আছে?

____

(খ) ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গোপলকৃষ্ণ গোখেলের ভূমিকা কী ?

____

(গ) ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনের পূর্বে ৪৫নং ধারাতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যাপারে কী বলা ছিল?

____

(ঘ) শিক্ষার অধিকার আইনের (২০০৯) বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ উল্লেখ করো।

____

৪.৪ শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) কার্যকর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাধিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। যা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯, ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে কার্যকর হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী আমাদের দেশে ৬-১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অনুকূল এবং উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওই আইনের ৩৫(২) ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন মারফত নেওয়া হয়েছে। ওই আইনের ৩৫(২) ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন মারফত ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

ওই প্রজ্ঞাপনগুলির মূল অনুবিধিসমূহ নিম্নরূপ:

ক. স্কুল কর্তৃপক্ষ ভরতির প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে কোনো ধরনের অর্থ সংগ্রহ (ক্যাপিটেশন ফি) করতে পারবেন না অথবা বাছাই (স্ক্রিনিং) পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন না। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নোটিফিকেশন নং ৮৬ এস.এস.ই /ই. এস/এস/১এ-০১/২০০৯ তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

উক্ত আইনের ১৩ ধারায় বলা আছে যে-কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ ভরতির প্রক্রিয়া চলাকালীন যে-কোনো ধরনের ক্যাপিটেশন ফি নিতে পারবেন না এবং এই আইন লঙ্ঘন করলে সংগৃহীত অর্থের দশগুণ পরিমাণ জরিমানা যা সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা প্রথম বারের জন্য এবং পরবর্তীকালে লঙ্ঘন করলে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হতে পারে। আর. টি. ই (RTE) আইন-এর ১৩ ধারাতে ভরতির প্রক্রিয়া চলাকালীন স্কুল কর্তৃপক্ষকে কোনোরকম বাছাই করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। স্কুলের নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা অপেক্ষা ভরতির জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা যদি বেশি হয় তবে লটারির মাধ্যমে শিশুদের ভরতির করতে হবে।

যে-কোনোভাবে এই ধারা লঙ্ঘিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শক অথবা জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং কলকাতায় অবস্থিত স্কুলের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কলকাতা পৌরসংস্থার কমিশনারের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়ের করার ৬০ দিনের মধ্যে বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন এবং তদন্ত সুত্রে পাওয়া তথ্যাদি সুপারিশসহ স্কুল শিক্ষা অধিকর্তার নিকট পাঠাবেন। অধিকর্তা, স্কুল শিক্ষা দপ্তর অভিযুক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুনানির আবেদন মঞ্জুর করবেন এবং তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবের নিকট আবেদন করতে পারেন যিনি ৩০ দিনের মধ্যে দেয় আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

খ. শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট পড়ানোর কার্যকলাপের ওপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা :

নোটিফিকেশন নং ১৮৯-এস ই (ল) / এস / ১এ -০১/০৯-১৪ তারিখ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আর. টি. ই আইন (RTE)-এর ২৮ ধারা অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট পড়ানো সংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। স্কুলের কোনো শিক্ষক যাতে প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট পড়ানো সংক্রান্ত কোনোরকম কার্যকলাপে নিজেদের নিয়োজিত না করেন, এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করা প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষের এটা আশু কর্তব্য। এই ধরনের কার্যকলাপে কোনো শিক্ষক জড়িত থাকলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ. কোনোরকম বেতন, মূল্যাদি বা ব্যয় যা একজন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বা সম্পূর্ণকরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে সেই সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাকরণ : নোটিফিকেশন নং ১৮৭ এস ই (ল) / এস / ১এ -০১ /০৯ তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আর. টি. ই আইন (RTE ACT) -এর ৩(২) ধারা অনুযায়ী কোনো সরকারি স্কুল প্রারম্ভিক (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) পর্যায়ে কোনো শিশুর কাছ থেকে যে-কোনো ধরনের বেতন, মূল্যাদি বা ব্যয় সংগ্রহ করতে পারবেন না। স্বীকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল/রাজ্য সরকার বা যে-কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাহায্য বা অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল প্রারম্ভিক স্তরে একটি শিশুর জন্য সর্বাধিক বছরে ২৪০ টাকা উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে নিতে পারবে। যদি কোনো অভিভাবক এই মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন যে, আর্থিক দুর্বলতা হেতু এই উন্নয়ন মূল্য আদায়ের ফলে তাঁর শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না এবং এ ব্যাপারে ছাড় পাওয়ার জন্য আবেদন করলে যথাযথ অনুসন্ধান করে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদন বিবেচনা করবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে ওই অভিভাবক সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শক বা তাঁর মনোনীত নির্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট আবেদন করবেন যিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ৩০ দিনের মধ্যে বিষয়টির মীমাংসা করবেন। এ বিষয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অবশ্যপালনীয়।

ঘ. সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন স্কুলগুলি আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি এবং অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত শিশুদের ১ম শ্রেণিতে মোট আসনের ২৫% পর্যন্ত ভরতি করবে : নোটিফিকেশন নং ১৯০ -এস ই (ল)/এস/১এ - ০১ /০৯-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

আর. টি. ই আইন (RTE ACT, 2009) ২০০৯-এর ১২ (১) (সি) ধারা অনুযায়ী অনুদানহীন স্কুলগুলি ১ম শ্রেণির মোট আসন সংখ্যার কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি (বি.পি.এল) এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত (তপঃ জাতি/উপজাতি / ও.বি.সি) ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে, যার মধ্যে সহশিক্ষাভুক্ত স্কুলগুলিতে ৫০% আসন ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত শিশু হল সেই-ই যার পিতামাতা যথাযথ কর্তৃক নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নীচে (বি পি এল) অবস্থান করেন। প্রতিটি অনুদানহীন স্কুল প্রতি বছর তাদের ১ম শ্রেণির ভরতির বিজ্ঞপ্তিতে এই ধরনের আসনের কথা অবশ্যই বিজ্ঞাপিত করবে এবং এই ধরনের ভর্তির বিস্তারিত তথ্য প্রতি বছর জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে পাঠাবেন। এই ধরনের ভরতির আবেদন করার সময় পিতামাতা/অভিভাবকগণ তাঁদের প্রাসঙ্গিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা শংসাপত্র জমা দেবেন।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের মধ্যে আসন বণ্টন করতে হবে:

ক্রম নং	শ্রেণি	অনুপাত
(ক)	তফশিলি জাতিভুক্ত শিশু	২২´০০
(খ)	তফশিলি উপজাতিভুক্ত শিশু	০০´০৬
(গ)	অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (ক) শ্রেণিভুক্ত শিশু	১০´০০
(ঘ)	অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (খ) শ্রেণিভুক্ত শিশু	০০´০৭
(ঙ)	সমাজের দুর্বলতর অংশভুক্ত শিশু	০০´৫৫

তথ্যসূত্র : পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন; পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩.২. অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress)

(ক) যে-কোনো স্বীকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত বা অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় প্রারম্ভিক স্তরে কোনো শিশুর কাছ থেকে সর্বাধিক কত টাকা বছরে উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে নিতে পারে?

____

(খ) শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী পদ্ধতিতে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণি এবং অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত শিশুদের মধ্যে প্রারম্ভিক স্তরে ভরতি সময় আসন বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছে?

____

৪.৫ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

এই ইউনিট আলোচনা করার পর আমরা বলতে পারি— শিক্ষার অধিকার হল একটি মৌলিক অধিকার। বিনা ব্যয়ে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনের (২০০৯) তিনটি মুখ্য লক্ষ্য হল— সর্বজনীন ভরতি (Admission), উপস্থিতি (Attendence) এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার সম্পূর্ণতা (Completion of Elementary Education)। আইনটিকে প্রয়োগের বাস্তবায়নের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)-কে RTE Act, 2009-এর সাথে যুক্ত করা হয়। শিক্ষার অধিকার আইনটি প্রাসঙ্গিক সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব কী কী তার একটা পরিষ্কার রূপরেখা দেয়। শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল প্রারম্ভিক শিক্ষার সর্বজনীনতার জন্য। যাই হোক এখন এই আইনবলে সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।

Key Concepts :

- ভারতের সংবিধান
- মৌলিক অধিকার
- অবৈতনিক শিক্ষা
- বাধ্যতামূলক শিক্ষা
- NCERT
- NCTE

৪.৬ অনুশীলনী (Unit-end Exercise) :

(ক) শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯), পাঠক্রম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে কী নির্দেশ দেয়?

(খ) শিক্ষার অধিকার আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(গ) শিক্ষার অধিকার আইনটি শিশুদের কী কী অধিকার উল্লেখ করে?

(ঘ) শিক্ষার অধিকার আইনের আলোকে শিক্ষার গুণগত বিষয়গুলো আলোচনা করো।

(ঙ) শিক্ষার অধিকার আইনটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা আছে?

(চ) শিক্ষার অধিকার আইনের প্রেক্ষিতে শিক্ষকের দায়িত্ব কী কী?

সহায়ক গ্রন্থ

- Gosai, M.R. (2009). The Recent Right to Education and Present State of Primary Education, *University News,* 47(47), 1-6.
- Jakhar, J. S. (2010). Right to Education Act, 2009: Salient Features of Major Problems of Implementation. *University News,* 48(47), 06-12.
- Jha, P. & Parvati, P. (2010). Right to Eduaction Act 2009: Critical Gaps and Challenges, *Economic & Political Weekly,* XLV (13), 20-23.
- Mondal, A. & Mete, J. (2012). Right to Education – An Appraisal. *Kurukshetra – A Journal on Rural Development, Ministry of Rural Development, GOI. 60(11). 11 – 14.*
- Singh, R. (2012). Development of Right to Education in India: A Historical Appraisal. *University News,* 50 (30), 16–25.
- Aggarwl, J. C. & Gupta, S. (2010). *Right to Education and Revitalizing Education.* New Delhi: Shipra Publication.
- Mondal, A. (2014). Equity Issues in the Context of the RTE Act, 2009, *The Primary Teacher Journal*, National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi: Volume XXXIX, Number – 3, pp. 5-14, ISSN: 0970-9282, July 2014.
- Aradhya, N. & Kashyap, A. (2006). *The 'Fundamentals' – Right to Education in India,* Bangalore: Books for Change.
- Juneja, N. (2003). *Constititutional Amendment to make Education a Fundamental Right– Issuse for a Follow-Up Legislation.* New Delhi: NIEPA.
- Mukherji, S. N. (1964). *Education in India – The Unfinished Business.* Bombay: Asia Publishing House.
- Naik, J. P. (1965). Elementary *Education in India – The Unfinished Business.* Bombay: Asia Publishing House.
- Naik, J. P. (1965). *Elementary Education in India – A Promise to Keep.* Bombay: Allied Publishers.
- Rao, D.B. (Ed.).(2011). *Right to Education.* Hyderabad : Neelkamal Publications Pvt. Ltd.
- Sen, J. M. (2010). *History of Elementary Education in India.* New Delhi: Pacific Publication.
- Sharma, M. C. (Ed.).(2013). *Right to Education:Imperative for Progress.* New Delhi: Universal Law Publishing Co.
- MHRD (2009). *The Right of the Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.* New Delhi: Department of Elementary Education and Literacy, MHRD, Government of India.
- Mondal, A. & Mete, J. (2016). *History of Right to Education in India since 1813,* New Delhi: Gyan Books Pvt. Ltd.
- West Bengal Board of Secondary Education (2011). *Module for Building Awareness among Stakeholders of Education about RTE Act 2009,* Kolkata: WBBSE.

অধ্যায় ৫

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি
(ICT IN EDUCATION)

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.৩ একবিংশ শতকের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ (Necessary skills for 21st Century)

৫.৪ শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির অর্থ ও পরিধি (Meaning and Scope of ICT)

৫.৫ শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ঐতিহাসিক বিবর্তন (History and Evolution of ICT)

৫.৬ তথ্যপ্রযুক্তি ও শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া — কম্পিউটার সাক্ষরতা, কম্পিউটার সহায়ক শিখন (ICT and Teaching Learning process – Computer Literacy, Computer Aided Learning)

৫.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

৫.৮ পাঠ এককের অনুশীলনী (Unit end Exercise)

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

একবিংশ শতকের সভ্যতা মানুষের মানসিক, বৌদ্ধিক সমস্ত স্তরেই নতুন নতুন দক্ষতা প্রত্যাশা করে। কারণ এই সময়কালে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। যেমন অভূতপূর্ব জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, তথ্য ও জ্ঞান বিস্ফোরণ ও মানুষের সমানাধিকারের দাবি ও সমাজে তার নীতির প্রয়োগ ইত্যাদি। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতিবিধান করার জন্যই, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী, বিপুল জ্ঞান বিস্ফোরণকে সকলের কাছে, তাদের চাহিদা অনুসারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশলের সহায়তা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই অধ্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশলগুলি কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশলের পরিধি, এর ঐতিহাসিক বিবর্তন ও শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কীভাবে এই কৌশলগুলিকে যুক্ত করা যায় সেই বিষয়টিও এই এককে আলোচিত হয়েছে।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

- একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলির চিহ্নিতকরণ।
- শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশল প্রয়োগের অর্থবোধ।
- শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ।
- শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
- শিক্ষক-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ।
- কম্পিউটার সাক্ষরতা সম্পর্কে ধারণা।
- কম্পিউটার সহায়ক শিখন সম্পর্কিত অনুশীলন।

৫.৩ একবিংশ শতকের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ (Necessary skills for 21st Century)

একবিংশ শতকের শিক্ষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে ডেলার কমিশন (১৯৭৬) এই সময়ের কয়েকটি দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন। যে দ্বন্দ্বের নিরসনে শিক্ষার ভূমিকা অনন্য।

সেগুলি হল—

- আঞ্চলিকতা বনাম বিশ্বজনীনতা (Local Vs Global)
- সার্বজনীনতা বনাম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Universal Vs Individual)
- ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা (Tradition Vs Modernity)
- প্রতিযোগিতা বনাম সকলের সমসুযোগ (Competition Vs Equality of Opportunity)
- জ্ঞানের / তথ্যের ব্যাপক প্রসার বনাম মানবিকতার সংকট (Vast Expansion of Knowledge Vs Humanity)
- আধ্যাত্মিকতা বনাম বস্তুতান্ত্রিকতা (Spiritualism Vs Materialism)

এই দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলায় শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি এমন ধরনের শিক্ষার প্রত্যাশা করে যেখানে বিপুল তথ্য যেমন সহজেই পাওয়া যায় তেমনি, আত্মীকরণেও বিশেষ সহায়ক পদ্ধতি অনুশীলন প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সামর্থ্যগুলি অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয় তা হল—

- অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি চিহ্নিতকরণ।
- এই তথ্যগুলি প্রয়োজনমতো ক্ষেত্রে প্রয়োগ।
- বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পৌঁছে দেওয়া।
- যতদূর সম্ভব কম সময়ে বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌছে দেওয়া।
- একক মানুষ থেকে বিশ্বমানবে রূপান্তরিত হওয়া।
- সাধারণ প্রথাগত শিক্ষার বদলে জীবনব্যাপী শিক্ষায় অংশগ্রহণ করা।
- প্রথাগত শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বদলে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতির প্রয়োগ।

শিক্ষাক্ষেত্রে উপরোক্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে হলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে হবে। এই নতুন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রধানতম সহায়ক হল তথ্য ও প্রযুক্তি কৌশল। তথ্য প্রযুক্তি কৌশল উপযুক্তভাবে শ্রেণিকক্ষে এবং শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে তবেই সমগ্র বিশ্বে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধান সম্ভব।

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি চিহ্নিত করতে একজন ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, ক্ষমতা, প্রবণতা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত শিখন পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা তথ্য প্রযুক্তিমূলক কৌশল ছাড়া সম্ভব নয়।

গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সকলের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশল অপরিহার্য। সাধারণভাবে সমাজের মূলস্রোত থেকে থেকে যারা বিভিন্ন, যেমন— প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী শিক্ষার্থী, ভাষার ব্যবহারে অসমর্থ শিক্ষার্থী (উপজাতি), ভিন্নভাবে সমর্থ শিক্ষার্থী (Differently abled) ইত্যাদি তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা ছাড়া শিক্ষালাভ করতে পারে না। আবার এই সমস্ত মানুষের কাছে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্যও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ সহায়ক।

সেই হিসেবে বলা যায় বর্তমান যুগ হল তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এই যুগে দূরত্বের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে, কারণ বর্তমানে যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো সময় তথ্যের আদান-প্রদান ঘটানো সম্ভব।

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের গতি প্রযুক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রথাগত প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করেছে। রেডিয়ো, টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং নূতন ডিজিটাল প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) শিক্ষাগত পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য শক্তিশালী সক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি ছ-টি M সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ছ-টি M হল— মানুষ (Man)

মেশিন বা যন্ত্র (Machine)

বস্তুসামগ্রী (Materials)

মাধ্যম (Media)

ব্যবস্থাপনা (Management) এবং

পদ্ধতি (Method)

উপরের সমস্ত M-গুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সবগুলি একসঙ্গে বিশেষ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ICT-এর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে শিখন প্রণালী ও সমন্বয় সাধনের অনেকটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী স্ব-শিখন-এ উৎসুক হয় এবং নূতন ও অজানা সক্রিয় পদ্ধতিতে শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষণের শক্তিশালী এজেন্ট হল ICT (Information and Communication Technology)। ICT -এর মাধ্যমে শিক্ষক যেমন দক্ষতার সঙ্গে পড়াতে পারেন তেমনি শিক্ষার্থীও সহজেই শিখতে পারে। এক্ষেত্রে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে শিখনের ক্ষেত্রে ড্রিল, অনুশীলন, টিউটোরিয়াল, ব্যক্তিগত শিখন পদ্ধতি, শিক্ষামূলক কার্যক্রম,পরীক্ষা, পরিচিতি প্রক্রিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে Telecommunication, Teleconference, Internet ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে।

২১ শতকের দক্ষতা (21st Century Skill)

২১ শতকের দক্ষতা হিসাবে কতকগুলি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, নীচে সেগুলি বর্ণনা করা হল—

শিক্ষা ও উদ্ভাবন দক্ষতা

১. সৃজনশীল এবং উদ্ভাবন—

এই দক্ষতা—

- কাজে মৌলিকতা এবং উদ্ভাবনের প্রদর্শক
- উন্নয়ন বাস্তবায়ন এবং যোগাযোগে অন্যদের নতুন ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে।
- নতুন নতুন বৈচিত্র্যময় এবং মুক্ত দৃষ্টিকোণ প্রদান করবে।
- সৃষ্টিশীল ধারণা তৈরি করে তার বাস্তব রূপায়ণ করা।

২. **জটিল চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান—**

এই দক্ষতা

- যুক্তিগ্রাহ্য কথা বুঝতে সাহায্য করবে।
- পছন্দমূলক অথচ জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।
- সিস্টেমের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংযোগ রক্ষায় সহায়তা করবে।
- উল্লেখযোগ্য প্রশ্নগুলি শনাক্তকরণ এবং তার সমাধানে সহায়তা করবে।
- কারিগরি বিশ্লেষণ এবং তার সমাধানে সহায়তা করবে।
- তথ্য সংশ্লেষিত সমস্যা এবং তার উত্তর প্রদানে সাহায্য করবে।

৩. **যোগাযোগ এবং সহযোগিতা—**

এই দক্ষতা—

- বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তা এবং ধারণা পরিষ্কারভাবে কার্যকর করতে বা শিখতে সহায়তা করবে।
- বিভিন্ন দলের সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করবে।
- নমনীয়তা এবং সম্মতি সহকারে আপোসে একটি সাধারণ লক্ষ্য স্থির করবে।

তথ্য, মিডিয়া ও প্রযুক্তি দক্ষতা :

১. **সাক্ষরতার তথ্য—**

এই দক্ষতা—

- তথ্য প্রদানের দক্ষতা এবং কার্যকরীভাবে তার ব্যবহার করতে সাহায্য করে।
- নৈতিক আইনি বিষয়ে মৌলিকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- কোনো ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা ব্যাখ্যা করে, মিডিয়া তা কীভাবে প্রভাবিত করে তা পরীক্ষা করে।

২. **মিডিয়া—**

এই দক্ষতা—

- বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলি ব্যবহার করে মিডিয়া কীভাবে বার্তা নির্মাণ করে তা বুঝতে সাহায্য করে।

৩. **ICT (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সহায়তা—**

এই দক্ষতা—

- ডিজিটাল প্রযুক্তি, যোগাযোগ সরঞ্জাম এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
- গবেষণা সংগঠিত করার জন্য এবং ফলাফল নির্ণয় করার জন্য প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেব ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

৪. **প্রকল্পভিত্তিক পন্থা—**

এই দক্ষতা—

- বিভিন্ন সংস্থা তার শিক্ষামূলক প্রকল্প তৈরি করে শিক্ষাদানের দক্ষতা প্রসারিত করতে পারে। যেমন—(Intel Corporation.)

- **জীবন ও কর্মজীবন দক্ষতা :**

১. নমনীয়তা ও অভিযোজন—

এই দক্ষতা—

- বৈচিত্র্যময় ভূমিকা, দায়িত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে।
- অস্পষ্টতা ও পরিবর্তন অগ্রাধিকারে এটি কার্যকরভাবে কাজ করে।

২. উদ্যোগ এবং স্ব-দিকনির্দেশনা—

এই দক্ষতা—

- নিজে বোঝার এবং শেখার চাহিদা পর্যবেক্ষণ করে।
- অন্বেষণ করতে পাঠক্রম এবং মৌলিক প্রভুত্ব অতিক্রমণ করে।
- প্রয়োজনের অগ্রাধিকার এবং সরাসরি তদারকি ছাড়া কাজ সম্পন্ন করে।
- সময়কে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং কাজের চাপ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।
- শেখার অঙ্গীকার প্রদর্শনের মতো এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার নির্দেশ দেয়।

- **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা :**

এই দক্ষতা —

- অন্যদের দিয়ে উপযুক্ত ও লাভজনকভাবে কাজ আদায় করতে সাহায্য করে।
- ক্ষমতা প্রদর্শন ও নৈতিক আচরণ নির্ধারণ করে।
- মনের মধ্যে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও দায়িত্ব বুঝতে সাহায্য করে।

আইসিটি (ICT) তিনটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি একটি সম্মিলিত প্রয়াস— তথ্য (Information), যোগাযোগ স্থাপন (Communication) এবং প্রযুক্তি (Technology)। অন্যভাবে বলা যায়, ICT হল তথ্যপ্রযুক্তি জড়িত কার্যক্রম যা তথ্য উপস্থাপন, কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী ইতিবাচক ফলাফল (আউটপুট) প্রদানে সমর্থ হয়। শিক্ষাব্যবস্থায়, ICT দুটি স্তরের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এগুলি হল সলিউশন উপাদান এবং সাপোর্ট সিস্টেম। সলিউশন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি হল— প্রযুক্তি (Technology), কানেক্টিভিটি (Connectivity), স্থানীয়করণ ডিজিটাল কানেক্ট এবং উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি এবং পেশাদারি উন্নয়ন। অন্যদিকে, সাপোর্ট সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি হল নীতি, কৌশল ও সাফল্যের মান এবং মূল্যায়ন।

যেহেতু আঞ্চলিকতা ও বিশ্বজনীনতার সংযোগ সম্ভব একমাত্র তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমেই, তাই আঞ্চলিক মানুষ যখন বৃহত্তর সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন আঞ্চলিক সমস্যাটি বিশ্ব সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। একক মানুষ বিশ্বমানব হয়ে ওঠে।

৫.৩.১. অগ্রগতি যাচাই (Check your Progress)

(ক) ডেলার কমিশন একবিংশ শতকে যে দ্বন্দ্বগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি কী কী?

(খ) দ্বন্দ্বের মোকাবিলায় শিক্ষা কী ভূমিকা পালন করে বলে আপনার মনে হয়?

(গ) ২১ শতকের দক্ষতা বলতে কী বোঝেন?

(ঘ) ২১ শতকের দক্ষতাগুলি বর্ণনা করুন।

- **ভেবে দেখুন—**

  শিক্ষক হিসেবে আপনি কোন্ নতুন দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী হবেন এবং কেন?

৫.৪ শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির অর্থ ও পরিধি (Meaning and scope of ICT in Education)

৫.৪.১ ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলতে কী বোঝায়? (What is ICT?)

একবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয় শিক্ষায় বিশেষভাবে বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতার বিকাশে ও দক্ষতা অর্জনে ICT-র ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য ICT-এর প্রয়োগ মানে কেবলমাত্র কম্পিউটার, ট্যাব, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সহযোগে যান্ত্রিক ব্যবহার নয় বরং শিক্ষণে পেডাগগির অনুশীলনে এমন এক ধারা প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নতুন জ্ঞানের বিকাশে এবং বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগসাধনে ICT-এর মতো সম্ভাবনাময় শক্তিশালী মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে।

UNESCO (১৯৯৯) এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী Information and Communication Technology (ICT) is a diverse set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, and manage information. অর্থাৎ ICT হল অনেকগুলি প্রযুক্তিগত সম্পদের সমন্বিত প্রয়োগ যা সংযোগ স্থাপন, জ্ঞান নির্মাণ, উদ্ভাবিত জ্ঞানের সংরক্ষণ, ক্রম-প্রসারণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করে। তথ্য উদ্ভাবন ও তথ্যের বিনিময় যে-কোনো শিখন প্রক্রিয়ার এটি প্রধান অংশ। পাশাপাশি প্রথাগত ও অ-প্রথাগত শিক্ষায় ICT-ব্যবহারের সফলতার দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

৫.৪.২ শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি পরিধি (Scope of ICT in Education)

শিক্ষায় ICT-র ভূমিকা কী? এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে বুনিয়াদি শিক্ষায় ভারতের মতো দ্রুত বিকাশমান দেশে সকল শিশুর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ, তাদের শিক্ষার সমসুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান এবং শিখনের গুণমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ICT-এর ব্যবহার ছাড়া বিকল্প পৌথ নেই।

ভারতবর্ষ দেশ ও জাতি হিসাবে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর লক্ষ্য পূরণে সকলকে বুনিয়াদি শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতে সমগ্র শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর মধ্যে অর্ধেকেরই বয়স ১৫ বছরের কম। এই বিপুল অংশের শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে শিক্ষায় ICT প্রয়োগ ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই।

শিক্ষায় ICT ব্যবহারের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপে সংক্ষেপিত করা যায়।

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিখন (Individualization of learning)

শিক্ষার্থী যেমন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে শিখতে পারে, তেমন একজন একক শিক্ষার্থী হিসাবেও ICT-এর মিডিয়ামকে ব্যবহার করতে পারে, যা শিক্ষার্থীকে শিখন বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বুঝতে সহায়তা করে।

(খ) মিথস্ক্রিয়তা (Interactivity)

শিক্ষার্থী যে প্রক্রিয়ায় শিখন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, প্রয়োজনে নিজস্ব স্তর ও চাহিদা অনুযায়ী কোনো একটি বিষয়ের অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় অভিমুখে যাওয়ার সুযোগ থাকে এবং পূর্ব জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গা থেকে শিখন শুরু হতে পারে অথচ যার পর্যায়ক্রম সর্বদা বজায় থাকবে।

(গ) স্বল্প ব্যয় (Low Cost) : একমাত্র (ICT) ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় সব চাইতে কম হতে পারে।

(ঘ) বাহ্যিক দূরত্ব ও দুর্যোগ অতিক্রম (Mitigation of Distance and Climate Related Problem) : যে-কোনো শিক্ষার্থী যে-কোনো দূরত্বে থেকেই শিখতে পারে এবং ঝড়, বৃষ্টিপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্যাগুলিও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

(ঙ) **বহু শিক্ষণ কার্যসম্পাদন (Multiple Teaching Functions) :** উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ICT-কে ব্যবহার করতে পারলে তা যেমন শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে, সমন্বিত বিষয়ে তথ্য আহরণ ও শিখনে সাহায্য করে, তেমনি শিখন বিষয়ে ক্রমাগত অনুশীলনেরও সুযোগ থাকে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট শিখন দুর্বলতাগুলিও চিহ্নিত করা যায়।

(চ) **সর্বজনীন গুণমান (Uniform Quality) :** নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা শিখন উপাদানগুলি যখন শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছায় তখন তা ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রামের সীমারেখাকে অতিক্রম করে।

নিম্নে ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচলিত ICT-র তালিকা দেওয়া হল যেগুলিকে মূলত তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে Synchronous and asynchronous এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। Synchronous মাধ্যমে বলতে বোঝায় যেখানে সকল শিক্ষার্থীকে একইস্থানে বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিন্তু একই সময়ে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যদিকে Asynchronous বলতে বোঝায় যেখানে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন সময়ে থাকলেও শিখনে কোনো অসুবিধা হয় না।

অগ্রগতি যাচাই (Check your Progress)

(ক) মিথস্ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

(খ) ICT কীভাবে বহুশিক্ষণ কার্যসম্পাদনে (Multiple Teaching Function) সহায়তা করে?

- **ভেবে দেখুন**

আপনার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ICT ব্যবহারের কোন্ পদ্ধতিটি আপনি প্রয়োগ করবেন?

৫.৪.৩ তথ্য প্রযুক্তি কৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের ইতিহাস ও বিবর্তন :

মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য সংগ্রহ মানবসভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। যন্ত্রপাতির বদলে সে সময়ে মৌখিক স্তরের যোগাযোগই প্রধান বলে বিবেচিত হত। ধীরে ধীরে কালি, কলম, ছাপাখানার মাধ্যমে এই যোগাযোগ পদ্ধতি জটিলতর ও বিস্তারিত হতে লাগল। নীচে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনার উল্লেখ করা হল যেগুলি তথ্য প্রযুক্তি কৌশল হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—

- ফোটোগ্রাফি (1849)
- ফোটোস্ট্যাট (1900)
- জেরগ্রাসি (1938)
- মাইক্রোগ্রাফি (1940)
- লেসার টেকনোলজি (1960)
- কম্পিউটার ও তার ক্রমোন্নতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার (১৯৬০ থেকে বর্তমান)

উপরের তালিকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যন্ত্র ও কৌশল উভয়ের জটিলতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির উন্নতিকরণ তথ্য প্রযুক্তি কৌশলকে ১৯৬০ সালের পর থেকেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এসময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটায় উপগ্রহ মাধ্যম। রাশিয়া ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় যা পরবর্তীকালে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ধারা বদল করে দেয়। এ ছাড়া টেলিভিশনও বিংশ শতকের অবদান।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ-এর আদি ক্ষেত্র হল— (ক) তথ্য সংগ্রহ, (খ) তথ্য সংরক্ষণ, (গ) পুনরুৎথাপন, (ঘ) আদানপ্রদান— ইত্যাদি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বিজ্ঞানের নানা তথ্য আদান-প্রদানে এই পদ্ধতির চর্চা গুরুত্ব লাভ করে। আমেরিকায় ১৯৫০ সালে প্রথম তথ্যবিজ্ঞান (Information Science) নামে বিষয়টি প্রচলিত হয়। যেখানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করেছে। তথ্য বিজ্ঞান মূলত যে কাজগুলি করত তা হল (ক) বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে সুবিন্যস্ত উপায়ে সঞ্চালনার জন্য সূচনা, সারাংশ, অনুবাদ প্রভৃতি কলমে তথ্যবিজ্ঞান প্রয়োগ হত।

বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে সুলভে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল এর পরবর্তী পদক্ষেপ।

প্রথম দিকে তথ্যবিজ্ঞান তথ্যসঞ্চালন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হলেও ১৯৬০-এর পরবর্তী পর্যায়ে এর ব্যবহারের ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তারিত হয়। কৃষিকার্য ও শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যবহার দ্রুত বিস্তারিত হয়। এই দুই ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য দ্রুত তথ্য বিজ্ঞান নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এই প্রসার প্রায় বিপ্লবের আকার নেয়। বিজ্ঞান, শিল্প-র পরিধি ছাড়িয়ে এর প্রভাব ক্রমাগত বিস্তারিত হতে থাকে। নব্বই-এর দশকের পর থেকে ব্যাংক, শিক্ষা, চিকিৎসাক্ষেত্র, ওষুধ, বিভিন্ন কোম্পানি ব্যবস্থাপনা, সরকারি অফিস প্রভৃতি সবক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রয়োগ হতে থাকে। আমরা নতুন নতুন ক্ষেত্রে যেমন তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞান কৌশল প্রয়োগ করছি তেমনি সাবেকি মাধ্যমগুলির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এই তথ্য প্রযুক্তি কৌশল।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি (ক) সাবেকি পদ্ধতি ও (খ) আধুনিক পদ্ধতি।

(ক) সাবেকি পদ্ধতির তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ— ছাপানো বই, খবরের কাগজ, পত্রিকা, বিভিন্ন লিখিত বিষয় যা মূলত গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

ছবি, চার্ট, ম্যাপ, পোস্টার প্রভৃতি ছবি-মাধ্যম, ত্রিমাত্রিক বিভিন্ন সহায়ক উপাদান যেমন — খেলনা, পুতুল মডেল প্রভৃতি। এ ছাড়া রয়েছে দর্শন-শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রাদি যেমন— রেডিয়ো, টেলিভিশন, স্লাইড, প্রোজেক্টর, টেপরেকর্ডার, ছায়াছবি প্রভৃতি।

(খ) অত্যাধুনিক পদ্ধতির তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যম— অত্যাধুনিক পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ মারফত যোগাযোগ। বর্তমানে এই কৌশল সফট্‌ওয়্যার এবং হার্ডওয়ার উভয়কে সংযুক্ত করে। যেমন— ডিজিটাল, ভিডিয়ো কনফারেন্স।

মাল্টিমিডিয়া, পারসোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও নোটপ্যাড মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, সি.ডি রম (CD ROM) এবং DVD, ডিজিটাল লাইব্রেরী, ইন্টারনেট, হাইপার মিডিয়া টেক্সট, ভিডিয়ো এবং অডিয়ো কনফারেনিসং, ইন্টারনেট, হাইপার মিডিয়া, হাইপার টেক্সট প্রভৃতি। এখন শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষ (Virtual Classroom) এর ধারণা এসেছে।

৫.৫ শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি কৌশল প্রয়োগের বিবর্তন

সাধারণভাবে তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কার্যকরী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি এই বিবর্তন চোখে পড়ে। বিংশ শতকের আশি বা নব্বই দশকের প্রথম দিকে নাট্যবই, ছবি, মডেল, চার্ট বিদ্যালয়ের প্রধানতম তথ্য আদানপ্রদানকারী পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হত। এছাড়া টেলিভিশন, সিনেমা অ্যানিমেশন প্রভৃতি কখনো কখনো প্রয়োগ করা হত, কিন্তু এরপরই চিত্রটি দ্রুত বদল হল। ওই শতকের শেষ কয়েকটি বছর এবং বর্তমানে একবিংশ শতকে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু শহরাঞ্চল বা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি ব্যবহার চালু ছিল তা ধীরে ধীরে সর্বব্যাপী রূপ ধারণ করল কম্পিউটারের মাধ্যমে। বর্তমানে সরকার পোষিত সব বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এসেছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়া সঞ্চলনায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি অনেক আগেই কম্পিউটার-এর সহায়তা নেওয়া তথা বিদ্যার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল, বর্তমানে সরকারি নীতি অনুসারে কম্পিউটার সাক্ষরতা দান বিদ্যালয়ের একটি অবশ্য কর্তব্য। এর ফলে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষ তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার ধারা ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো নানাধরনের তথ্য নিয়ে তাদের নিজেদের পাঠ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য যুক্ত করতে পারে। তাদের কৌতূহল মেটানো নতুন জ্ঞান অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে এটি সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের পাঠের গতি অনুসারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে। এছাড়া জ্ঞানের গতি মুক্ত থাকার জন্য তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়।

শিক্ষকরা তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলের সাহায্যে দুভাবে উপকৃত হন। (১) → শিক্ষাপদ্ধতিগুলি এর সহায়তায় পূর্ণ রূপ লাভ করে। যে-কোনো বিষয়ের বোধক্ষমতার উন্নয়নে এর বিকল্প নেই। (২) → দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ লাভ। তাঁরা নিজেদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। OER (Open Educational Resource) বা শিক্ষক-শিক্ষণের মুক্ত সম্পদ শিক্ষক -প্রশিক্ষণের আধুনিকতম সংযোজন। যার সাহায্যে শিক্ষকরা যেমন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন, একই সঙ্গে পদ্ধতিবিজ্ঞানের নানা সূত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তথ্য প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া এই সম্পদ ব্যবহার সম্ভব নয়। সুতরাং আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বিবর্তনে এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং-এর জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন কারণ সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসের জন্য এর প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ ও সেই অনুসারে সহায়তা প্রদানে এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে তথ্যভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন কৌশল ও যন্ত্রাদির প্রয়োজনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশলের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আধুনিক শিক্ষাজগৎ যা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় তা অনেকাংশে তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলের সাহায্যে দূর করা যায়। আবার যে সুযোগ বা সম্ভাবনার অধিকারি তাও তথ্য প্রযুক্তিকৌশল দ্বারা বিস্তার করা যায়।

নীচে চিত্রাকারে সাবেকি ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলের তুলনা করা হল—

৫.৫.১ অগ্রগতি যাচাই করুন :

(ক) তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলের আদিমতম রূপটি কী?

(খ) শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলের বিবর্তন কীভাবে হয়েছে?

ভেবে দেখুন :

আপনার ছোটোবেলা (স্কুলজীবন) থেকে এখন পর্যন্ত কোন্ কোন্ তথ্যপ্রযুক্তি কৌশল আপনি প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছেন? সেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লাগতে পারে?

৫.৬ শিখন-শিক্ষণ পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তিমূলক কৌশলের প্রয়োগ (Application of ICT Teaching Learning Process)

মানসী উপাধ্যায় কলকাতা শহরের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, তিনি বিজ্ঞানের ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সম্পর্কে পাঠ দিচ্ছিলেন, কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের আশেপাশে সব শ্রেণির উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় না, তাই স্কুলের বাগানে গিয়েও সবরকমের গাছ দেখাতে না পেরে উনি স্থির করলেন এই সম্পর্কিত ভিডিয়ো এনে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। পরে ভিডিয়ো থেকে শুধু উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগই নয়, উদ্ভিদগুলি কোন্ কোন্ অঞ্চলে কোন্‌টি পাওয়া যায় তার পরিচয় পাওয়া গেল, অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীরা শুধু যে বিজ্ঞানের বিষয়টি দেখতে পেল তাই নয় ভূগোল সম্পর্কেও তাদের ধারণা স্পষ্ট হল। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করল।

ওপরের মানসীর মতো অভিজ্ঞতা জীবনে অনেকেরই হয়েছে। শিক্ষণ-শিখনে এরকম নানা ক্ষেত্রে সত্যিকারে বলতে কী সকলক্ষেত্রে ICT ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তবে শিক্ষক-শিখনে অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি বাদ দিয়ে শিখনে I.C.T-র সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই উপএককে পাঠক্রমে ICT ব্যবহারের যে পেডাগগি অনুশীলন তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৫.৬.১. ICT-র পেডাগগির অনুশীলনে শিক্ষকদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা :

বিদ্যালয় শিক্ষায় ICT প্রয়োগের সুযোগ ও সফলতা একান্তভাবে নির্ভর করে থাকে শিক্ষকদের ধারণা, জ্ঞান, দক্ষতা অর্থাৎ সামগ্রিক যোগ্যতার উপর। UNESCO (2014)– 'The Education for All Global Monitoring Report'-এ উল্লেখ করেছে An Education System is only as good as its teachers. UNESCO (2009) শিক্ষকদের ICT-র জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের জন্য যে দক্ষতাগুলি নির্দেশ করেছে তা নিম্নরূপ।

শিক্ষার ক্ষেত্র	জ্ঞান আহরণের পর্যায়		
শিক্ষায় (ICT)-র উপযোগিতা	প্রযুক্তি সাক্ষরতা	গভীর জ্ঞান আহরণ	জ্ঞান সৃষ্টি
সম্পর্কে ধারণা	নীতি সম্পর্কে সচেতনতা	নীতিগুলিকে উপলব্ধি করা	নীতি উদ্ভাবন
পাঠক্রম ও মূল্যায়ন	ভিত্তিগত জ্ঞান	প্রয়োগমূলক জ্ঞান	জ্ঞান নির্ভর সমাজের দক্ষতা
পেডাগগি	প্রযুক্তি সংযুক্তিকরণ	জটিল সমস্যা সমাধানের ধারণা	স্ব-ব্যবস্থাপনা।
ICT	প্রধান প্রযুক্তিসমূহ	জটিল প্রযুক্তিসমূহ	প্রযুক্তির ব্যবহার উপযোগী পরিবর্তন
সংগঠন ও প্রশাসন	শ্রেণিকক্ষের মান	সক্রিয় গোষ্ঠী গঠন	শিখনের সংগঠন
শিক্ষকের বৃত্তিগত শিখন	ডিজিটাল সাক্ষরতা	ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনা	শিক্ষক একজন আদর্শ শিক্ষার্থী

ঠিক যে পদ্ধতিতে কোনো একটি বিষয়ের উপাদানগুলি ICT-এর সঙ্গে সমন্বয় করে নির্দেশনায় রূপান্তরিত হয় তা Changain, Shuohai (2011)-এর মডেল উপস্থাপিত করা যায়।

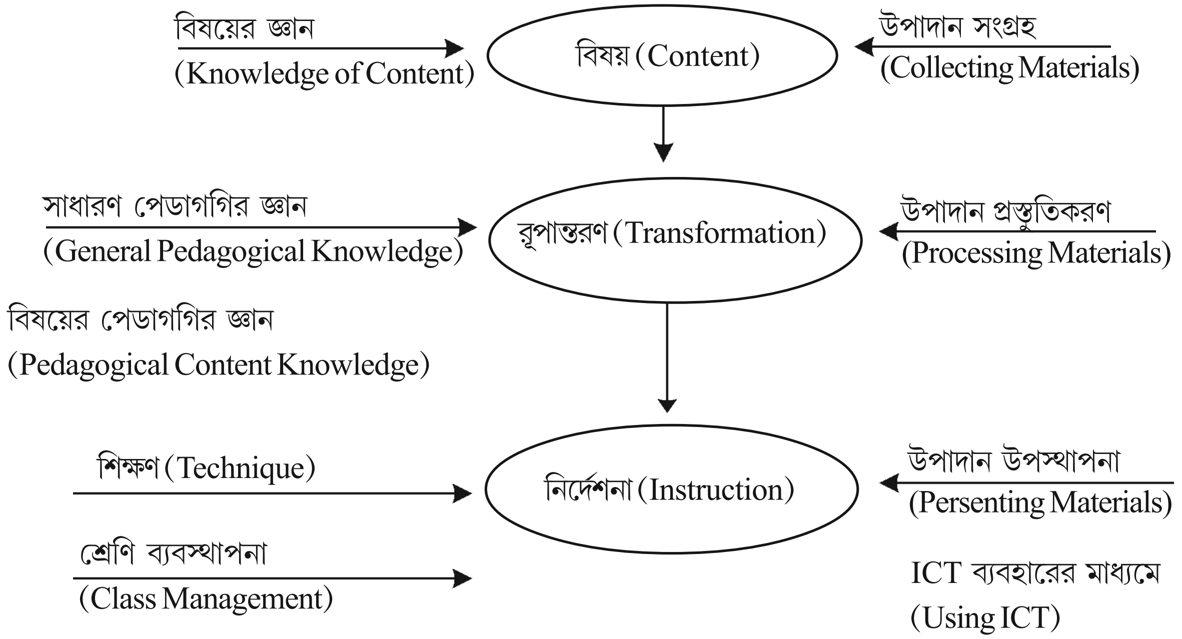

বস্তুত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ICT ব্যবহারের পেডাগগিক কৌশল নির্ণয়ের আগে একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, এখনকার শিক্ষার্থীরা ভীষণভাবে প্রযুক্তির সাথে পরিচিত এবং কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রয়োগের দক্ষতা শিক্ষকদের থেকেও বেশি। তাই যে কোনো শ্রেণি শিক্ষার্থীদের শিখনে ICT সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করে নেওয়া প্রয়োজন।

শ্রেণিকক্ষের শিখনে ICT-এর প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষকদের এর জন্য আগে থেকেই উপযুক্ত পরিকল্পনা, পেডাগগিক কৌশল নির্ধারণ, প্রয়োগ, মূল্যায়ন এবং ধারাবাহিক উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে ICT-এর উপাদানের থেকে পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা নির্মাণে (Concept Formation) পেডাগগিক কৌশল গুরুত্বপূর্ণ।

ICT কে উপযুক্ত পেডাগগিক কৌশলে শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োগ করলে তা সর্বদাই শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনের সহায়ক হয় এবং তারা সহজে শিখতে পারে। শিক্ষাবিদ James Kulik (1994) অন্তত ৫০০ গবেষণা পত্রের যেটা অ্যানালিসিস করে দেখিয়েছেন—

- শিক্ষার্থীরা তখনই বেশি শেখে যখন তাদের কম্পিউটার নির্ভর নির্দেশনা (Computer Based Instruction—CBI) দেওয়া হয়।
- শিক্ষার্থীরা অনেক কম সময়ে শিখতে পারে, কম্পিউটার সহযোগে নির্দেশনায়।
- শিক্ষার্থীরা তাদের সেই শ্রেণিশিক্ষণগুলি বেশি পছন্দ করে যখন শিখনে তারা ICT-এর সাহায্য পায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে তখনই ICT সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে যখন তারা এই সহায়তা পেয়ে বিদ্যালয়ে এসে থাকে।

তবে এ কথাও সত্য, শিখনে সর্বক্ষেত্রে সব বিষয়ই কম্পিউটার সহযোগী ভূমিকা পালন নাও করতে পারে।

গবেষণা থেকে দেখতে পাওয়া যায় কার্যকরী ICT-এর প্রয়োগ তখনই সম্ভব যখন শিক্ষক এবং ব্যবহৃত Software মিলিতভাবে ICT-কে ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও ধারণা গঠনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ICT-এর মাধ্যমে উপযুক্ত সক্রিয়তা সংগঠিত করতে পারলে শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে শিখনে উদ্দীপিত হয়।

পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুর শিখনে শিক্ষকেরা যে ধরনের পেডাগগিক কৌশলগুলি অনুশীলনে দায়বদ্ধ হবেন—

(i) পাঠ্য বিষয়ের ধারণা, পদ্ধতি এবং ICT-এর ব্যবহারযোগ্যতার সম্ভাবনা ও সম্পর্ক নির্ণয়।

(ii) শিক্ষকদের বিষয়গত জ্ঞানের গভীরতার মাধ্যমে উপযুক্ত ICT উপকরণ নির্বাচন যাতে শিক্ষণ লক্ষ্যগুলি অর্জিত হতে পারে।

(iii) শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। ICT-গুলি কীভাবে শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে পারে এবং বিষয়গত জ্ঞানের গভীরতা বাড়াতে পারে।

(iv) ICT-এর বিভিন্ন উপাদানগুলিকে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে হবে।

(v) যেখানে যেখানে ICT ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়গত জ্ঞান উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীর ধারণা পঠন প্রক্রিয়াটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তার প্রশংসা করতে শিখতে হবে।

(vi) পাঠ্যবিষয়ে ICT ব্যবহারে পাঠপরিকল্পনা নিরূপণ এমনভাবে করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের ধারণাগঠন, বহুমুখী চিন্তা এবং চিন্তনের প্রতিফলনে সাহায্য করে।

(vii) একক শিক্ষার্থী, একজোড়া শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের একটি দলে ICT সহযোগে শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা রচনা, সংগঠিত করা ও তা প্রয়োগ করতে শিখতে হবে।

এখানে শিক্ষাবিদ Lawillarel (2000)-এর প্রদত্ত ICT পেডাগগির আদান-প্রদানমূলক পাঠক্রম (Conversational Framework) উপস্থিত করা যায়, যে-কোনো স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য এটি প্রয়োগযোগ্য। এই পেডাগগিক্যাল কৌশলে শিক্ষক প্রাথমিক নীতি ও কৌশলগুলি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতার উপর মন্তব্য করেন এবং পর্যায়ক্রমিক শিখন অনুশীলনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদান-প্রদান চলতে থাকে।

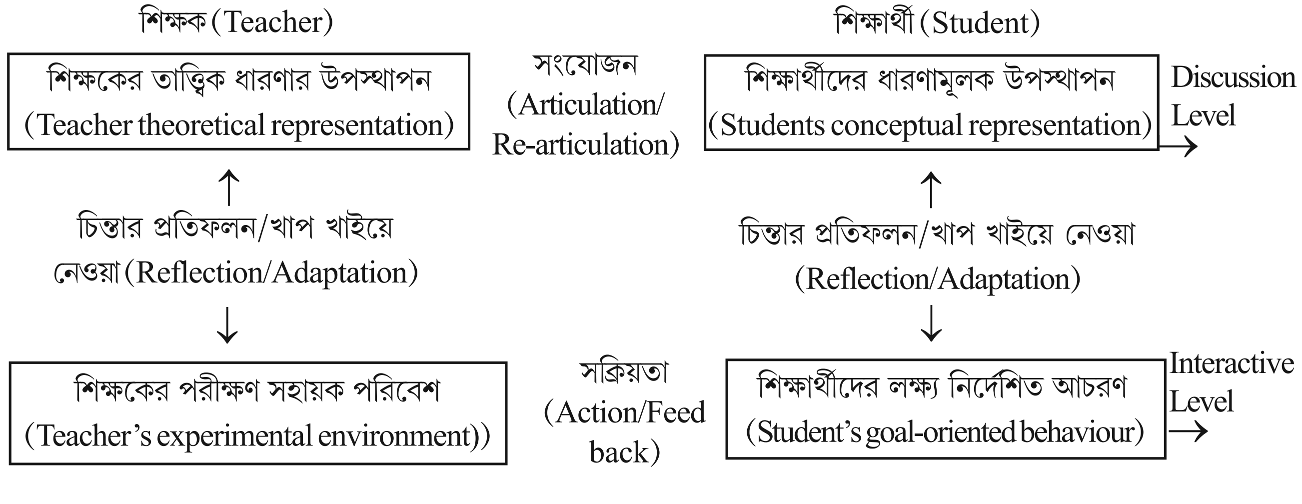

সূত্র : Laurillaard's Conversational framework for ICT (2000)

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট জ্ঞাননির্ভর যে সমাজের (Knowledge Society) দিকে আমরা এসেছি, সেই পরিবেশে ICT সমন্বিত শিখন প্রথাগত পেডাগগিক কৌশলের থেকে পৃথক। প্রথাগত পেডাগগি থেকে ICT সমন্বিত শিখন কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা শিক্ষাবিদ Vogt (2003)-এর মডেল অনুযায়ী করা যেতে পারে।

ক্ষেত্র/প্রেক্ষাপট	প্রচলিত পেডাগগি	ICT নির্ভর বিকাশমান পেডাগগি
সক্রিয় শিখন	• সক্রিয়তা শিক্ষক নির্দেশিত • সমগ্র শ্রেণির জন্য নির্দেশনা • সক্রিয়তায় স্বল্প বৈচিত্র্য/বৈচিত্র্যহীন • শিখনের গতি কর্মসূচির দ্বারা নির্ধারিত।	• সক্রিয়তা শিক্ষার্থীর দ্বারা নির্ধারিত হয়। • ছোটো শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর জন্য নির্দেশনা। • ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা • শিখনের গতি শিক্ষার্থীর দ্বারা নির্ধারিত হয়।
সহযোগিতা	• একক • সমপ্রকৃতির গোষ্ঠী • শিক্ষার্থী কেবল নিজেকেই সাহায্য করার চেষ্টা করে।	• দলগত শিক্ষণ • বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠী • পরস্পর পরস্পরকে শিখনে সাহায্য করে।
সৃষ্টিশীলতা	• মুখস্থ নির্ভর পুনরুৎপাদনমূলক শিখন • সমস্যা সমাধানে কেবলমাত্র জ্ঞাত প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগের চেষ্টা করে।	• সৃষ্টিশীল শিখন। • সমস্যা সমাধানে নূতন পথে উদ্ভাবন।
সমন্বয়ের প্রবণতা	• তত্ত্ব অনুশীলনের সম্পর্কহীনতা • ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ভর • পাঠ্য বিষয়ে নির্ভর • ব্যক্তিশিক্ষক নির্ভর।	• তত্ত্ব প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয়। • বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয়। • পরিকল্পনাভিত্তিক। • শিক্ষকগোষ্ঠীর মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
মূল্যায়ন	প্রথাগত মূল্যায়ন	জ্ঞান নির্ভর সমাজের বিকাশ মান মূল্যায়নের ধারণা।

বিদ্যালয় শিক্ষায় ICT সমন্বিত পেডাগগি প্রয়োগের সামগ্রিক কৌশলগুলি শিক্ষাবিদ Shulman's (2000)-এর মডেল অনুযায়ী নিম্নরূপ সংক্ষেপিত করা যায়।

- **বোধপরীক্ষণ (Comprehension) :** পাঠ্য বিষয়ের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণ।
- **রূপান্তরণ (Transformation) :** শিখন বিষয়গুলিকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যাতে তা শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হয়।
- **প্রস্তুতিকরণ (Preparation) :** পাঠক্রমের পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিখন উদ্দেশ্যগুলি পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা।
- **উপস্থাপন (Representation) :** প্রস্তুত বিষয়গুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে সেগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য হয়।
- **অভিযোজন (Adaptation) :** শিক্ষার্থীদের বয়স, সংস্কৃতি, জ্ঞানের স্তর ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যর নিরিখে সমন্বিত শিখন উপাদানগুলিকে প্রয়োজনমতো অভিযোজিত করে নেওয়া।
- **সংযোজন (Tailoring) :** একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমতো পাঠক্রম ও শিখন পরিকল্পনাকে সংযোজিত করা।
- **নির্দেশনা (Instruction) :** পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণ (teaching) সক্রিয়তা সম্পাদন।
- **মূল্যায়ন (Evaluation) :** ICT সমন্বিত শিক্ষণ-শিখন কতটা কার্যকরী হচ্ছে তা নির্ণয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়র্ন করা।

এই আলোচনার সাপেক্ষে বলা যায় শিক্ষাব্যবস্থাতে ICT-র প্রয়োগ শিক্ষণ থেকে শিখনের অভিমুখে পরিচালিত করে। শিক্ষার্থীরা ICT ব্যবহার করে নিজেরাই জ্ঞান নির্মাণে অংশগ্রহণ করে যা নির্মিতিবাদের তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর শিখনের উপযুক্ত পেডাগগিক কৌশল অবলম্বন করা, অর্থাৎ সহায়কের ভূমিকা পালন করা।

৫.৬.২ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন :

১। পাঠক্রমে ICT-কে সংযোজিত করতে হলে শিক্ষকের কী কী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন?

২। প্রচলিত পেডাগগির সঙ্গে ICT সংযোজিত পেডাগগির পার্থক্যগুলি কী কী?

ভেবে দেখুন :

আপনি উচ্চ প্রাথমিক স্তরের কোন্ শ্রেণিতে নদী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিখতে সাহায্য করার জন্য কী ধরনের ICT উপাদান ব্যবহার করবেন এবং পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য কী পরিকল্পনা করবেন?

৫.৬.৩ ICT and Teaching Learning Process - Computer Literacy, Computer Aided Learning

শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে সহজসরলভাবে উপস্থাপনে শিক্ষাপ্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমানে বহুল প্রচলিত। ICT-এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা, দূর শিক্ষার ব্যবহার, একক শিক্ষায় শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ICT-এর নানা ব্যবস্থা এবং ব্যবহার নির্দেশনার কাজে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই সাহায্য করছে এদের মধ্যে কতগুলি হল— CAL, CAI, CIM, CAD, CBE ইত্যাদি। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে বহুধা মাধ্যম দৃষ্টিভঙ্গি বা Multimedia Approach-এর ব্যবহার হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে Richard Mayer, Ronanne Moreno ও অন্যান্য গবেষকের গবেষণার উপর ভিত্তি করে বহুধা মাধ্যম ব্যবহারের কতকগুলি নীতির কথা উল্লেখ করা যায়। এই নীতিগুলি হল—

- যথার্থ সমন্বয়ে নীতি (Principles of Assimilation) :
  এক্ষেত্রে আবৃত্তি, শব্দ ও ছবি দ্বারা উন্নত মানের পাঠদান করা যায় যা শব্দ দ্বারা সম্ভব নয়।
- স্থানগত সাদৃশ্যের নীতি (Spatial Contiguity Principle) :
  শিক্ষার্থীরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছবি ও শব্দ দ্বারা অনেক ভালোভাবে শেখে, যদি এই ছবি ও শব্দগুলি একই পৃষ্ঠা বা স্ক্রিনে পরস্পরের কাছাকাছি রাখা যায়।
- সময়গত সাদৃশ্যের নীতি : (Temporal Contiguity Principle) :
  শিক্ষার্থীদের নিকট যদি ছবি ও শব্দগুলি একই সময়ে উপস্থাপন করা যায় তাহলে তারা দ্রুত শিখতে পারে।

৫.৬.৪ কম্পিউটার সাক্ষরতা (Computer Literacy)

কম্পিউটার সাক্ষরতা বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা। এই দক্ষতা হতে পারে সাধারণ স্তরের যা ব্যক্তির প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে পারে, হতে পারে কোনো প্রোগ্রামের ব্যবহার বা কোনো উন্নত স্তরের সমস্যার সমাধান। (Computer literacy is the ability to use computers & related technology efficiently, with a range of skills covering levels from elementary use to programming and advanced problem solving.)

কোন্ কোন্ দক্ষতা (Skills) থাকলে ব্যক্তিকে কম্পিউটার সাক্ষর বলা যায়, এবং কতখানি দক্ষ বলা যায় তা নির্ভর করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কোন্ কোন্ কম্পিউটারজনিত দক্ষতা আছে তার উপর। এই দক্ষতাগুলির ভিত্তিতে তিনটি ভাগে কম্পিউটার সাক্ষরদের ভাগ করা যায়।

(ক) মৌলিক (Basic) **:** এই দক্ষতাগুলির অন্তর্ভুক্ত হল

— কম্পিউটার Log on ও Log off করতে পারা।

— কোনো application বা file খুলতে ও বন্ধ করতে পারা।

— কোনো ফাইল Save করা।

— ডকুমেন্টের Print করা।

— কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ চিনতে পারা; যেমন— CPU, Monitor, Mouse, Key board, Printer etc.

— Input device চিনতে পারা

— Type করতে পারা

— বিভিন্ন Key (Delete, Shift, Arrow Keys, Space, enter) চিনতে পারা ও কাজ করা।

(খ) মধ্যমমানের দক্ষতা (Inter-mediate Skills)

দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হল— এই শ্রেণির দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হল—

—বিভিন্ন Directory-তে file চিহ্নিত করতে পারা।

—একই ফাইল বিভিন্ন জায়গায় Save করার দক্ষতা যেমন, C-drive, D-drive, E-drive, My Documents ইত্যাদি।

—বিভিন্ন format এ file চিনতে পারা ও Save করা

যেমন—.doc, .docx, .pdf, .jpg, .html ইত্যাদি।

—নতুন folder সৃষ্টি করে organise করা।

— ফাইলের নাম বদলানো, delete করা ইত্যাদি।

— Printer select করে, Print বা তথ্য স্থাপনের দক্ষতা।

— Printer select ও Print-গুলি ব্যবহার করা।

— Input ও Output ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা ইত্যাদি।

(গ) উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন (Proficient Skills)

এই দক্ষতা আগের দুটি শ্রেণির তুলনায় উন্নত। এই দক্ষতাগুলি হল—

— অতিরিক্ত বা Peripheral device যুক্ত (attach) করতে পারা যেমন Scanners, digital camera ইত্যাদি।

— কোনো file-এর Properties দেখে, file-এর সাইজ বুঝতে পারা।

— function keys নানারকম ব্যবহারের দক্ষতা

— একটা compressed file (.zip) save করতে পারা।

শ্রেণিকক্ষে সঠিকভাবে পাঠদান ও সার্থক পরিচালনার জন্য এই তিনটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত দক্ষতাগুলির প্রয়োজন। শিক্ষক কোন্ কোন্ দক্ষতার প্রয়োগ করবেন ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন্ দক্ষতার বিকাশ করতে চাইবেন, তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় কোন্ কোন্ দক্ষতাগুলি কাজে লাগাবেন ও শিক্ষার্থীদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রেষণা জাগাবেন।

কম্পিউটারের Literacy বলতে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারের দক্ষতা বোঝায় এবং স্বাধীনভাবে তা করতে সক্ষম হতে দেওয়ার উদ্দেশ্য বোঝায়। এই দক্ষতা বিচ্ছিন্নভাবে শেখানো উচিত নয়। এটি সম্পন্ন করতে হলে—

- বেসিক মূল কম্পিউটারে সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার সাক্ষরতা ও পারদর্শিতা ভিত্তি স্তর অতিক্রম করতে হবে।
- কম্পিউটারে সাক্ষরতা এবং শিক্ষাকে যুক্ত করার পারদর্শিতা দেখাতে হবে।
- প্রাসঙ্গিক নীতি (Contextual Principle) সম্পর্কে জানতে হবে।

এক্ষেত্রে যদি অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, ছবি ও অভিযোজনগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বহির্গত হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা ভালো শেখে।

- উপস্থাপনের একাধিক কৌশলের নীতি (Modality Principle)
  শিক্ষার্থী কেবল স্ক্রিনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বা অ্যানিমেশনের থেকে উভয়ের একক ব্যবহার দ্বারা অনেক কিছু শেখে।
- ব্যক্তিগত পার্থক্য নীতি (Individual Differences Principle)
  যে-কোনো শিক্ষণের নকশা উচ্চমানের শিক্ষার্থী অপেক্ষা নিম্নমানের শিক্ষার্থীর উপর অধিক প্রভাব ফেলে।
- প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের নীতি (Direct Manipulation Principle)
  উপকরণের জটিলতা যত বাড়তে থাকে শিক্ষণ উপকরণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তত বাড়তে থাকে।

উপরের নীতিগুলির কথা মনে রেখে বর্তমানে ICT-এর মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই শিখনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

৫.৬.৫ CAL (Computer Aided Learning)

CAL-এর ধারণার সৃষ্টি হয় প্রোগামড ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার বৃদ্ধির পরে। কারণ CAL-এ প্রোগ্রাম ইস্ট্রাকশন-এর নীতি ব্যবহার হয়ে থাকে। আমরা জানি যে প্রোগ্রাম ইস্ট্রাকশনে একজনকে একক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই একক শিক্ষা নির্দেশনার জন্য প্রচুর তথ্য সঞ্চিত করে রাখা এবং তার ক্ষুদ্র অংশ ব্যক্তির প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কম্পিউটার এমনই একটি যন্ত্র যাতে বিপুল তথ্য সঞ্চিত করে রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে তা ব্যবহার করা যায় বলে বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়, বিষয়বস্তু, নির্দেশনার বিভিন্ন কৌশল শিক্ষার্থীকে তার শিখনের ক্ষমতা, শিখনের গতি ও দক্ষতা অনুসারে সাজিয়ে সরবরাহ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, CAL হল একটি উপকরণ যার দ্বারা একটি পরিসরের শিক্ষা নির্দেশনার পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয় শিখনে ব্যবহার করা যাবে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করে তা দেখার মাধ্যমে CAL-এর উৎপত্তি হয়। প্রথম দিকে খুব সহজ প্রোগ্রাম নিয়ে পরীক্ষা হয়। এই প্রোগ্রামগুলি হল— কম্পিউটারে সঞ্চিত তথ্য চাপানো, মাল্টিপেল চয়েস প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। ১৯৬০ সালে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে—প্রোগ্রামের লজিক ফর অটোমেটিক টিচিং অপারেশনের প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যাট্রিক সাপস্ প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটারের মাধ্যমে গণিত ও পঠন-এর টিউটোরিয়াল কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রচলন করেন।

- **CAL-এর পদ্ধতি (Process of CAL)**

তিনটি পদ্ধতিতে সাধারণত CAL-এর বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরণ ও শিখন দেওয়া হয়—

১। লোগো (Logo)

২। সিমুলেশন (Simulation)

৩। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Controlled Learning)

১। লোগো (Logo)

এই পদ্ধতি বার করেন MIT বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্জিং (Feurzeing) এবং পাপার্ট (Papart) নামক দুইজন অধ্যাপক। লোগো প্রোগ্রামের ভাষা খুবই সহজ সরল। শিশুরা সহজেই ছবি আঁকতে পারে। শিশুরা নিজেদের মতো প্রোগ্রাম তৈরি করে খুশিমতো তাদের উপযোগী কাজ করতে পারে।

২। ভূমিকায়ন (Simulation)

এই পদ্ধতিতে মূল কাজ হল কৃত্রিম পরিবেশে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করা। এখানে PLATO এবং PLATO IV ব্যবহার করা হয়। এখানে LOGO-এর তুলনায় আরও উচ্চতর নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

৩। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Controlled Learning)

CAL-এর তৃতীয় ধরন হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। এখানে শ্রেণিকক্ষের মতো শিক্ষার্থীরা বারবার অভ্যাস করতে পারে। শিক্ষক কেবলমাত্র ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। তারপর শিক্ষার্থী নিজেই বারবার অভ্যাস করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষণ ও শিক্ষা পদ্ধতিতে এর গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি।

- **কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের জন্য শিখন সহায়ক বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা (Development of CAL Materials)**

বিষয়বস্তু প্রস্তুত করার জন্য CAL-এর মোড ব্যবহার করা হয়। সেগুলি হল—

১। টিউটোরিয়াল মোড

২। ড্রিল ও প্র্যাকটিস মোড

৩। সিমুলেশন মোড

৪। ডিসকভারি মোড

৫। সেমিং মোড

১। **টিউটোরিয়াল মোড :** এই মোডে ছোটো ছোটো ধাপে ধাপে তথ্য দেবার পর একটি ছোটো প্রশ্ন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রৈখিক ও শাখা পদ্ধতি দুইটি ব্যবহার করা হয়।

২। **ড্রিল ও প্র্যাকটিস মোড :** এই পদ্ধতিতে সঠিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করার জন্য বা সঠিক উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য রিইনফোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা হয় এবং ভুল উত্তরগুলো খুঁজে বার করে সঠিক করার চেষ্টা করা হয়।

৩। **সিমুলেশন মোড :** এই মোডে শিক্ষার্থীকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল আছে এমনভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেমন— এরোপ্লেনের ওড়া, দুটি বস্তুর মধ্যে মহাঘর্ষক হওয়া ইত্যাদি।

৪। **ডিসকভারি মোড :** এই মোডে শিক্ষার্থীকে প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির মাধ্যমে শেখানো হয়।

৫। **গেমিং মোড :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে খেলার মাধ্যমে শেখানো হয়। যেমন— বানান শেখার খেলা, কোনো জায়গার নাম জানা ইত্যাদি।

- **কম্পিউটার সহায়ক শিখনের সুবিধা (Advantages of CAL)**

শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠন যদি কম্পিউটারভিত্তিক হয় তাহলে সাধারণ শ্রেণিকক্ষের তুলনায় অতিরিক্ত কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়।

(ক) এটি একটি ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতি (Individualistic Method) কারণ শিক্ষার্থী নিজের গতিতে কাজ করার স্বাধীনতা পায়। কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনা self-directed study-র জন্য নির্ধারিত, তাই প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

(খ) একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে তথ্য পরিবেশন করা হয়। তাই সে বিষয়ে তথ্য ও নিয়মে (factor & rules) যে ধারা বা hierarchy থাকে, অ-কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষণ শিখনকে অত্যন্ত কার্যকরী রূপ দেয়।

(গ) এই কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেই হয়, যা প্রথাগত শ্রেণিকক্ষে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মতো বক্তৃতা শোনা বা বই অনুসরণ করলেই যথেষ্ট।

(ঘ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী—এই ধরনের মিথস্ক্রিয়া কম্পিউারভিত্তিক শ্রেণিকক্ষের অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে feedback পেতে বেশি সময় লাগে না, এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী course of action নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(ঙ) শিক্ষার্থীরাও নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায়।

(চ) কম্পিউটার সহযোগে শিক্ষণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'Manipulation'-এর ফলে কঠিন ধারণা গঠনেও তুলনামূলকভাবে কম সময় লাগে।

- **কম্পিউটারভিত্তিক শিখনের সীমাবদ্ধতা (Limitation of CAL)**

যে-কোনো সিস্টেমের সুবিধা যেমন থাকে আবার সীমাবদ্ধতাও থাকে, কম্পিউটারভিত্তিক শিখনও এর ব্যতিক্রম নয়। এই পদ্ধতির মূল সীমাবদ্ধতাগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(ক) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সচলতা (mobility of teachers) একটি আর্দশ পাঠদান পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে CAL এর মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের স্বতঃস্ফূর্ত চলাফেরার সুযোগ থাকে না।

(খ) দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করলে দৃষ্টিশক্তির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

(গ) বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয়ে যেমন ভৌতবিদ্যা, রসায়ন, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষণাগারে পরীক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এই সমস্ত বিষয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখন সম্ভব হয় না।

(ঘ) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction) অনেকটাই কমে যায় এই পদ্ধতিতে তাই সহপাঠীদের থেকে শিখন সম্ভব হয় না।

(ঙ) সৃজনশীলতার বিকাশ ও কল্পনাশক্তি উদ্ভাবনের জন্য যতখানি কম্পিউটারের দক্ষতা প্রয়োজন, তা না থাকার দরুন, এই মানসিক ক্ষমতাগুলির বিকাশ ব্যাহত হয়।

(চ) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সমস্ত ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় না। রচনাধর্মী উত্তর, নতুনত্ব, সৃজনমূলক ধারণা ইত্যাদির মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন।

(ছ) সবশেষে বলা যায় কম্পিউটারভিত্তিক শিখন কখনোই শিক্ষক পরিচালিত শ্রেণিকক্ষের সঙ্গে তুলনীয় নয়। একটি গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবাচনিক প্রতিক্রিয়া (non-verbal reinforcement), রসবোধের ব্যবহার (use of humour) এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত ভাব বিনিময়ের অবকাশ—অত্যন্ত জরুরি, যা একটি শ্রেণিকক্ষকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

- **আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন (Check your Progress)**

১। কম্পিউটারের Literacy বলতে কী বোঝেন?

২। CAL কী?

৩। CAL-এর পদ্ধতিগুলি কী কী?

৪। CAL প্রস্তুতিতে কী কী মোড ব্যবহার করা হয়?

৫.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

এই একক থেকে আমরা আইসিটি সম্পর্কে জানতে পারলম। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যেগুলি জানতে পারলাম সেগুলি হল—

- ২১ শতকের দক্ষতা—
  - ১। শিক্ষা ও উদ্ভাবন দক্ষতা
  - ২। তথ্য মিডিয়ার ও প্রযুক্তির দক্ষতা
  - ৩। জীবন ও কর্মজীবন দক্ষতা
  - ৪। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা
- আইসিটি হল শব্দের ফোকাস— তথ্য (Information), যোগাযোগ (Communication), এবং প্রযুক্তি (Technology)। এই তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত প্রয়াসই হল আইসিটি।
- ICT মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থায় শিখনে ৬টি M এর সমন্বয়ে একসাথে কাজ করে—মানুষ (Man), মেশিন (Machine), বস্তুসামগ্রী (Materials), মাধ্যম (Media), ব্যবস্থাপনা (Management) এবং পদ্ধতি (Method)।
- শিক্ষা ও শিক্ষার ইতিহাসের চারটি কৌশল হল— টিউটোরিয়াল, অন্বেষণ, যোগাযোগ এবং অ্যাপ্লিকেশন।
- Computer Literacy বলতে কম্পিউটারে দক্ষতাকে বোঝায়।
- CAL-এর বিভিন্ন পদ্ধতি— লোগো (Logo), সিমুলেশন (Simulation), নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Controlled Learning)
- CAL-এর বিভিন্ন মোড আছে— টিউটোরিয়াল মোড, ড্রিল ও প্র্যাকটসি মোড, সিমুলেশন মোড, ডিসকভারি মোড, গেমিং মোড।

প্রয়োজনীয় ধারণা (Key Concepts)

- তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)
- শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি (Learning-Teaching Process)
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (Class Management)
- কম্পিউটারভিত্তিক শিখন (Computer Aided Learning)

৫.৮ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

(১) আইসিটি বলতে কী বোঝেন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) ২১ শতকের দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) শিক্ষাদানে শিখনে Multimedia নীতিগুলি কী কী আলোচনা করুন।

(৪) CAL বলতে কী বোঝেন?

(৫) CAL-এর বিভিন্ন মোডগুলি আলোচনা করুন।

(৬) ডেলার কমিশন কোন্ সালে গঠিত হয়েছে এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছে?

(৭) একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিশেষ সামর্থ্য অর্জন করা প্রয়োজন?

(৮) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলতে কী বোঝ?

(৯) শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির পরিধি বর্ণনা করো।

(১০)শিখন-শিক্ষণ পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তিমূলক কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করবে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

(১১)ICT পেডাগগির অনুশীলনে শিক্ষকদের কোন্ কোন্ দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং কেন?

(১২)Shalman-এর মডেলটি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করবে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

(১৩)তথ্যপ্রযুক্তি কৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের ইতিহাস ও বিবর্তন সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

(১৪)সাবেকি ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি কৌশল কোন্ পরিবেশে কীভাবে প্রয়োগ করবে ব্যাখ্যা করো।

References :

1. Educational Technology — Mangal & Mangal
2. Essentials of Educational Technology — J.C. Aggarwal
3. School Management and Systems of Education — V. Krichnamacharyulu
4. Educational Technology — Jagannath Mohanty

অধ্যায়
৬

অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষা
(INCLUSIVE EDUCATION)

৬.০ ভূমিকা এবং উদ্দেশ্য (Introduction and Objectives)

৬.১ ভারতীয় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভুক্তিকরণের ধারণা (Concept and Forms of Inclusion and Exclusions in Indian Education)

৬.২ অসক্ষমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণের ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট (Historical and Contemporary Perspectives to Disability and Inclusion)

৬.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সমন্বয়ন (Inclusive Education & Integration)

৬.৪ অসমতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কৌশলের প্রয়োজনীয় নমনীয়তা (Inequality and Diversity in Indian classroom : Pedagogical and Curriculum Concerns– Scope for Flexibility as and when Required)

৬.৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল্যায়নের প্রকৃতি অন্বেষণ (Understanding and Exploring the Nature of Assessment for Inclusive Education)

৬.৬ সারসংক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ধারণা (Summary and Key Concepts)

৬.৭ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

প্রতিটি শিশুর চাহিদা ভিন্ন। বিভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক উপকরণের সাহায্যে যখন একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার সুযোগ দেয় তখন তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ বলা হয়। এই ধরনের বিদ্যালয়ে কোনো অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের আলাদা কোনো শ্রেণিকক্ষে লেখা পড়া করানো হয় না, বরং শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ এবং বিদ্যালয় পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করা হয় যাতে সমস্ত ছেলেমেয়েদের তাদের বিভিন্ন দৈহিক, বৌদ্ধিক, সংবেদনমূলক এবং চলাফেরার ক্ষমতা ও অক্ষমতা সমেত তাদের সকলকে একই শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে তাই বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে চলেছে এই অভীষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য।

উদ্দেশ্য (Objectives) :

প্রশিক্ষণরত শিক্ষক এই অংশটি পাঠের পরে —

- অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভূতকরণের ধারণাগুলি নিজের ভাষায় বলতে পারবে।
- ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কেন বহির্ভূত তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভারতের শিশুদের মধ্যে অক্ষমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণের ঐতিহাসিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- কীভাবে বিশেষ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে যাওয়া যায় তা প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীরা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সমন্বয়ন এই দুটি ধারণাকে নিজের ভাষায় বোঝাতে পারবে।

- বিশেষ শিশুর শিক্ষার প্রতি শিক্ষক, পিতামাতা ও সমাজের ভূমিকা কেমন হবে তা উল্লেখ করতে পারবে।
- ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যে অসাম্য (inequality) ও বৈচিত্র্য (diversity) রয়েছে তা শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে।
- পাঠক্রমে নমনীয়তা বিশেষ শিক্ষায় কেন প্রয়োজন তা নিজের ভাষায় যুক্তিসহকারে বলতে পারবে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের মূল্যায়নের প্রকৃতি বুঝতে ও অনুসন্ধান করতে পারবে।

৬.১ ভারতীয় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভুক্তিকরণের ধারণা (সমাজের প্রান্তিক মানুষ, লিঙ্গ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু) [Concept & Forms of Inclusion and Exclusions in Indian Education (marginalised Sections of Society, Gender, Children with Special Needs)]

৬.১.১ প্রেক্ষাপট :

অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষার মূল বক্তব্য হল সকল শিক্ষার্থীকে একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান করা। ভারতবর্ষে নানারকম ভাষার, জাতির মানুষ বসবাস করে। এখানে তাই শিক্ষার্থীদের ভাষা, অক্ষমতা, কৃষি, পারিবারিক পটভূমি নির্বিশেষে একটি শ্রেণিতে নিয়ে আসাই অন্তর্ভুক্তিকরণ বা Inclusion। যে সমস্ত শিক্ষার্থীর কোনোরকম অক্ষমতা আছে বা কোনো সামাজিক কারণে শিক্ষার আওতায় আসতে পারেনি তাদের সকলকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসাই শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusion in Education)।

অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল স্পেন-এর সালামানকায়, ১৯৯৪ সালে — 'World Conference on Special Needs Education : Access and Quality'-তে, যা পরবর্তীকালে World Education Forum-এ পুনঃগ্রহণ করা হয় ২০০০ সালে।

বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়টি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন— ILO, UNDP, World Bank এবং UNESCO অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন কারণে বঞ্চিত তাদের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছে।

৬.১.২ ভারতবর্ষের অবস্থা (Indian Context) :

১৯৯০ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ মিলিয়ন শিশু শিক্ষার মূলস্রোতের বাইরে ছিল তাদের দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। আমাদের দেশে অন্তর্ভুক্তিকরণের অর্থ হল জাত-পাত, ধর্ম, সংস্কৃতি, দারিদ্র্য এবং প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির ফলে যারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত তারা যাতে অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের সঙ্গে অবস্থান করতে সক্ষম হয় এবং সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সমস্ত জনগণকে একই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব যদি তাদের একই শিক্ষার অঙ্গনে আনা যায়।

এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে যারা পিছিয়ে আছে তাদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মূলত পিছিয়ে পড়া জাতি-উপজাতির মানুষের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। আবার লিঙ্গ ভেদে সকল নারী-পুরুষের শিক্ষার সমান অধিকার, তাই শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীতা সমান। অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে শিক্ষায় বিশেষ শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে। বিশেষ শিশু বলতে তাদের বোঝায় যাদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অন্যদের থেকে ভিন্ন।

৬.১.৩ অন্তর্ভুক্তিকরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Inclusion) :

অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে গেলে এর বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন।

(ক) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অক্ষমতা, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলে একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

(খ) এই ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ জানেন যে প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিসত্তা পৃথক, তাই এদের চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে নমনীয়।

(গ) প্রতিটি শিশুর সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে হয় শিক্ষককে যাতে তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তাদানে সমর্থ হন।

(ঘ) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সক্ষম ও অসক্ষম শিশুরা একই শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের সুযোগ পায়। তাই শিশুরা শেখে কীভাবে বৈষম্যকে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করা সম্ভব হয়।

(ঙ) একই এলাকার সমস্ত শিশুই একসঙ্গে পড়াশোনার সুযোগ পায়। তাই প্রতিবন্ধী শিশুরা, তাদের প্রতিবেশী বন্ধুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পড়তে পারে।

৬.১.৪ বহির্ভূতকরণ (Exclusion) :

বহির্ভূতকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা দল সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় (Exclusion is the process through which an individual or groups are wholly or partially excluded from full participation in the society in which they live)।প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক আধিকার আছে যা তাকে সমাজের সকল কর্মসূচিতে যেমন— বৃত্তি, বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেয়। বহির্ভূতকরণ তখনই ঘটে যখন ব্যক্তি বা দল শিক্ষা, বৃত্তি, বাসস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভূতকরণের বিভিন্ন প্রকার (Different Forms of Inclusion & Exclusion) :

অন্তর্ভুক্তিকরণ সাধারণত দুই প্রকারের হয় যা এখানে আলোচনা করা হল—

(i) আংশিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Partial Inclusion) : এই পদ্ধতিতে একটি বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে সময় সারণিতে এমন কিছু ক্লাসও থাকে যে সময় শিশুকে অন্য ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সমস্ত শিশুর বিশেষ কোনো চাহিদা আছে সেই অনুযায়ী কোনো বিশেষ ক্লাসে বা Resource Room-এ তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্লাসের শেষে তাকে আবার আগের সাধারণ শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা হয়।

(ii) সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকরণ (Complete Inclusion) : এই পদ্ধতিতে শিশুকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় না। একই শ্রেণিকক্ষে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে বিশেষ শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা মিটিয়ে একই সঙ্গে শিক্ষাদান করা কার্যত সম্ভব হয় না।

৬.১.৫ বহির্ভূতকরণের প্রকারভেদ (Type of Exclusion) :

অর্মত্য সেন (২০০০) বহির্ভূতকরণকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—

সক্রিয় বহির্ভূতকরণ (Active Exclusion) : আইনের মাধ্যমে বা পরিকল্পিতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি বা দলকে সাধারণ সুযোগ সুবিধা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে তাকে বলে সক্রিয় বহির্ভূতকরণ।

নিষ্ক্রিয় বহির্ভূতকরণ (Passive Exclusion) : যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দারিদ্র্যতার জন্য শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত হয় তবে তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় বহির্ভূতকরণ।

ব্যক্তি বা দল নানা দিক থেকে বহির্ভূত হতে পারে। যেমন—আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। যদি কোনো দল বা ব্যক্তি যে-কোনো একটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় আংশিক বহির্ভূতকরণ। আবার যদি কেউ সবকটি ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত থাকে তবে তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ বহির্ভূতকরণ।

৬.১.৬ অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভূতকরণ (Inclusion Vs Exclusion):

অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে আমরা বুঝি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীর আরও বেশি অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বহির্ভূতকরণ হল এই অংশ গ্রহণ কমানোর প্রক্রিয়া, শিক্ষায় অক্ষমতা, ক্ষমতা, জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি, পারিবারিক কাঠামো ইত্যাদির

ভিত্তিতে বহির্ভূতকরণের চাপ কমানোই হল অন্তর্ভুক্তিকরণ বা Inclusion। অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভূতকরণের ধারণা দুটি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কারণ বহির্ভূতকরণের চাপ যত বাড়বে অন্তর্ভুক্তিকরণ তত কমবে, আবার অন্তর্ভুক্তিকরণ যত বাড়ানো সম্ভব হবে ততই বহির্ভূতকরণ কমবে।

নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your progress) :

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

(i) অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল স্পেনের __________ 1994 সালে।

(ii) 1990 পর্যন্ত __________ মিলিয়ন শিশু শিক্ষার মূলস্রোতের বাইরে ছিল।

(iii) অন্তর্ভুক্তিকরণ দুই প্রকারের হয় __________ ও __________ অন্তর্ভুক্তিকরণ।

2. দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

(i) বহির্ভূতকরণ বলতে কী বোঝ?

(ii) অন্তর্ভুক্তিকরণের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

(iiii) বহির্ভূতকরণ কয় প্রকার ও কী কী?

(iv) অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভূতকরণের মধ্যে সম্পর্ক দুটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

৬.২ অসক্ষমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণের ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট (Historical and Contemporary Perspectives of Disability and Inclusion)

প্রাচীনকালে প্রতিবন্ধকতাকে পূর্বজন্মের কর্মের ফল হিসেবে দেখা হত। তাই প্রতিবন্ধী শিশুদের অনেক ক্ষেত্রেই মেরে ফেলা হত আর বাঁচিয়ে রাখলেও তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় এই বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদারহণস্বরূপ বলা যায়— স্পার্টায় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি শিশুকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা। যেহেতু প্রতিবন্ধী শিশুরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারত না, তাদের জন্য শিক্ষার কথাও ভাবা হত না। নবজাগরণের যুগে এসে এই ধারণা কিছুটা বদলায়, কিছু কিছু উন্নতমনস্ক মানুষের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের কথা ভাবা হয়।

সেই সময় প্রতিবন্ধী শিশু বলতে ব্যাহত শ্রবণ শক্তি, ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের বোঝানো হত।

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে Pedo Ponce de Leon নামে একজন স্পেনদেশীয় সাধু Vallade Lid শহরে বধিরদের জন্য একটি বিদ্যালয় শুরু করেন। তিনি প্রথমে কিছু বধির শিশুকে কথা বলতে, লিখতে পড়তে এবং পাঠ্য বিষয় শিখতে সাহায্য করেন।

১৬২০ খ্রিস্টাব্দে Juan Pablo Bonet বধিরদের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পুস্তক রচনা করেন এবং আঙুলের সাহায্যে বানান শেখানোর পদ্ধতি অবিষ্কার করেন যা বর্তমানেও অনুসরণ করা হয়।

১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে John Bulwer ইংল্যান্ডে বধিরদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে Thomas Braidwood গ্রেট ব্রিটেনের এডিনবার্গ শহরে বধিরদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যেখানে তিনি মৌখিক অঙ্গভঙ্গি ও আঙুলের দ্বারা সৃষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এরপর ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে Samuel Heinicke জার্মানির Leipzig শহরে বধিরদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যাহত শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য Lip reading-এর উপর জোর দেন।

ধীরে ধীরে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ২২টি এইরকম বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রাহাম বেল-এর নিরলস প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কে বয়স্ক বধিরদের শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায়— ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে Valentin Hary প্যারিসে একটি 'National Instiute' প্রতিষ্ঠা করেন দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এই আবাসিক বিদ্যালয়টির সাফল্যের পর পরবর্তী ১৫ বছরে আরও ৭টি এই জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে প্রথম সাধারণ বিদ্যালয়ে আংশিক দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিহীনদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মানুষ হলেন Louis Braille । তিনি দৃষ্টিহীনদের জন্য Embossed Dot-এর মাধ্যমে এক শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। কাগজে Embossed dot-গুলি হাত দিয়ে অনুভব করে সংখ্যা বা বর্ণগুলি চিনতে হয়। মাত্র ৬টি (Sex) ডটের বিভিন্ন অবস্থানের সমন্বয়ে সমস্ত সংখ্যা ও বর্ণ বোঝানো হয়।

Dr. Itard তাঁর লেখা 'The Wild boy of Aveyron' বইয়ে প্রথম মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ফরাসি মনোবিদ Edward Segein এবং ইতালিয়ান মনোবিদ Maria Monessori, Dr. Itard-এর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজের নিজের দেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা করেছিলেন। Decroly ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেলজিয়ামে প্রথম মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান শুরু করেন।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি মনোবিদ বিঁনের বুদ্ধির অভীক্ষার উদ্ভাবন। এই আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে চর্চা বেড়েছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জার্মানিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ক্লাস (special class)-এর ব্যবস্থা করা হয় যা ধীরে ধীরে তা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রেই বিশেষ শিক্ষার ধারণার প্রবর্তন হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেও 'বিশেষ শিক্ষার' ধারণার যথেষ্ট চর্চা হচ্ছে।

৬.২.১ ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background of Inclusive Education in India):

ভারতবর্ষের সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় সমন্বিত শিক্ষার ধারণাটি দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে ৬-১৪ বছরের সমস্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজসেবা মন্ত্রক (Ministry of Social Welfare) সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেছিল।

১৯৭১ সালে পরিকল্পনা কমিশন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচিকে প্রোজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৭৪-এ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য Integrated Child Development Scheme চালু হয়েছিল যা বর্তমানেও চলছে।

১৯৮৩ সালে Bombay-তে প্রথম বধিরদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছিল। এখানে বলা হয়—যারা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী তাদের জনসাধারনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের জীবনযাপনের সুযোগ পায়।

Programme of Action (POA), ১৯৯২-তে বলা হয়েছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৯২-তে Rehabilitation Council of India Act-টি সংসদে গৃহীত হয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সালামানকা সম্মেলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994)—এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ভারতবর্ষও সেখানে স্বাক্ষর করে। এই সম্মেলনে বলা হয়েছিল শিক্ষা সকলের জন্য (Education for All) আর তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষানীতির অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছিল।

২০০৫ সালে, Inclusion of Children and Youth with Disability প্রকল্পে, প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। এর পরের বছর ২০০৬ সালে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে যুক্ত করা হয় সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে।

২০০৫ সালে ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং রাজ্যসভায়, MHRD (Ministry of Human Resource and Development) দ্বারা গঠিত, শিশু ও যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য বিশেষ Action Plan-এর ঘোষণা করেছিলেন। সরকারের তরফ থেকে আরও বলা হয়েছিল দেশের সমস্ত বিদ্যালয় অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে ২০২০ সালের মধ্যে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন হল Right to Education Act 2009, যা ২০১০ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। এই আইনে সমাজে পিছিয়ে পড়া সমস্ত শিশুদের একটি শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণের কথা বলা হয়েছিল।

৬.২.২ অন্তর্ভুক্তিকরণের আধুনিক ধারণা (Modern Concept of Inclusion) :

অন্তর্ভুক্তিকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় শুরুতে যারা ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও মানসিক প্রতিবন্ধী তাদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। তাই যদি কোনো মানুষ জাতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থান বা লিঙ্গবৈষম্যের কারণে পিছিয়ে পড়ে তাদের সকলেরই শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণও তাই অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার অধিকার আইনের (Right to Education Act) সুপারিশে এই উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

- **নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your progress) :**

১. একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

(i) প্রাচীনকালে প্রতিবন্ধকতার কারণ কী মনে করা হত?

(ii) বধিরদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় কে স্থাপিত করেছিলেন এবং কোন্ সালে?

(i) ব্রিটেনের বিশেষ স্কুলে ১৭৬৭ সালে কে বধিরদের বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন? কোন্ পদ্ধতির কথা এখানে বলা হয়েছিল?

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(i) ভারতবর্ষের সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় ৬-১৪ বছর বয়স্ক সমস্ত শিশুর __________ , __________ ও __________ শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

(ii) __________ সালে __________ সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেছিল।

(iii) ২০০৬ সালে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে যুক্ত করা হয় __________ সঙ্গে।

৬.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সমন্বয়ন (Inclusive Education and Integration) :

সমন্বয়ন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ দুটি শব্দই শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। যদিও প্রকৃতিগত ফারাক রয়েছে এই দুটি শব্দের মধ্যে।

অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে বোঝায় বিশেষ শিশুদের অন্যান্য সাধারণ শিশুদের সঙ্গে সরাসরি বিদ্যালয়ে ভরতি করানো যাতে সাধারণ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর মধ্যেই বিশেষ শিশুদেরও চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। অল্পবয়সেই এই বিশেষ শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয় যাতে তারা বিদ্যালয় গৃহ, আসবাবপত্র, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনা, অন্যান্য প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশু এবং অন্যান্য সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে তুলতে পারে। অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনবোধে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণ পদ্ধতি, কর্মকৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংশোধন করতে হয়। বিশেষ শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয় অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে।

সমন্বয়নের মাধ্যমেও বিশেষ শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার আগে সাধারণ শ্রেণিকক্ষের উপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা শিক্ষককে অংশগ্রহণ করতে হবে তা নয়, অভিভাবকদের ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusion) ও সমন্বয় (Integration) — এই দুটি পদ্ধতির কার্যকারিতা তুলনা করলে বলা যায় ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমন্বয়নের তুলনায় বেশি প্রাসঙ্গিক। তার কারণ সাধারণ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার আগে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার সমন্বয়নের ক্ষেত্রে তার জন্য চাই বিশেষ বিদ্যালয়, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সচেতন পিতা-মাতা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আলাদা পরিকাঠামো। অন্যদিকে, অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে কোনো আলাদা পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয় না, প্রচলিত বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৬.৩.১ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Inclusive Education) :

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিশু ও বিশেষ শিশু একইসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। বিশেষ শিক্ষার্থীদের কোনোভাবে সাধারণ শিশুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় না। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ —

ক. সাধারণ বিদ্যালয় পরিবেশে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে মৃদু মাত্রায় বিশেষ শিক্ষার্থীদের যত্নযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এই শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

খ. কোন্ শ্রেণিতে শিশুটি পাঠ করছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে মূল গুরুত্বের জায়গা হল শিশুর সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ।

গ. এই শিক্ষার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের প্রতি সাধারণ সহপাঠীদের সঠিক মনোভাব গঠন।

ঘ. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (Mutual Interaction) মাধ্যমে বিশেষ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে আনা এই শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য।

ঙ. বিশেষ শিশুদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলি ও সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা, যাতে তাদের মধ্যে হতাশা ও হীনমন্যতার বোধগুলি দূর করা সম্ভব হয়।

চ. অন্তর্ভুক্তিকরণের আরও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা নিজ হাতে কাজের মাধ্যমে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

৬.৩.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রধান তিনটি স্তম্ভ (Three Pillars of Inclusive Education) :

বিশেষ শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে কার্যকরী ও প্রয়োজনভিত্তিক করে তুলতে হবে। সেইজন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত তিনটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করে। এই তিনটি স্তম্ভ হল —

ক. অত্যাবশ্যক পরিসেবা (Essential Services) : তিনটি পরিসেবার মধ্যে এই শ্রেণির পরিসেবাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সাধারণ শিক্ষণ ও বিশেষ শিক্ষণ—এরা সকলে মিলে এই পরিসেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। এই পরিসেবার মধ্যে যে কার্যগুলি অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল —

(i) বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ (determination of suitable teaching method) করতে হবে।

(ii) পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা।

(iii) শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা।

(iv) শ্রেণির মধ্যে এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

(v) বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের গৃহকাজ দেওয়া এবং তা দেখে নেওয়া।

(vi) বিশেষ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনীয় Feedback দেওয়া।

(vii) শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলা এবং পরামর্শ দেওয়া।

(viii) শিক্ষকের এবং বিদ্যালয়ের তরফে প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যাতে বিদ্যালয়ের শেখানো কার্যাবলি গৃহে অনুসৃত হয়।

খ. সহায়ক পরিসেবা (Support Service) : অত্যাবশ্যক পরিসেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের যার দক্ষতা ছাড়া এই দ্বিতীয় শ্রেণির সহায়ক পরিসেবা বিশেষ শিশুদের কাছে পৌঁছাবে না। এই বিশেষ শিক্ষকেরা (Special Educators) দুইভাবে সহায়তা করেন। যেমন প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পরামর্শ দিয়ে থাকেন আবার সাধারণ শিক্ষকের নির্দেশনা (guidance) দান করেন যাতে সঠিকভাবে এই শিক্ষকেরা বিশেষ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপাদান ও উপকরণ সম্পর্কেও উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই সহায়ক পরিসেবার অন্তর্ভুক্ত কাজ হল —

(i) নির্দিষ্ট এলাকার বিশেষ শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification)।

(ii) সাধারণ শিক্ষকদের সহায়তাদান যার মাধ্যমে তারা বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

(iii) বর্তমানে বিশেষ শিক্ষার উপযোগী নানারকম উপকরণ উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই আধুনিক উপকরণগুলি শিক্ষণ-শিখনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন সাধারণ শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে।

(iv) বিশেষ শিশুরা কতটা শিখেছে বা পারদর্শিতা লাভ করছে সে সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। শিক্ষক তার পারদর্শিতার মূল্যায়ন করবেন ও প্রয়োজনীয় Feedback দেবেন শিক্ষার্থীকে এবং প্রয়োজনবোধে অভিভাবককে।

(গ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিসেবা (Peripheral Services) :

যে সংস্থাগুলি এই পরিসেবা দিয়ে থাকে সেগুলি হল— হাসপাতাল, পুনর্বাসন কেন্দ্র, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলির কাজ হল বিশেষ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও পরামর্শদান (Indentification, Evaluation and Counselling).

এই পরিসেবার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি হল —

(i) বিশেষ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবরণী প্রকাশ করা।

(ii) বিশেষ শিশুদের সামাজিক অধিকার (social right) সম্পর্কে তাদের সচেতন করা এবং এই অধিকার অর্জনে সহায়তা করা।

(iii) বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করা।

(iv) এই বিশেষ শিশুদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকদেরও নানারকম পরামর্শদান (Parent Counselling) প্রয়োজন। এই সমস্ত পরিসেবা এই সংস্থাগুলি দিয়ে থাকে।

অন্তর্ভুক্তিকরণ বিশেষ শিশুদের সমাজে অন্যান্য সাধারণ শিশুদের সমান অধিকার দেওয়ার একটি অন্যতম হাতিয়ার। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লেখাপড়ার সুযোগ পেলে এই বিশেষ শিশুরাও স্বাভাবিক একটা পরিবেশ পাবে বেড়ে ওঠার জন্য।

অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষার আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না যদি এই শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা, পিতামাতার ভূমিকা ও সহপাঠীদের ভূমিকা না আলোচনা করা হয়।

৬.৩.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা (Special Role of Teacher in Inclusive Education) :

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না যদি শিক্ষক তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন না করেন। একমাত্র শিক্ষকের দক্ষতা ও কর্মকুশলতায় সাধারণ বিদ্যালয়েও শিক্ষক বিশেষ শিশুকে বিশেষ সহায়তা দিতে সক্ষম হন। শিক্ষকদের যে ভূমিকা পালন করতে হয় তার অন্তর্ভুক্ত হল—

(i) অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন (Keeping Contact with Guardian) :

শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বা পরামর্শদানের মাধ্যমে এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটানো যায় না। শিশু কতটা অগ্রগতি করছে বা কতটা পিছিয়ে আছে, বা বিদ্যালয়ের কোন্ কাজটি বাড়িতেও করা প্রয়োজন অভিভাবকেরা সেটা জানতে পারে শিক্ষকদের কাছ থেকে।

(ii) বিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ (Keeping Regular Contact with the School Administration) :

বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য যে পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা কি পর্যাপ্ত নাকি আরও সুযোগ-সুবিধার বিস্তার প্রয়োজন এটা শিক্ষক জানতে পারবেন যদি বিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। যদি কোন্ বিশেষ উপকরণেরও প্রয়োজন হয় তাও শিক্ষক প্রশাসনকে জানাবেন।

(iii) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি (Developing Professional Skills) :

বিশেষ শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের দক্ষতা, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সদর্থক মনোভাব। তাই পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে জানতে হবে, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণও নিতে হবে।

(iv) পাঠক্রম পরিমার্জন (Revision of Curriculum) :

বিশেষ শিশুদের শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে প্রচলিত পাঠক্রমে নমনীয়তা (flexibility) প্রয়োজন। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে কোনো বিষয় সংযোজন করতে পারেন আবার বাদও দিতে পারেন।

(v) উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি (Creating Suitable Environment) :

বিশেষ শিশুরা যাতে নিজেদেরকে বিশেষ না মনে করে এবং সাধারণ শিশুদের মতোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়, সেই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব শিক্ষকের।

৬.৩.৪ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা (Role of Parents in Inclusive Education) :

সাধারণ শিক্ষার মতোই বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত বিদ্যালয়েই PTA (Parent-Teacher Association) এবং Parent Advisory Council আছে, যেখানে বাবা-মায়েরা শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করে নিজেদের শিশুর সুবিধা-অসুবিধা জানতেও জানাতে ও পারেন। অভিভাবকগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত বা কোনো উপাদান থাকলে নির্দ্বিধায় বিদ্যালয়ে জানাতে পারেন। তবে কিছু কিছু দায়িত্ব আছে যা অবশ্যকরণীয়, সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল—

(i) বিদ্যালয়ে ভরতির সময়ে শিশুর প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সঠিকভাবে উল্লেখ করা যাতে শিক্ষকেরা শিশুর বিশেষ চাহিদাগুলি বুঝতে সমর্থ হন।

(ii) কোনো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি থাকে শিক্ষককে সে বিষয়ে অবহিত করা।

(iii) নিয়মিত বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

(iv) বাড়িতে কোন্ কোন্ কাজ বা আচরণ সম্পাদিত করতে হবে সেগুলি জেনে নেওয়া ও বাড়িতে সেগুলি অনুসরণ করা।

(v) বিদ্যালয়ে যে আলোচনাগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। অনেক সময় অনেক সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেও উঠে আসে।

(vi) বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ জোগানো উচিত।

(vii) বিদ্যালয়ের সহায়তা ছাড়া যদি কোন চিকিৎসকের সহায়তার প্রয়োজন হয় তাহলে অভিভাবক তার শিশুটিকে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য নিয়ে যাবেন।

(viii) সর্বোপরি অভিভাবক একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে শিশুটি কোনোভাবেই নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে।

৬.৩.৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় সহপাঠীদের সাহচর্য (Role of Peer Group in Inclusive Education) :

অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে সাধারণ শিশু ও বিশেষ শিশু পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়। এই দুই ভিন্ন দলের মধ্যে যদি যথার্থ সখ্যতা বা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, তবে অন্তর্ভুক্তিকরণের অনেক উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন—

(i) Peer Tutoring/সহপাঠীদের দ্বারা পঠন — এখানে একটি শ্রেণিতে যে শিশুরা অন্যদের থেকে উন্নত, তাদের চিহ্নিত করে নিয়ে, তাদের দিয়ে বিশেষ শিশুকে যদি পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে পাঠদান করা যায় তাহলে বিশেষ শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে।

(ii) Peer Assisted Learning/সহপাঠীর সহায়তায় শিখন— এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী যখন পাঠ গ্রহণ করে সেই সময় কোনো উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা শ্রেণিতে যাদের সবাই ভালো বলে জানে তারা বিশেষ শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করতে পারে।

(iii) Specially Planned Activities/বিশেষভাবে পরিকল্পিত কার্যাবলি — শিক্ষক এমন কিছু দলগত কার্যাবলি (group activities) দিলেন যাতে বিশেষ শিশুরা সাধারণ শিশুদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি সহজেই শিখতে পারে।

৬.৩.৬ অন্তর্ভুক্তিকরণের অসুবিধা (Limitations of Inclusion) :

বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে। সরকার ও কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে এবং নানাভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রসার বাড়ানোর প্রচেষ্টা করছে যাতে আরও বেশি করে বিশেষ

শিশুরা এর আওতায় আসতে পারে। তবে কোনো ধারণা যখন বাস্তবে কার্যকরী হয় তখন তার অনেক অসুবিধাও দেখা যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় ও শিক্ষক যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার কিছু এখানে তুলে ধরা হল।

(i) **শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Individual Pupils) : আমরা জানি প্রতিটি শিশু একে অন্যের চাইতে আলাদা, তাই বিশেষ শিশুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়— তাদের অক্ষমতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, মানসিক গুণাবলি ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন। তাই বিদ্যালয়ে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না।

(ii) **শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অমিল** (Mismatch between Students' Attributes and School's Infrastructure) : শিক্ষার্থী যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যালয়ে যায় অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা সেইমতো থাকে না। শিক্ষার্থীর অসুবিধার সৃষ্টি হয় এই কারণে। (Nedell, 1981; Dessent, 1987; Dyson, 1990)

(iii) **পাঠক্রমের সীমাবদ্ধতা** (Limitations in the Curriculum) : এই বিশেষ শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিশুদের মতো একই গতিতে এগোতে পারে না। অনেক সময় কোনো অংশের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষণের প্রয়োজন হয়। কখনও আবার পদ্ধতিগত পরিবর্তনও প্রয়োজন হয়। সাধারণ শ্রেণিকক্ষে এই পরিস্থিতিগুলি সমস্যার আকার নেয়।

(iv) **শ্রেণিকক্ষের সমস্যা** (Problem in the Classroom) : ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, সেখানে প্রতিটি শ্রেণিতে অন্তত পক্ষে ৪০ জন্য শিক্ষার্থী থাকে, যা বেশি হলে ৬০-৬৫ও হতে পারে। শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায় রেখে সকল শিক্ষার্থীকে সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

তাই সফলভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণে সহায়তা করতে চাইলে এই সমস্যাগুলিকে দূরীভূত করতে হবে। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিশেষ শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা এখনও Formative স্তরে রয়েছে। তাই সমস্যা থাকলেও থেমে যাওয়া চলবে না।

নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check Your Progress) :

(১) সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :

(ক) অন্তর্ভুক্তিকরণের দুটি উদ্দেশ্য লেখো।

(খ) অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রধান তিনটি স্তম্ভ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

(গ) শিক্ষকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করো যা বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

(ঘ) পিতা-মাতার ভূমিকা বিশেষ শিশুর শিক্ষায় কি গুরুত্বপূর্ণ? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

(ঙ) সহপাঠীরা কি বিশেষ শিশুর শিক্ষায় সহায়তা করতে পারে? কীভাবে?

(চ) ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো দুটি বাধা কী কী?

৬.৪ অসক্ষমতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কৌশলের প্রয়োজনীয় নমনীয়তা (Inequality and Diversity in Indian classroom : Pedagogical and Curriculum Concerns– Scope for Flexibility as and when Required)

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তবে ভারতবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে এক-একটি বিদ্যালয়ে মাত্রা ছাড়া শিক্ষার্থী। তার উপর যখন অন্তর্ভুক্তির (Inclusion) জন্য বিশেষ শিশুরাও একই শ্রেণিতে যোগ দেয় তখন এই অসমতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রেণিকক্ষে, সঠিকভাবে শ্রেণি পরিচালনা করার জন্য

নমনীয়তা প্রয়োজন পাঠক্রমে ও শিক্ষণ কৌশলে, কীভাবে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কাজটি করবেন তার একটা ধারণা এখানে দেওয়া হল।

(i) শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি (Developing Teaching Skills of Teacher) :

National Curriculum for Teacher Education, ১৯৯৮ সালে সুপারিশ করেছে শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে (Curriculum on teacher Education) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি আবশ্যিক করতে হবে। তবেই শিক্ষক বিশেষ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ করতে সমর্থ হবেন এবং সঠিক পথে তাদের শিক্ষা দিতে পারবেন। যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন আবিষ্কার এই ক্ষেত্রটিকে উন্নীত করছে তা নতুন উপলব্ধি জ্ঞান শিক্ষক পেতে পারেন স্বল্পসময়ের কোনো In-service প্রশিক্ষণ থেকে।

(ii) চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাদান ও নির্দেশনা দান (Imparting need based Education & Counselling) :

অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল, এই সমস্ত শিশুদের শ্রেণি পরিবেশে অভ্যস্ত করে তোলা। প্রত্যেকটি শিশুর চাহিদা ভিন্ন কারণ তাদের প্রতিবন্ধকতা এক নয়। সবার একই ধরনের সহায়তারও প্রয়োজন হয় না। তাই শিক্ষককে শিক্ষাদান করতে হবে শিশুর প্রয়োজন বুঝে। সকলকে একটি পদ্ধতিতে, একটি বিষয় একই গতিতে শেখালে বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

(iii) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা (Infrastructural Planning in the School) :

প্রতিটি বিশেষ শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চাহিদাও স্বতন্ত্র। যেমন— শারীরিক অক্ষমতাযুক্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ে wheel chair, র‍্যাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আবার যারা ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন তাদের বিদ্যালয়ে কোথায় কী আছে জানিয়ে রাখতে হবে আর ছাদ, সিঁড়ি, জলাশয় ইত্যাদি থেকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে।

(iv) পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি হবে নমনীয় (Flexible Curriculum and Co-Curricular Activities) :

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সকল সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার্থীদের একই পাঠক্রমের সাহায্যে একইরকম শিক্ষাদান করা। তবে বিশেষ শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা একরকম নয়, তাই সময়ের নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সাধারণ শিশুদের মতো এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের সমস্ত সংবেদনের ক্ষেত্রগুলি কাজ করে না। তাই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ বিশেষ শিশু তখনই করবে যখন সে তার উপযোগী কাজ পাবে।

(v) সহপাঠীর দ্বারা শিখন (Peer Tutoring) :

অনেক ক্ষেত্রে এই বিশেষ শিশুরা স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া করে না। শিক্ষকের চাইতে তারা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত তাদের সহপাঠীদের কাছে, তাই শিক্ষক শ্রেণিতে ভালো শিক্ষার্থীদের ও বিশেষ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি দলগঠন করতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীরা সমবয়স্ক সহপাঠীদের কাজ থেকে বিষয়বস্তু আরও ভালো করে জেনে নিতে পারেন।

(vi) বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলার নমনীয়তা (Flexibility in Rules & Discipline in School) :

একেবারে সময়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ, টিফিন টাইম ছাড়া খেতে না চাওয়া, প্রতিদিনের গৃহকাজ করে আনা, নিজেকে যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্যাবলি সাধারণ শিশুর জন্য যতটা সহজ বিশেষ শিশুর ক্ষেত্রে তা নয়, তাই তাকে বহিষ্কার বা তিরস্কার না করে বরং বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে তারা নিয়ম অনুসারে চলতে চেষ্টা করে।

(vii) বিশেষ শিক্ষণ কৌশল (Special Teaching Strategy) :

সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য সবসময় সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষার্থীর চাহিদা বুঝে সেই অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি নির্বাচন করা হয়।

(viii) গঠনমূলক মূল্যায়ন প্রয়োগ (Application of Formative Evaluation) :

বিশেষ শিক্ষার্থীরা কতটা শিখেছে তা মূল্যায়নের জন্য গঠনমূলক মূল্যায়ন করতে হবে শিক্ষককে। এই প্রক্রিয়া হবে ধারাবাহিক অর্থাৎ কিছু বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পরই শিক্ষার্থীর অগ্রগতি হচ্ছে কি না তা দেখে নিতে হবে। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি দেখে শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন যে শিক্ষার্থীকে নতুন বিষয় অধ্যয়ন করাবেন নাকি পুরোনো বিষয়টিকেই আবার পড়াবেন।

(ix) বহু ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার (Using Multi-Sensory Organs) :

বিশেষ শিক্ষার্থীদের কোনো-না-কোনো সংবেদনের ইন্দ্রিয় অক্ষম হতে পারে। যেমন— ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও ব্যাহত শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আবার যাদের অস্থিসংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংবেদনই সঠিকভাবে ঘটে। তাই শিক্ষার্থীকে শেখানো প্রয়োজন কীভাবে বেশি সংখ্যায় সংবেদনের ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করতে হবে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে।

(x) তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (Using Information Technology) :

বিশেষ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নানারকম প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। যেমন— audiometer, braille, ramp, talking calculator শিক্ষকের এই বিশেষ প্রযুক্তিগুলির জ্ঞান থাকবে যাতে শিক্ষার্থীর অক্ষমতা অনুযায়ী তিনি এই প্রযুক্তিগত উপকরণগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

xi) সহপাঠক্রমিক ও সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলির প্রয়োগ (Application of Co-curriculum Activities & Cultural Activities):

বিশেষ শিশুদেরও বিশেষ কিছু গুণাবলী থাকতে পারে এবং সকলেই পড়াশোনায় সমান আগ্রহী নাও হতে পারে। তাই শিক্ষকদের উচিত বিশেষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই সুপ্ত সম্ভাবনা খুঁজে বের করা যা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আরো পরিশীলিত রূপ পাবে।

উপরোক্ত এই পদক্ষেপগুলি ছাড়া আরো কিছু সাধারণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যেগুলি বিভিন্ন মাত্রার ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(i) মানবশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের সমন্বয় (Assimilation of Man Power Resources & Material Resources) :

বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে শুধু মানবসম্পদ নয়, তার সাথে বস্তুগত সম্পদ ও বিভিন্ন সংস্থাকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। মানবসম্পদ হিসেবে শিক্ষক, বিদ্যালয়ের অন্যান্য স্টাফ, বাড়ির অভিভাবক (care giver) সকলকে বোঝাচ্ছে। বস্তুগত সম্পদ বলতে বোঝায় সেইসব উপকরণ ও পরিকাঠামো যা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন সংস্থা, যেমন— জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিশেষ বিদ্যালয় ইত্যাদি। এই তিনটি ক্ষেত্রের সমন্বিত প্রয়াসে বিশেষ শিক্ষা সফল করার প্রচেষ্টা করা হয়।

(ii) বিশেষ পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Special Curriculum) :

বিশেষ শিশুদের পাঠক্রমের প্রকৃতি কেমন হবে সেই সম্পর্কে Brennan (1985) চারটি সুপারিশ করেন। সেইগুলি হল—

(ক) সব ধরনের বিশেষ শিশুরা পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতা বুঝবে অর্থাৎ বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে।

(খ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(গ) শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য ও বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পাঠক্রম গঠন করা হবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের কাছে শিখনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে পাঠক্রমের মাধ্যমে।

(iii) মূল্যবোধের শিক্ষা (Value Education) :

একসঙ্গে বিশেষ ও সাধারণ সমস্ত শিক্ষার্থীকে একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে এই দুইটি দলের শিক্ষার্থীরা ক্ষমতার দিক থেকে আলাদা। সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ না ঘটলে একত্রে এই দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান সম্ভব হবে না। বিভিন্ন দলগত কার্যাবলি (group activities) তাদের দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি বিকশিত হয়।

- **নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your progress)**

(১) সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা কীভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রেণিকক্ষে বিশেষ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে?

(খ) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা বিশেষ শিক্ষার্থীদের কি উপায়ে সাহায্য করে?

(গ) পাঠক্রমের নমনীয়তা বিশেষ শিশুদের জন্য কেন প্রয়োজন?

(ঘ) সহপাঠী দ্বারা শিক্ষণ বলতে কি বোঝ? এখানে শিক্ষক কে এবং শিক্ষার্থী কে?

(ঙ) বিশেষ শিশুদের শিক্ষায় বিদ্যালয়ের নিয়মাবলিতে নমনীয়তা কি প্রয়োজন? কেন?

(চ) কি ধরনের মূল্যায়ন বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি উপযুক্ত? কেন?

(ছ) তথ্যপ্রযুক্তি কি বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে তরান্বিত করতে পারে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৬.৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল্যায়নের প্রকৃতি অন্বেষণ (Understanding and Exploring the Nature of Assessment for Inclusive Education)

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হয় শিক্ষাগত পারদর্শিতা ও প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের মূল্যায়ন বিশেষ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ শিশুদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে (Individually) শিক্ষার্থী কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পেরেছে সেটাই বিচারযোগ্য। বিশেষ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির এখানে বর্ণনা দেওয়া হল—

(i) অপ্রথাগত মূল্যায়ন (Informal Assessment) :

অপ্রথাগত মূল্যায়ন নির্ভর করে কয়েকটি উপাদানের উপর। যেমন— সফলতার সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের কাজ করা, বিভিন্ন ব্যক্তিগত বা দলগত কাজে অংশগ্রহণ, নিয়মিত উপস্থিতি, গৃহকাজ সম্পন্ন করা ইত্যাদি। বিশেষ শিক্ষার্থীরা এই কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হলে এবং সেই অনুযায়ী Feedback পেলে, শিক্ষার্থীর আচরণ শক্তিশালী বা Reinforced হয়, যা তাকে পরবর্তী আচরণ সম্পাদনে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতিতে যে শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করে তাদের উৎসাহদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে আর মৌখিক প্রশংসাও এক্ষেত্রে কার্যকরী।

(ii) পোর্টফোলিও অ্যাসেসমেন্ট (Portfolio Assessment) :

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে Portfolio Assessment অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অগ্রগতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়, যা তাদের মধ্যে প্রেরণা জোগায়। Portfolio সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও শিখন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করেন। অনেকটা সময় ধরে শিক্ষার্থী যে কাজগুলি সম্পাদন করে সেইগুলি শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনা করে নথিভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয় শিক্ষার্থী বাস্তবে কি কাজ করতে পারছে, সেটা কতটা Portfolio support করছে আর কতটা শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে। পোর্টফোলিও শিক্ষক তৈরি করতে পারেন, তার শিক্ষার্থীর সহযোগিতায়।

(iii) নিজের মূল্যায়ন ও সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়ন (Self-Assessment and Peer Assessment) :

বিশেষ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে দুই ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, শিক্ষার্থী নিজের মূল্যায়ন নিজেই করবে। এখানে যেহেতু শিক্ষার্থী নিজেই নিজের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করছে ফলে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। একইসঙ্গে সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়নও শিক্ষার্থীকে নিজের পারদর্শিতা সম্পর্কে অবহিত করে। স্ব-মূল্যায়নের মতো সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের Feedback দেয় এবং পারদর্শিতাকে তুলে ধরে (Vena, 2000)। বিভিন্ন দলগত কাজ (group work) ও প্রকল্পে (Project work) শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও সহযোগিতামূলক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে। এই সময়েই তারা একে অপরকে মূল্যায়ন করতে থাকে।

(iv) বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পরীক্ষা ব্যবস্থা (Special Examination System for the Special Students) :

বিশেষ শিশুদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাদের অক্ষমতার ফলে তারা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংস্কার করতে হবে যাতে বিশেষ শিক্ষার্থীরা কোনো বাধা ছাড়াই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। কীভাবে এই বিশেষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া যায় তা নীচে বর্ণিত হল—

(ক) শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও ব্যাবহারিক উপায়ে নিজের পারদর্শিতা দেখানোর সুযোগ থাকবে।

(খ) সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাইতে এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের আরও বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন। এদের মনোযোগ সংক্রান্ত নানারকম সমস্যা থাকে তাই তাদের নির্জন স্থানে পরীক্ষা নিলে ভালো হয়।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার জন্য একটা বড়ো প্রশ্ন না করে কয়েকটি ছোটো প্রশ্ন করা যেতে পারে।

(ঘ) যদি কোনো দৈহিক অক্ষমতার কারণে লিখতে অসুবিধে থাকে সেই শিক্ষার্থীর জন্য অণু-লেখক (Scribe) ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যে শিক্ষার্থীর হয়ে লিখতে পারবে।

(ঙ) যে সমস্ত শিক্ষার্থীর প্রথাগত মূল্যায়নে অসুবিধে আছে তাদের জন্য ধারাবাহিক সামগ্রিক মূল্যায়নের (Continuous Comprehensive Evaluation) ব্যবস্থা করা হবে, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজ ও আচরণের উপর ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে থাকবেন।

(v) প্রতিযোগিতামূলক পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত সুযোগদান (Adequate Provision of the Specially Abled Person for Participating in Competitive Public Examinations)

বিশেষ শিক্ষার্থীরা কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রাথমিকভাবে— মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এমনকী বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রেও ন্যূনতম শিক্ষা স্তর (Minimum level of learning) দেখে নেওয়া হয়। অন্তর্ভুক্তিকরণের মানেই হল সকলকে সমসুযোগ দান। তাহলে যারা স্বাভাবিক তাদের মতো করেই বিশেষ শিক্ষার্থীদেরও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থাগুলি এখানে উল্লেখ করা হল—

(ক) বিশেষ শিক্ষার্থীদের যদি বৌদ্ধিক কাজে (Cognitive functioning) কোনো অসুবিধা থাকে, তাহলে তাদের জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

(খ) যে বিশেষ শিক্ষার্থীদের শারীরিক সমস্যা আছে, যেমন — হাতে লেখার সমস্যা বা দেখার সমস্যা তারা স্ক্রাইয়ের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, যে শিক্ষার্থীর হয়ে লিখতে পারবে পরীক্ষায়।

(vi) গঠনগত মূল্যায়ন (Formative Evaluation) :

সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে Formative ও Summative এই দুই প্রকারের মূল্যায়নই করা হয়, তবে দেখা গেছে যে-কোনো শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই গঠনমূলক মূল্যায়ন অনেক বেশি কার্যকরী। বিশেষ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,

কারণ এই মূল্যায়ন অনেক নমনীয় আর শিক্ষা বৎসরের মধ্যে প্রতি এক মাসে বা দুই মাসে এটা নেওয়া যেতে পারে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে Feedback দিলে, শিক্ষার্থী সেই অনুযায়ী পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারে।

(vii) শিক্ষার্থী নিজেই নিজের শিখন লক্ষ্য স্থির করবে (Students will decide their own Learning Objectives) :

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করেন শিক্ষক, সেই অনুযায়ী পাঠদান হয় ও শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়ন হয়। বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নিজের শিখনের লক্ষ্য নিজেই নির্ধারণ করবে তাহলে তার উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হল না। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও ভালো থাকে।

- **আপনার প্রগতি সম্পর্কে জানুন (Check your progress) :**

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১। অপ্রথাগত মূল্যায়ন বলতে কী বোঝ?

২। পোর্টফোলিও অ্যাসেসমেন্ট কীভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণে সাহায্য করে?

৩। শিক্ষকের দ্বারা মূল্যায়ন ও সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়ন, তোমার মতে শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?

৪। বিশেষ পরীক্ষাব্যবস্থা শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের কীভাবে সহায়তা করতে পারে উল্লেখ করো।

৫। গঠনমূলক মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন ব্যাখ্যা করো।

৬.৬ সারসংক্ষেপ (Summary) :

অন্তর্ভুক্তিকরণের শিক্ষা বলতে বোঝায় অক্ষমতা সম্পন্ন, শিখনে সমস্যাসম্পন্ন এবং যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সদস্য তাদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এক ছাদের তলায় শিক্ষাদান। এই শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষামূলক চাহিদা চিহ্নিতকরণ (Identification) এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান বিশেষ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এই শিক্ষার্থীরা যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে পঠন-পাঠনের সুযোগ পায় সেইজন্য প্রয়োজন প্রাক্-বিদ্যালয় সুযোগ-সুবিধা যা শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের অভ্যাসগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে, বিদ্যালয়ের সুযোগ, সামাজিক একটা শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সহায়ক পরিসেবার (Support Services) সুযোগ।

প্রতিটি শিক্ষার্থী, বিশেষ হোক বা সাধারণ— সকলেই শিক্ষার অধিকার রয়েছে কারণ তারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। ভারতবর্ষে বর্তমানে সমস্ত সাধারণ শিক্ষার্থীদেরও সঠিক গুণমানের শিক্ষা দেওয়ার মতো সম্পদ বা পরিকাঠামো নেই। তাই বিশেষ শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষার আওতায় আনা ও সমাজের মূলস্রোতে পৌঁছে দেওয়ার ভাবনাটাই অবাস্তব (Dash, 2006)।

কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষ শিক্ষার্থীর হার বাড়ছে—

Year	Total numbers Identified as CWSN
2002-03	683554
2003-04	1459692
2004-05	1592722
2005-06	2017404
2006-07	2399905
2007-08	2621077

Identification of Children with Special Needs / Source : Sarva Siksha Abhiyan (2007)

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ/উৎস : সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০৭)

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ৪০ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভরতি নেওয়া হয়নি তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি আর সাধারণ শিশুদের অভিভাবকদের অযৌক্তিক ভীতির কারণে এই অন্যায় হয়েছিল। উপরন্তু কেউ এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণিকক্ষে আনবার প্রচেষ্টা দেখায়নি। সংবিধানের ৪৬নং সংশোধনে, ২০০২ সালে আইনে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের স্থান দিয়ে এখানে বলা হয়েছে ৬-১৪ বছরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। তাই বিশেষ শিশুদের শিক্ষা বর্তমানে একান্ত জরুরি একথা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

সর্বশেষে বলা যায়, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিকরণ শুধুমাত্র বিশেষ বিদ্যালয়ের (Special school) বিকল্প ব্যবস্থাই নয়, এটি একেবারেই খরচসাপেক্ষ নয় বরং ভারতবর্ষের মতো দেশে এটি অত্যন্ত উপযুক্ত। যদিও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমন্বিত বিদ্যালয়ে (Inclusive schools) আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, তবু এখনও প্রায় ৯০% বিশেষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা যায়নি। আর যে বিদ্যালয়গুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) চালু করেছে তাদেরও পরিকাঠামোমূলক সুযোগসুবিধা, প্রশিক্ষিত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত নয়। তবে আশার কথা এই যে অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusion) -এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে আজ আর কোনো দ্বিধা নেই। আর সরকার সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে (Inclusive Education) এর ছাতার তলায় আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রয়োজনীয় ধারণা (KEY CONCEPTS) :

অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusion)

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে যদি একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা পায়, তাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ বা Inclusion বলে।

বহির্ভূতকরণ (Exclusion) :

একজন ব্যক্তি বা দল যদি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বঞ্চিত থাকে, এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বহির্ভূতকরণ বা Exclusion।

সমন্বয়ন (Intergration) :

বিশেষ শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার আগে যদি শ্রেণিকক্ষের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তারপর শ্রেণিকক্ষে আনা হয় এই পদ্ধতিকে সমন্বয়ন বলা হয়।

অপ্রথাগত মূল্যায়ন (Informal Evaluation) :

যখন সফলতার সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের কাজ করা, বিভিন্ন ব্যক্তিগত বা দলগত কাজে অংশগ্রহণ, নিয়মিত উপস্থিতি, গৃহকাজ সম্পন্ন করা ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়, সেই পদ্ধতিকে বলে অপ্রথাগত মূল্যায়ন।

সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়ন (Peer Evaluation) :

যখন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা শিক্ষার্থী দ্বারাই মূল্যায়ন হয় তাকে সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়ন বলা হয়। একই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একে অন্যের শিক্ষামূলক পারদর্শিতার মূল্যায়ন করে।

৬.৭ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১। অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে কী বোঝ?

২। অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বহির্ভূতকরণের মধ্যে তুলনা করো।

৩। অন্তর্ভুক্তিকরণ কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৪। অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া বিশ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৫। ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রেক্ষাপটটি সবিস্তারে আলোচনা করো।

৬। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়ের ধারণাটি ব্যক্ত করো।

৭। অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সমন্বয়নের ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। তোমার মতে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য?

৮। ভারতবর্ষের শ্রেণিকক্ষে অসমতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় কেন?

৯। অন্তর্ভুক্ত শ্রেণিকক্ষের (Inclusive Classroom) অসমতা ও বৈচিত্র্যকে শিক্ষার দ্বারা কীভাবে দূরীভূত করা যায়?

১০। বিশেষ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন বা Assessment কীভাবে করা হয়? যে-কোনো দুটি পদক্ষেপ সংক্ষেপ লেখো।

গ্রন্থপঞ্জি (References)

1. Dessent, T. (1987); Making the Ordinary School Special, Flamer, London.
2. Dyson, A (1990); Special Educational Needs and the Concept of Change. Oxford Review of Education, London
3. Nedell, K (1981); Concepts of Special Educational Needs, Education Today 31 (1), 3-9
4. দেবাশীষ পাল (২০১৫), প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণে সমকালীন শিক্ষা; রীতা পাবলিকেশন।

অধ্যায় ৭

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু
(CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)
৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৭.২ ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Visual Impairment – Identification, Assessment and Teaching Strategies)
৭.৩ ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Auditory Impairment – Identification, Assessment and Teaching Strategies)
৭.৪ মৃদুমাত্রার মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Mild Mental Retardation – Identification, Assessment and Teaching Strategies)
৭.৫ দৈহিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Orthopedically handicapped – Identification, Assessment and Teaching Strategies)
৭.৬ বিভিন্ন শিখন অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা (Approaches and Skills Required for Teaching Children with Learning Difficulties)
৭.৭ সারাংশ ও প্রয়োজনীয় ধারণা (Summary and Key Concepts)
৭.৮ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

যে-কোনো দেশে অগ্রগতির একটি বড়ো হাতিয়ার হল শিক্ষা। এই শিক্ষা হবে সার্বজনীন, ভারতবর্ষের সংবিধানে ৪৫ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে এই কথাটি নির্দেশিত আছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজের অন্যান্য মানুষের চাইতে স্বতন্ত্র, এই বৈশিষ্ট্য হতে পারে দৈহিক, মানসিক বা সামাজিক, এদেরকে বলা হয় ব্যতিক্রমী বা exceptional individual।

আমেরিকার ন্যাশনাল সোসাইটি ফর স্টাডি অফ এডুকেশন (National Society for Study of Education) এর বর্ষপঞ্জিতে (year book) বলা হয়েছে—যে সমস্ত ব্যক্তিরা দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক দিক থেকে গড় বা স্বাভাবিক মানুষের থেকে পর্যাপ্ত পার্থক্য বজায় রাখে এবং যাদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে বলা ব্যতিক্রমী (exceptional) শিশু। (Exceptional Individuals are those who deviates from what is supposed to be average in physical, mental, emotional & social characteristics to such an extent that they require special educational services in order to develop to their various capacity.)

এই ব্যতিক্রমী শিশুরাই বিশেষ শিশু নামে পরিচিত। তাদের বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলা বর্তমান শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সমস্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যবস্থাকেই বলা হয় — Education for Children with Special Needs.

এই বিশেষ শিশুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অক্ষমতাসম্পন্ন (Sensory Impairment) শিক্ষার্থী, এই শিশুরা দুটি প্রধান সংবেদন অর্থাৎ দৃষ্টি ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সমস্যাসম্পন্ন। অর্থাৎ কারও দেখার সমস্যা কারও বা শোনার সমস্যা।

দ্বিতীয়ত, কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে চলাফেরার (Locomotor Disablity) সমস্যাও দেখা যায়, কারো ক্ষেত্রে সমস্যা জন্মগত কারও বা অর্জিত, অর্থাৎ কোনো দুর্ঘটনার ফলে শারীরিক ত্রুটির সৃষ্টি হয়। এদেরকে Orthopedically Challenged বলা হয়, অনেক সময় দুর্ঘটনার ফলে Brain paralysis-ও হতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণির বিশেষ শিশুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সেই সমস্ত শিশু যাদের বুধ্যাঙ্ক (Intelligence Quotient বা I.Q.) কম হওয়ার দরুন তারা মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা cognitive disorder সম্পন্ন। এদের সাধারণ লক্ষণগুলি হল—এরা অমনোযোগী (inattentive) ও অতিরিক্ত চঞ্চল (hyperactive)।

বিশেষ শিশুদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল সেই সমস্ত শিক্ষার্থী যাদের মধ্যে শিখনে অসমর্থতা দেখা যায়, এদের মধ্যে পঠন, লিখন ও গাণিতিক সমস্যা দেখা যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা, ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা, মৃদুমাত্রার মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, দৈহিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও বিভিন্ন শিখন অসমর্থতা সম্পর্কে জানবো; উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে।

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই অধ্যায়টি পড়বার পরে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকেরা—

- ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে।
- ব্যাহত শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণে সমর্থ হবে।
- দৈহিক সমস্যা সংক্রান্ত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণে সমর্থ হবে।
- মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিনতে পারবে।
- শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিনতে পারবে।
- ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন/ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন/দৈহিক সমস্যাসম্পন্ন/মৃদুমাত্রায়/শিখনে অক্ষম ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিখনে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা বুঝে শিখনে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।
- ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানে সহায়তা করতে পারবেন।
- মৃদু মানসিক সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা অনুযায়ী শিক্ষক তাদের শিক্ষালাভে সহায়তা করতে পারবেন।
- শিখন অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন সমস্যা বুঝে শিক্ষক তাদের শিক্ষায় সহায়তা করবেন।
- অস্থিসংক্রান্ত সমস্যা যাদের আছে তাদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষা দিতে পারবেন।

৭.২ ব্যাহত দৃষ্টিভঙ্গি শিশুদের চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Identification, Assessment and Educational Strategy of Visually Impaired Children)

৭.২.১ ভূমিকা (Introduction) :

ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের সমস্যা হল মূলত চোখে দেখার সমস্যা, দর্শনমূলক অক্ষমতা বা Visual Impairment এমন একটি সমস্যা যা চিকিৎসা বা correction-এর পরেও শিশুর সাধারণ কাজ কর্মে ও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। যে সমস্ত শিশু চিকিৎসার পরে আংশিক হলেও চোখে দেখতে পায় তারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়, এরা হলেন কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (low

vision) বা আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (partially sighted), এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সেই সমস্ত শিশুরা যারা চোখে একেবারেই দেখতে পায় না এবং জীবনধারণের জন্য আলোচ্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।

ভারতবর্ষে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদেরকে বিশেষ শিশুর শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশেষ শিক্ষক আছেন যাঁরা এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষার কার্যে নিয়োজিত, ২০১২-তে পি.টি.আই.-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ৩৯ মিলিয়ন। যার মধ্যে ভারতেই এই সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন যা প্রায় বিশ্বের কুড়ি শতাংশ।

৭.২.২ সংজ্ঞা (Definition) :

'ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন'—ধারণাটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— ব্যাবহারিক দিক থেকে যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ১/২০ ভাগের কম বা যে ব্যক্তি দেড় মিটার দূরত্ব থেকে আঙুল গুণতে পারে না, তাকে ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয় (International Association for the Prevention of Blindness)।

অতীতে যে-কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই অভিশাপ মনে করা হত। তবে বর্তমানে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এবং এর ফলে এই অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার চাহিদাও বাড়ছে। সাধারণত দেখা যায় যে সমস্ত জায়গায় শিক্ষার হার কম, সেই সমস্ত জায়গায় মানুষ এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে বেশি কুসংস্কারগ্রস্ত।

- **নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your Progress)**

Exercise : শুন্যস্থান পূরণ করো :

(১) ২০১২ তে পি.টি.আই.-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা __________ মিলিয়ন।

(২) ভারতবর্ষে বিশ্বের ____________ শতাংশ ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ বসবাস করে।

(৩) ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ________________ মিটার দূরত্ব থেকে সঠিকভাবে দেখতে পায় না।

- **ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্নদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Visually Impaired) :**

দৃষ্টিহীনদের সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই চারটি শ্রেণি হল—

(ক) জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (Blindness acquired before the age of five) :

প্রতিটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক কল্প (Visual Image) তৈরি হয়, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ধারণা তৈরি হয়। দুর্ভাগ্যবশত যারা জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারায় তারা দর্শনের উপর ভিত্তি করে মানসিক কল্প সৃষ্টি করতে পারে না।

(খ) পাঁচ বছর বয়সের পরের দৃষ্টিহীনতা (Blindness acquired after five years of age) :

এই সমস্ত শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানসিক কল্প সৃষ্টি করতে পারে যা তার পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সহায়তা করে।

(গ) জন্ম থেকে দৃষ্টিহীনতা (Congenital Blindness) :

জন্মের আগের ভ্রূণ অবস্থার সমস্যা বা জন্মকালীন কোনো অস্বাভাবিকতার ফলে এই দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণির শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুর দর্শন ইন্দ্রিয়জনিত কোনো ধারণা বা অনুভূতি থাকে না।

(ঘ) দুর্ঘটনাজনিত দৃষ্টিহীনতা (Accidental Visual Impairment) : যদি কোনো স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন, মানুষ কোনো দুর্ঘটনার ফলে দৃষ্টিশক্তি হারান তাকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যে চারটি শ্রেণির ব্যাহত দৃষ্টি সম্পন্নতা আলোচনা করা হল তার প্রতিটি একটি অন্যটির চাইতে স্বতন্ত্র, তাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

- **নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check Your Progress)**

(ক) ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন শ্রেণিগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৭.২.৩ ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Visually Impairment) :

যে-কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে তা হওয়া উচিত প্রয়োজনভিত্তিক। প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ। যে দশটি লক্ষণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল—

(ক) এই সমস্ত শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে একা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। এই চলাফেরার অসুবিধা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

(খ) শিক্ষার্থীদের বারবার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে।

(গ) শিক্ষার্থীদের লাল ও ফোলা চোখ একটি সাধারণ দর্শনজনিত সমস্যা।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের চোখের দৃষ্টির সচলতায় (Eye movement) সামঞ্জস্যের অভাব (Lack of synchronization) দেখা যায়। একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে চোখের দৃষ্টি সরে লাফিয়ে লাফিয়ে।

(ঙ) পাঠ্য বইয়ে ছাপার অক্ষর অনেক সময় ছোটো হয়। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তুলনায় ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করে।

(চ) এই শিক্ষার্থীরা কোনো ছবি বা লেখার সূক্ষ্ম দিকগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে না।

(ছ) একটানা অনেকক্ষণ দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনো কর্ম সম্পাদন করতে পারে না, অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

(জ) কোনো বিষয়বস্তু আরও ভালো করে দেখার জন্য মাথা ঠেকিয়ে দেখার চেষ্টা করে আর চোখের দৃষ্টি চারদিকে ঘোরাতে থাকে।

(ঝ) এই সমস্ত শিক্ষার্থী দুটি চোখের সমান ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না। দুটি চোখে সমস্যা দু-রকম হলে এই শিক্ষার্থীরা দুটি চোখের একই রকম ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না।

(ঞ) শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝেই মাথাযন্ত্রণা ও চোখে সংক্রমণের অভিযোগ করে।

সাধারণভাবে এই সমস্যাগুলির উপস্থিতি ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণে সহায়তা করে। তিনটি প্রধান পদ্ধতির মাধমে এই শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ করা সম্ভব। এই পদ্ধতিগুলি হল—

(i) শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণ (Classroom Observation)

(ii) চোখের পরীক্ষা (Opthalmological Examination)

(iii) দর্শনমূলক স্ক্রিনিং (Visual Screening)

- **নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your Progress)**

নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও—

(ক) ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণের যে-কোনো দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করো।

(খ) শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষার্থী যদি মাঝে মাঝে মাথাযন্ত্রণার অভিযোগ করে, শিক্ষক হিসেবে তুমি কী করবে?

(গ) যে-কোনো একটি লক্ষণ বলো যার দ্বারা খুব সহজেই ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুকে চেনা যায়।

৭.২.৪ ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি (Teaching Strategies for the Visually Impaired Children)

(১) **চলাফেরায় সহায়তা দান (Helping in Mobility) :** সাধারণভাবে চলাফেরায় সহায়তাদানের জন্য শিক্ষার্থীকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করতে হবে, যা তাকে চলাফেরায় সাহায্য করবে, এ ছাড়াও সহায়ক হিসেবে কোনো ব্যক্তি, প্রশিক্ষিত কুকুর বা লাঠিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) **শ্রবণ দক্ষতার প্রশিক্ষণ (Training of Listening Skill) :** ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুরা শ্রবণমূলক সংবেদনের উপর নির্ভর করে। মনোযোগী হয়ে শব্দের উৎস শুনে তার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি বেছে নেওয়া—শ্রবণ দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **ব্রেইলের ব্যবহার (Braille) :** ব্রেইল হল যোগাযোগের (communication) এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একটি কাগজের মধ্যে কিছু উঁচু উঁচু ডট বা বিন্দু থাকে। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বা দৃষ্টিহীন শিশুরা এই উঁচু বিন্দু ছুঁয়ে বুঝতে চেষ্টা করে বর্ণ বা সংখ্যাটিকে, এবং একটি সংখ্যা বা বর্ণ বোঝাতে বিন্দুগুলি এক এক রকমভাবে সাজানো থাকে, বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কম্পিউটারের কোনো টেক্সট (Text file) বিশেষ প্রিন্টারের সাহায্যে ব্রেইলে পরিবর্তন করা যায়।

(৪) **বিভিন্ন পাঠের বিষয়কে বড়ো করে দেখানোর প্রযুক্তির ব্যবহার (Enhanced Image Devices) :** অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা সাধারণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন সম্পন্ন করতে পারে যদি তাদের সামনে পাঠ্য বিষয়বস্তুগুলি বড়ো করে উপস্থাপন করা যায়, ওভার হেড প্রোজেক্টার এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) **শ্রবণমূলক উপাদান (Audio aids) :** এই সমস্ত শিশুদের দেখার সমস্যা থাকলেও শোনার ক্ষমতা অন্যদের মতোই থাকে। তাই Talking Books ও Talking Calculator ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৬) **নির্ভুল জ্ঞান অর্জন (Acquisition of Accurate Knowledge) :** অনেক সময় ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য মডেল বা বিষয়ের প্রতিরূপ ব্যবহার করা হয়। এই প্রতিরূপ (replica) যদি সঠিকভাবে তৈরি না হয় তবে বাস্তবের বিকৃতি (Distortion of Reality) ঘটতে পারে। শিক্ষককে শিক্ষাদানের সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে।

(৭) **সামগ্রিক ধারণা গঠন (Developing a Comprehensive Concept) :** দৃষ্টিহীনতার জন্য শিশুর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ধারণা বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে, শিক্ষকের কাজ চেষ্টা করা যাতে এই বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলি সমন্বয়িত হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থী কোনো বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

একটি দেশ কখনোই উন্নত হতে পারে না যদি শিক্ষার সুযোগ সকল নাগরিক না পায়। তাই ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও যাতে শিক্ষায় সমসুযোগ পায় সেটা দেখার দায়িত্ব সরকারের ও শিক্ষিত জনগণের। বর্তমানে প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে যা ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরও সহায়তাদানে ব্যবহার করা যায়।

- **নিজের অগ্রগতি জানো (Check your Progress) :**

খুব সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(১) শ্রবণমূলক দুটি উপাদানের নাম উল্লেখ করো যা দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।

(২) Braille কীভাবে ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে?

(৩) ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নদের শ্রবণ ক্ষমতার প্রশিক্ষণ কেন প্রয়োজন?

৭.৩ ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ মূল্যায়ন, ও শিক্ষণ পদ্ধতি :

৭.৩.১ ভূমিকা (Introduction) :

ভারতবর্ষে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রায় ৬ কোটি।

বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে অনেক ব্যাহত শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছে। সমস্যার মাত্রা কম হলে তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্যার মাত্রা বেশি হলে সেই সমস্ত শিশুর জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, বিশেষ উপকরণ, বিশেষ শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ সালে এই বিশেষ শিশুদেরও শিক্ষায় সমান অধিকারের উল্লেখ আছে। তাই সরকারের তরফের প্রচেষ্টাও বেড়েছে।

৭.৩.২ সংজ্ঞা (Definition) :

বধিরতার অর্থ হল গুরুতর শ্রবণজনিত সমস্যা, যার ফলে, ভাষার মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Information Processing) সম্ভব হয় না। কোনো স্বরবিবর্ধক যন্ত্র (Amplifier) ব্যবহারেও সহায়তা পাওয়া যায় না, যার ফলে শিশুর শিক্ষামূলক পারদর্শিতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। [‘Deafness’ means a hearing impairment that is so severe that the child is impaired in processing linguistic information through listening, with or without amplification, that adversely affects a child’s educational performance (Individuals with Disabilities Education Act, 1990)].

শ্রবণজনিত সমস্যার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Hearing Impaired)

শ্রবণজনিত সমস্যাকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- প্রথমত শ্রবণজনিত সমস্যার পরিমাণের (Degree of Hearing Loss) উপর ভিত্তি করে।
- দ্বিতীয়ত আঙ্গিক ত্রুটির (Organic Impairedness) উপর ভিত্তি করে।

শ্রবণজনিত সমস্যার উপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদিকে যারা সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তিহীন, অপরদিকে যাদের শুনতে অসুবিধা হয়। সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তিদের সমস্যা অপর শ্রেণির তুলনায় গুরুতর। কোনো ভাষা যেহেতু তাদের কানে এসে পৌঁছায় না, কোনো বাচনিক ভাষা তারা বুঝতে পারে না। এর ফলে কোনো তথ্য সংগ্রহের জন্য সংবেদনের এই অঙ্গকে তারা ব্যবহার করতে অক্ষম হয়। অপরদিকে যারা কিছুটা হলেও শুনতে পায় কোনো স্বরবিবর্ধক যন্ত্র (Amplifier) ব্যবহার করে ভাষার মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে (Processing Information Through Language) সক্ষম হয়, তাই এদের প্রশিক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ ও কার্যকরী।

আঙ্গিক ত্রুটির জন্য শ্রবণের যে সমস্যা দেখা যায়, তা দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি কন্‌ডাক্‌টিভ অপরটি সেনসরিনিউরাল (Conductive and Sensorineural)। কানের বাইরের বা মধ্যবর্তী অংশে (outer and middle sections) যদি বাধা (blockage) বা কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তা থেকে কনডাকটিভ শ্রবণজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার যদি কানের একেবারে অভ্যন্তরীণ কোনো অংশ (inner ear) ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা শ্রবণের জন্য যে স্নায়ুগুলি (auditory nerve) প্রয়োজন, সেগুলি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেনসরিনিউরাল শ্রবণজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তিরা সেনসরি নিউরাল শ্রবণজনিত সমস্যাসম্পন্ন, তাদের সমস্যা আবার অন্য শ্রেণির তুলনায় গুরুতর।

এ ছাড়াও ব্যক্তির শ্রবণজনিত সমস্যা কখনো জন্ম থেকেই দেখা যায় আবার কারো কারো ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কোনো দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণেও শ্রবণের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই দুই শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা যায়। কথা বলা একটি সামাজিক আচরণ, এই আচরণ শিশু গৃহপরিবেশে বড়োদের অনুকরণের মাধ্যমে শেখে, কিন্তু যে শিশুরা জন্ম

থেকে শুনতে পায় না তাদের বাচনিক বিকাশ ঘটে না, পরবর্তীকালে তারা মূক বলে পরিগণিত হয়। যে শিশুরা জন্মের কয়েক বছর পরে অসুস্থতার কারণে বা কোনো দুর্ঘটনার ফলে শ্রবণশক্তি হারিয়েছে তাদের বাক্‌শক্তির বিকাশ ততদিনে হয়ে গেছে, তাই এদের শিক্ষাদানের সমস্যা ততটা গুরুতর নয়।

৭.৩.৩ ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of Educating the Hearing Impaired Children) :

শ্রবণশক্তি যাদের নেই বা অত্যন্ত কম তাদের শিক্ষার বিশেষ কিছু লক্ষ্য আছে, সেগুলি এখানে আলোচনা করা হল।

- পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও বজায় রাখার মাধ্যম হল ভাষা, তাই এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল ভাষার বিকাশসাধন করার চেষ্টা করা যার মাধ্যমে শিশুর চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে।

- ভাষার বিকাশ হলে শিশু আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হবে। তাই কোনো বিষয়বস্তু পড়ার প্রশিক্ষণ ও লেখার প্রশিক্ষণ দেওয়া এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

- অন্যের ভাষা বুঝতে গেলে তা শুনতে হবে, তাই শ্রবণ ইন্দ্রিয় কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন শ্রবণের প্রশিক্ষণ বা auditory training। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। তা ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে, শক্তিশালী অডিয়োমিটারে (Audiometer) পরিমাপ করে দেখা গেছে, জন্মগতভাবে যাদের কথা বলা ও শোনায় সমস্যা আছে বা সম্পূর্ণ মূক ও বধির বলে ভাবা হত, তাদের বেশিরভাগ শিশুই সম্পূর্ণ বধির নয়। তাই বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের ক্ষীণ শ্রবণশক্তিকে শিক্ষার কাজে লাগানো যায়। কানে শোনার যন্ত্র বা Hearing aid-এর মাধ্যমে এই বিশেষ শিশুদের শিক্ষা দেওয়া, ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য।

- এই বিশেষ শিক্ষার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, এই শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, অনেকসময় সাধারণ শিশুদের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে হীনমন্যতায় (Inferiority complex) ভোগে, এই হীনমন্যতা থেকে এই শিশুদের মুক্ত করাও এই শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার আরও একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী কোনো বৃত্তি নির্বাচন করতে সহায়তা করা ও তার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সময় উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তবেই তারা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সমাজের মূলস্রোতে মিশতে সক্ষম হবে।

৭.৩.৪. শ্রবণজনিত সমস্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা উপসর্গ (Potential signs of Hearing Impairments) :

যে সমস্ত শিশুদের কথা শুনতে বা কোনো শব্দ শুনতে অসুবিধা থাকে বা কথা বলার কোনো সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাগুলি শিশুর শিক্ষামূলক ক্ষমতাকে অনেকখানি ব্যাহত করে তোলে। শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষার্থীর নানা সমস্যা দেখা যায়। সেইজন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকার এই বিশেষ শিক্ষার্থীর সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এখানে এমন কিছু উপসর্গের কথা উল্লেখ করা হল যা সাধারণত শ্রবণের সমস্যা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। এই উপসর্গগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকলে শিক্ষিকা এই বিশেষ শিশুদের চিহ্নিতকরণে (Identification) সমর্থ হবেন। এই উপসর্গগুলি হল—

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষিকার বাচনিক উপস্থাপন (Oral Presentation) ও নির্দেশনা (Direction) অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় এই শিক্ষার্থীদের।

- শিক্ষিকা বা অন্য কোনো বক্তা যখন কোনো নির্দেশ দেন, এই বিশেষ শিক্ষার্থীরা খুব কাছ থেকে ঠোঁট (lip reading) পড়ে নির্দেশটি বোঝার চেষ্টা করে।

- শিক্ষার্থী শিক্ষিকা বা অন্য বক্তা যিনি কিছু বলেন তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঝুঁকে গিয়ে সেই কথা বোঝার চেষ্টা করে।
- এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার সীমিত আর তাই খুব অল্প শব্দের মধ্যে কথা বলার চেষ্টা করে যা সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে।
- কোনো কথা ভালোভাবে শুনতে পাওয়ার জন্য যতটা জোরে কথা বলা প্রয়োজন ততটা জোরে এই শিক্ষার্থীরা কথা বলে না। প্রয়োজনের তুলনায় এরা আস্তে, দুর্বলভাবে (poor speech sound) কথা বলে।
- এই শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশ ঘটতে বিলম্ব হয় (delayed language development)। সাধারণ শিক্ষার্থীর যে বয়সে ভাষার বিকাশ ঘটে, এদের ক্ষেত্রে তা আরও দেরিতে ঘটে।
- যে-কানো বক্তার ঠোঁট পড়া (lip reading) দেখে শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুসরণ করার চেষ্টা করে, তাই পিছন থেকে ডাকলে এই শিক্ষার্থীরা শুনতে পায় না, তাই সাড়াও দেয় না।
- শ্রেণিকক্ষে বেশিরভাগ নির্দেশদান করা হয় বাচনিক উপস্থাপন বা oral presentation-এর মাধ্যমে, যেহেতু এই শিক্ষার্থীদের শ্রবণের সমস্যা রয়েছে তারা এই সময়ে সাধারণত অমনোযোগী হয়ে যায়।
- কম্পিউটার, রেডিয়ো বা দূরদর্শনের মধ্যে কোনো প্রযুক্তি যদি নির্দেশনা দানের জন্য ব্যবহার করা হয়, এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের প্রবণতা হল প্রতিনিয়ত আওয়াজ বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা।
- ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা অনবরত ভোগাতে থাকে। সেগুলি হল—কানে ব্যথা, চট করে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, কানে কোনো সমস্যা (infection etc.) বা কান দিয়ে জল গড়ানো। এই সমস্যাগুলি নিয়ে শিক্ষার্থীরা অনবরত অভিযোগ জানাতে থাকে শিক্ষিকাকে।

৭.৩.৫ ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্য (Basic duties or Tips for Teachers for dealing Students with Hearing Impairments) :

আগের অংশে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপসর্গগুলি আলোচিত হয়েছে, এই লক্ষণগুলি জানা থাকলে শিক্ষিকা এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হবেন, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বলে চিহ্নিত হবে তাদের প্রতি শিক্ষকের আচরণও হতে হবে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের কিছু পালনীয় কর্তব্য আছে। এই পন্থাগুলি পালন করলে এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা আরও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষকের পালনীয় কর্তব্যগুলি এইখানে উল্লেখ করা হল—

- শিক্ষক/শিক্ষিকা বা অন্য কোনো বক্তার ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অবস্থানগত দূরত্ব যতদূর সম্ভব কম রাখতে হবে।
- কোনো বক্তব্য পেশ করতে হলে বক্তাকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে হবে, জোরে কথা বলার চাইতে যা বেশি জরুরি।
- পারিপার্শ্বিক অন্য কোনো আওয়াজ থাকলে তা যতদূর সম্ভব কম করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বসার জায়গাটি স্থির করা উচিত শিক্ষকের বসার জায়গার কাছাকাছি।
- শিক্ষকের বসা উচিত শিক্ষার্থীর মুখোমুখি যাতে শিক্ষার্থী সামনে থেকে শিক্ষককে দেখতে পায়।
- কথা বলবার সময়ে সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটি (Background) শিক্ষার্থীর সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।
- নির্দেশদানের সময় উপস্থাপিত বিষয়বস্তু যতটা সম্ভব দর্শন সংবেদন ব্যবহার করে করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীকে শ্রবণশক্তির উপর বেশি নির্ভর করতে হবে না।

- এই শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে শিক্ষককেই।
- নির্দেশদানের প্রারম্ভে শিক্ষককে দেখে নিতে হবে শিক্ষার্থীদের শোনার যন্ত্র বা Hearing aid ঠিকমতো কাজ করছে কি না, ব্যাটারি আছে কি না ইত্যাদি।

৭.৩.৬ ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তাকারী বিশেষ ব্যবস্থা (Interventions to Assist Hearing Impaired Students) :

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণের (Improved Communication) মাধ্যমে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা হয়। Interpretor-এর সাহয্যে শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন, সম্মেলন (Conference), ওয়ার্কশপ, কোনো বিষয় উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই একইভাবে এই শিক্ষার্থীদের যোগাযোগের (Communication Process) উন্নতিসাধন করা যায়। যে পদ্ধতিগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল বাচনিক যোগাযোগ (Oral Communication), সাংকেতিক ব্যবস্থা (sign system), সম্পূর্ণ যোগাযোগ (Total Communication), টেলি যোগাযোগ (Tele Communication) ইত্যাদি।

- **বাচনিক যোগাযোগ বা Oral Communication :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কথা বলানোর উপরে জোর দেওয়া হয় আর চেষ্টা করা হয় যাতে তাদের সীমিত শ্রবণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানো যায়। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য এই প্রধান সংবেদন দুটিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করা হয়।
- **সাংকেতিক ভাষা (Sign Language) :** এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কীভাবে শারীরিক অঙ্গের বিভিন্ন অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, যেমন—হাতের আঙুলের সাহায্যে বিভিন্ন আকার (Shape), আঙুলের নড়াচড়া (Movement), আঙুলের অবস্থান (Positioning) ইত্যাদি। এইগুলিকে ম্যানুয়াল (Manual) পদ্ধতি বলা হয়। এছাড়াও কিছু নন্-ম্যানুয়াল (Non-manual) পদ্ধতিও এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যেমন—চোখ, ভ্রূ, গাল, ঠোঁট, জিভ ও ঘাড়ের ব্যবহার করেও মনের ভাব প্রকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। American Sign Language (ASL) হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ম্যানুয়াল (Manual) ও নন্-ম্যানুয়াল (Non-manual) দুই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- **সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক যোগাযোগ (Total Communication) :** এই ব্যবস্থায় উপরোক্ত দুটি পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ বাচনিক পদ্ধতি (Verbal Method) ও সাংকেতিক পদ্ধতি (Sign Method)। দুটিরই সমান ব্যবহার দেখা যায় সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শব্দ বা শব্দাংশ উচ্চারণে চেষ্টা করে। আবার সঠিক পদ্ধতি শিখে সংকেত দেখিয়ে বা সংকেত দেখে যোগাযোগ স্থাপন করার প্রশিক্ষণও এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, বাচনিক যোগাযোগ ও সাংকেতিক ভাষা, উভয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ সমস্যা অনেকটাই দূরীভূত করা সম্ভব হয়।

সংকেতের মাধ্যমে বাক্‌শক্তি বিকাশ (Cued Speech) : এই পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রেও বাচনিক যোগাযোগ ও সাংকেতিক ভাষা এই দুই পদ্ধতির জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এইক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের দর্শন সংবেদনের সাহায্যে একটি cue বা সংকেত চিনতে হয়, যা কোন বক্তা, শিক্ষার্থীদের সামনে উত্থাপন করেন। এই পদ্ধতিতে আটটি নির্দিষ্ট হাতের আকার ব্যবহার করা হয়, যা মুখের কাছে বা মুখের উপর রেখে শিক্ষার্থীকে কথা বলানোর চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি হাতের আকার একটি করে ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) বোঝায় আর মুখের কাছে বা মুখের উপর হাত রেখে যে চারটি ভঙ্গি করা হয় সেগুলি প্রত্যেকটির দ্বারা এক একটি স্বরবর্ণ বা Vowel-কে বোঝায়। এই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দগুলি শিক্ষার্থীর পঠনের জন্য সংকেত বা cue দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

- **শ্রবণে সহায়তাকারী প্রযুক্তি (Assistive Listening Devices) :** শ্রবণে সহায়তাকারী প্রযুক্তি বা টেলি কমিউনিকেশন প্রযুক্তি, শিক্ষার্থীর অন্যান্য সংবেদনের ক্ষেত্রগুলি ব্যবহার করে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া

উন্নত করে তোলে। শ্রবণে সহায়তাকারী যন্ত্র বা Hearing aid সবচেয়ে বেশি প্রচলিত Assistive listening device বা শ্রবণে সহায়তাকারী প্রযুক্তি। এই যন্ত্রগুলি কানে, কানের পেছনে, চশমা, ফ্রেমে ধারণ করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে শব্দ বিবর্ধক যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়। এই শব্দ বিবর্ধক যন্ত্র (amplification system) হল শ্রবণে সহায়তাকারী আর একটি প্রযুক্তি (Assistive listening Device) যেটি একটি মাইক্রোফোনের মাধ্যমে শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষিকার কথা দ্বিগুণ জোরে শুনতে পায়। যে সমস্ত শিক্ষার্থীর এই বিশেষ সুবিধা প্রয়োজন তাদের একটি গ্রাহকযন্ত্র (Receiver) কানে লাগাতে হয়। এইভাবে একই শ্রেণিকক্ষে সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকারের শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

- **টেলি-যোগাযোগ উপকরণ (Telecommunication Devices) :** এই যন্ত্রগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো পর্দার (Screen) ও Keyboard-এর প্রয়োজন, যা টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত করা থাকবে। Telecommunication devices for the deaf (TDDS) বা বধিরদের জন্য টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি ও Text telephone প্রযুক্তিতে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের টেলিফোন করতে ও গ্রহণ (receive) করতে শেখানো হয়। যখন এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ফোন করা হয়, তখন সমস্ত কথাবার্তাই পর্দায় ফুটে ওঠে। অনেক সময় Printer-এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে, যে কথা বলছে ও যার কথা বলছে দুজনের সমস্ত বার্তালাপই (Conversation) ছাপা হয়ে বেরোয়।

উপরোক্ত সমস্ত পদ্ধতিগুলিই একটি অপরটির পরিপূরক। বর্তমানে Assistive Listening Device-এর ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয়। কারণ এই যন্ত্রগুলি খুব হালকা, ব্যবহারপোযোগী এবং কিছু উন্নত যন্ত্র এমনও আছে যেগুলি এতই ছোটো যে চট করে নজরে আসে না।

৭.৩.৭ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে কার্যকরী মিথস্ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার বাঞ্ছিত আচরণবিধি (Expected Behaviour Pattern of Teachers and Parents for Interacting Positively with Children with Sensory Disabilities) :

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এইসব বিশেষ শিশুদের সম্পর্কে খুবই স্বল্প। তাই অনেকসময়ই দেখা যায়, যে ব্যক্তিটি দেখতে পায় না তার সঙ্গে খুব উচ্চস্বরে কথা বলা হচ্ছে। বা যে ব্যক্তি সাংকেতিক ভাষায় (Sign language) কথা বলছে তার দিকে অন্যরা তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। তবে পিতামাতা ও শিক্ষকের জানা প্রয়োজন কেমন আচরণ করতে হবে। এই আচরণবিধিগুলিই এখানে আলোচিত হল—

- **প্রথমে কথা বলা শুরু করতে হবে (Speak first) :**

  যারা সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন তারা সমস্ত পরিবেশকে ও অন্যান্য মানুষকে দেখতে পায়। তাই কথাবার্তা শুরু করা উচিত তাদের। বাবা-মা, বা শিক্ষিকার উচিত নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রথমে জানানো এবং কথাবার্তা শুরু করার জন্য শিক্ষার্থীকে এটাও বোঝানো প্রয়োজন যে তাকে দেখে পিতামাতা বা শিক্ষক/শিক্ষিকা খুশি হয়েছেন।

- **স্বাভাবিক ভাষার ব্যবহার করতে হবে (Natural language should be used) :** সাধারণ শিশুদের সঙ্গে যেইভাবে কথাবার্তা বলা হয়, সেইভাবেই কথাবার্তা বলতে হবে এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। দেখো (look) বা তাকাও (see)—এই কথাগুলিও দর্শনে সমস্যা আছে, এইরকম শিশুদের বলা যেতে পারে। যতক্ষণ না শিক্ষার্থীর বুঝতে বা নির্দেশ অনুসরণ করতে সমস্যা হচ্ছে ততক্ষণ খুব স্বাভাবিক গলায় (natural tone) কথা বলতে হবে। বিশেষ শিশুদের অনুরোধে ও প্রয়োজনে পিতা-মাতা বা শিক্ষিকা স্বর বদলাবেন বা অন্যভাবে বলবেন।

- প্রয়োজনে নির্দেশ পুনর্গঠন করে পুনরাবৃত্তি করতে হবে (Reform and Repeat the message if necessary) :

  দর্শন বা শ্রবণশক্তি ব্যাহত শিশুরা যদি কোনো নির্দেশ বুঝতে না পারে, শুধুমাত্র বার্তাটি জোরে বলতে হবে তা নয়। বার্তাটি আরও সরলভাবে পুনর্গঠন (reconstruct simply) করে তুলতে হবে।

- যে-কোনো নির্দেশদানের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা (clear and precise) বজায় রাখতে হবে। কোনোকিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন।

- **পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে (Allow adequate time) :**

  এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের অক্ষমতার জন্য অনেক সময় খুব সাধারণ কাজেও অনেক সময় লেগে যেতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা করে নিয়ে তাদের কাজ দিলে তারা সময় নিয়ে কাজটি সম্পাদন করতে পারবে। আর নিজে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারলে তাদের আত্মনির্ভরতা বাড়বে।

- **ওভারহেড প্রোজেক্টরের ব্যবহার (Use of Overhead Projector) :**

  এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের নির্দেশদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে Overhead projector ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষিকারা এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে শ্রেণিশিক্ষণে এই শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তুলতে পারেন।

- **আলোচনার সময় একজন করে শিক্ষার্থী একবারে বলবে (one person should speak at a time) :**

  কোনো দলগত আলোচনা পরিচালনার সময় শিক্ষক বলে দেবেন যাতে একজন একজন করে শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্য পেশ করে। প্রতিটি বক্তার নাম শিক্ষিকা বলে দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহায়তা হয়। গৃহে যখন সকলে একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলে সেই সময় পিতামাতাকেও খেয়াল রাখতে হবে যাতে তাদের বিশেষ শিশুটিও নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়।

এই বিশেষ শিশুদের অক্ষমতা আছে বলেই তারা কিছু কাজ করতে অক্ষম এই ধারণা পিতামাতা বা শিক্ষকের না রাখাই শ্রেয়। প্রতিবারেই শিশুকে সুযোগ দিতে হবে, ধৈর্য ভরে অপেক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনে সহায়তাদান করতে হবে।

৭.৩.৮ নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your Progress) :

(১) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য লেখো।

(খ) একটি নির্দিষ্ট উপসর্গ বলো যা দিয়ে ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের চেনা যায়।

(গ) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের একটি কর্তব্য উল্লেখ করো যা ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবে।

২) শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ভারতবর্ষে ১৩০ কোটির জনসংখ্যার মধ্যে ব্যাহত শ্রবণশক্তির মানুষের সংখ্যা ____________ কোটি।

(খ) আঙ্গিক ত্রুটির জন্য শ্রবণের যে সমস্যা দেখা যায় তা দুই প্রকার একটি ____________ অপরটি ____________।

৭.৪ মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mild Mental Retardation)

Objective :

(i) শিক্ষার্থীরা মানসিক প্রতিবন্ধকতার ধারণাটি বুঝতে পারবে।

(ii) বিভিন্ন লক্ষণ দেখে শিক্ষার্থীরা মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিনতে পারবে।

(iii) কীভাবে নির্দেশনাদান করলে এই শিক্ষার্থীরা সার্থকতার সাথে পঠন-পাঠন সম্পাদন করতে পারবে।

৭.৪.১ ভূমিকা (Introduction) :

মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া বলতে বোঝায়, বয়স অনুযায়ী বৌদ্ধিক ও আচরণমূলক কর্মে প্রতিবন্ধকতা। অনেকসময় মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধকতা শনাক্তকরণ হয় না যতক্ষণ না শিশুটি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। যদি বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫-র কম হয়, তবে সেই শিক্ষার্থীকে মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধী বলা হয়।

তবে বর্তমানে শুধু বুদ্ধি নয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা হয়। একটি হল ৭৫-৭০-র মধ্যে এর এক অন্যটি হল আচরণে সামঞ্জস্যতার অভাব।

American Association on Mental Retardation মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের ৮টি ভাগে ভাগ করেছে—মৃদু, সাধারণ, গুরুতর ও চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা (Mild, Moderate, Severe and Profound)। বুদ্ধ্যঙ্ক যদি (৫০-৫৫—৭০) হয় তবে তাকে আমরা মৃদু মাত্রায় পিছিয়ে পড়া বলতে পারি। আবার বুদ্ধ্যঙ্ক যদি ৩৫-৪০ — ৫০- ৬০, তবে তা সাধারণভাবে পিছিয়ে পড়া বা মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধকতা বোঝায়। গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্ক হয় ২০-২৫ থেকে ৩৫-৪০ এর মধ্যে আর চূড়ান্ত মাত্রার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্ক হয় ২০-২৫-এর কম। এই পর্বে আমরা শুধু মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করব।

৭.৪.২ চিহ্নিতকরণ (Indentification)

(১) দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characterisation) :

—এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় ইন্দ্রিয়জাত সমস্যা দেখা যায়। যেমন — শোনা, দেখা ইত্যাদি।

—উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের মতো স্বাভাবিক।

(২) বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য (Intellectual Characteristics) :

বৌদ্ধিক স্বল্পতা এই সমস্ত শিশুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্মৃতি, কল্পনা, যৌক্তিক বিচার এই সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় দক্ষতা প্রকাশ করে।

(৩) আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য (Behavioural Characteristics) :

পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী এই শিশুরা নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। নতুন কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতেও এদের সমস্যা হয়।

(৪) ভাষামূলক বৈশিষ্ট্য (Linguistic Characteristics) :

এই শিশুরা নিজেদের বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারে না সঠিক cognitive functionary-এর অভাবে, উচ্চারণে অস্পষ্টতাও দেখা যায়।

(৫) শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য (Educational Characteristics) :

প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় ভরতির পর সাধারণ শিশুদের মতো এরা শিখতে পারে, পড়তে পারে ও অঙ্ক করতে পারে। তবে সাধারণভাবে অষ্টম শ্রেণির পরে এই শিশুরা আর এগোতে পারে না।

(৬) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (Individual Characteristics) :

সাধারণভাবে এই শিশুরা হয় আত্মকেন্দ্রিক, তাই অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

(৭) সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics) :

এই শিশুদের ভাষামূলক বিকাশ সাধারণের তুলনায় পিছিয়ে থাকে এবং অভিযোজন ক্ষমতার দিক থেকেও তারা পিছিয়ে থাকে। তাই স্বাভাবিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (social interaction) অভাব দেখা যায়।

দেখা যায় যে সমস্ত শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা গুরুতর ও চূড়ান্ত তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না তবে যাদের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা মৃদু তাদের ক্ষেত্রে সাধারণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়, যার ফলে শিক্ষিকার পক্ষে তাকে খুঁজে নেওয়া মুশকিল হয়ে যায়, এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের চিনতে পারলে তবেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

৭.৪.৩ শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Strategy) :

(১) **পুনরাবৃত্তি (Repetition) :** এই সমস্ত শিশুদের মনে রাখার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম, তাই শিক্ষিকার উচিত বারাবার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর ধারণে সহায়তা করা।

(২) **পিরিয়ডের সময়সীমা (Duration of Periods) :** একই বিষয়ে অনেকক্ষণ মনোযোগ রাখতে সক্ষম হয় না এই শিক্ষার্থীরা, তাই ক্লাসের সময়সীমা ৪০ মিনিট না হয়ে ২০-২৫ মিনিট হলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয়।

(৩) **শিখন অভিজ্ঞতায় মূর্ত বিষয়ের ব্যবহার (Using Concrete Problems for Learning) :** এই সমস্ত শিশুদের কল্পনাশক্তি স্বল্প তাই বিমূর্ত নয়, মূর্ত বিষয়ে কাজ করতেই এরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য।

(৪) **প্রকল্পের মাধ্যমে শিখন (Learning through Project) :** শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে না পড়িয়ে বিষয় অনুসারে ছোটো ছোটো প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করালে শিক্ষার্থীরা সঠিক বিষয়টি জানতে পারবে।

(৫) **উদাহরণের ব্যবহার (Using Examples) :** যে-কোন বিষয়কে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে গেলে প্রয়োজনমতো সঠিক উদাহরণের সাহায্য নিতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের পঠনকে আরও আকর্ষক আরও বোধগম্য করে তোলার জন্য শিক্ষণ প্রদীপনের (Teaching Materials) ব্যবহার করতে হবে।

(৭) **বারংবার অনুশীলনের ব্যবস্থা (Organising Repeated Exercise) :** এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা অনেক সময় ধরে বিষয় মনে রাখতে সক্ষম হয় না, তাই তাদের একই কাজ বারবার অনুশীলন করাতে হয়, এই কাজে তাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

(৮) শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, চাহিদা ও প্রবণতাকে ভিত্তি করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) শ্রেণিকক্ষে এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা যদি আংশিকভাবেও কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে তাহলে তার প্রশংসা করা অত্যন্ত জরুরি।

(১০)সমস্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য আমোদ-প্রমোদমূলক ব্যবস্থা, খেলাধুলা, সংগীত, শিল্প, কবিতা, নাটক ইত্যাদির সুযোগ করে দিতে হবে এই মৃদু মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের।

এ ছাড়াও এই সমস্ত শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে যাতে তারা নিজের যত্ন (self-care) নিতে পারে, যা দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই শ্রেণিকক্ষে এদের পঠন-পাঠন সম্ভব যদি এদের একটু বিশেষ সুবিধা দেওয়া যায়। শিক্ষিকার ব্যক্তিগত মনোযোগ শিক্ষার্থীকে বিশেষ সুবিধা দিতে পারে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে। শিক্ষকের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীর পিতামাতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার্থীদের সুন্দর একটা সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা।

৭.৪.৪ নিজের অগ্রগতি যাচাই জানো (Know your Progress) :

(১) শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধির হার হল _____________ থেকে _____________.

(খ) American Association on Mental Retardation মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের __________ ভাগে ভাগ করেছে।

২) এক বাক্যে উত্তর দাও :

(i) মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো শ্রেণির কাজ বা বাড়ির কাজ কিছুটা ঠিক করে কিছুটা ভুল করে শিক্ষক/শিক্ষিকা কি করবেন?

(ii) এই শ্রেণির বিশেষ শিশুদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

(iii) মৃদু মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৭.৫ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী শিশু (Orthopedically Handicapped Child)

আমাদের সমাজে এমন কিছু শিশু আছে যাদের দৈহিক প্রতিবন্ধকতার হার এমনই যে বিদ্যালয়ে যেতে হলেও তাদের অন্যের সহায়তা নিতে হয়। এই শিশুদের বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন প্রয়োজন। এই বিকলাঙ্গতা বোঝানোর জন্য ইংরাজিতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন—Crippled, physically handicapped ইত্যাদি।

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী —এই কথাটি ব্যবহার করা হয়—Physically disabled, Crippled, Orthopedically Impaired বোঝানোর ক্ষেত্রে।

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী আইনগত সংজ্ঞা বলতে বোঝায় গুরুতর অস্থিসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, এই অস্থিসংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে জন্মগত বা পরবর্তী সময়ের কোনো দুর্ঘটনার ফলাফল।

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধিকতা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে — কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় শরীরের নিম্নাংশের অক্ষমতা (Lower limb disability) কারও আবার শরীরের ঊর্ধ্বাংশে অক্ষমতা (Upper limb disability)। তবে এই সমস্ত শিশুদেরই যে শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা হবে তা নয়। তবে কিছু সুযোগসুবিধা পেলে এরাও অন্যান্যদের মতো শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।

৭.৫.১ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Orthopedically Handicapped) :

অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার তুলনায় এই ধরনের শিশুদের চিহ্নিতকরণ অনেক সহজ। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা এতটাই মৃদু যে বিশেষ কোনো সহায়তা ছাড়া সাধারণভাবেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয় যেগুলো শিশুদের মধ্যে উপস্থিত থাকলে আমরা শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণি প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(১) বিভিন্ন পেশীয় কর্মসম্পাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান; শরীরের দুটি বা তিনটি পেশির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে অক্ষম শিশুদের মধ্যে এই প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়।

(২) দেহের বিভিন্ন সন্ধিস্থলে নিয়মিত ব্যথা অনুভূত হলে।

(৩) দৈহিক অনুশীলন (Physical exercise)-এর ক্ষেত্রে এই শিশুরা শরীর ব্যথার অভিযোগ করে।

(৪) এক জায়গায় স্থির হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে পারে না।

(৫) স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে অসুবিধা হয়।

(৬) কোনো বস্তু ধরা, তোলা বা রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

(৭) হাঁটাচলা বা নড়াচড়ায় জড়তা থাকে এই শিক্ষার্থীদের।

(৮) বিভিন্ন পেশি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রণ থাকে না।

(৯) বারবার পড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

(১০)হাতে, আঙুলে, ঘাড়ে ও গলায় হাড়ের সমস্যার জন্য বৈকল্য বা deformity দেখা যেতে পারে।

যাদের অস্থিসংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে তাদের প্রতিবন্ধকতা উপরোক্ত লক্ষণগুলির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ হতে পারে। এই লক্ষণগুলি যদি একাধিক বা অতিমাত্রায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় তবে তার দৈহিক প্রতিবন্ধকতার মাত্রাও গুরুতর বলে বিবেচিত হবে।

৭.৫.২ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদা (Special Needs of Orthopedically Impaired Children) :

অস্থিসংক্রান্ত সমস্যার তারতম্য অনুযায়ী এই শিশুদের সমস্যাও ভিন্ন। তাদের সমস্যার মাত্রা অনুযায়ী তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা দেখা যায়। এই চাহিদাগুলি হল—

(১) বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য wheel chair, handrail ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

(২) যাদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশে কোনো সমস্যা থাকে তাদের সুবিধার জন্য পরিবেশের পরিমার্জনা করা প্রয়োজন, স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র, আসবাব ইত্যাদিতেও পরিমার্জন প্রয়োজন।

(৩) শিশুদের বৃদ্ধির হার দ্রুত, তাই যদি কোনো artificial limb শিশুরা লাগিয়ে নেয় সেটা এক বছরের মধ্যেই ছোটো হয়ে যায়, হাতের মাপের তুলনায় তাই শিক্ষককে দেখতে হবে যাতে এই artificial limb প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করা হয়।

(৪) যে শিক্ষার্থীদের কোনো artificial limb-এর সহায়তা নিতে হয় সে অন্যান্যদের মতো একই গতিতে শ্রেণিকক্ষে পৌঁছাতে পারে না। তাই শিক্ষককে এই অতিরিক্ত সময়টি দিতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে যদি কোনো শিক্ষার্থী অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় তবে শিক্ষিকা জানার চেষ্টা করবেন সমস্যার তীব্রতা কত এবং তাদের বিশেষ চাহিদা, যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষিকা শিক্ষাদান করবেন।

৭.৫.৩ শিক্ষামূলক পদ্ধতি (Educational Strategy) :

অস্থিসংক্রান্ত সমস্যা যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের রয়েছে তাদের কোনো বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন নেই, তবে পরিবেশের কিছু পরিবর্তন করে নিলেই তারা অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই শিক্ষালাভ করতে পারবে।

(১) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান শুরু করার আগে শিক্ষক দেখে নেবেন তার শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে বসতে পারছে কি না, বা আসবাবপত্রের কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কি না।

(২) শ্রেণিকক্ষে যাতে শিক্ষার্থী তার wheel chair নিয়ে প্রবেশ করতে পারে সেই ব্যবস্থা শিক্ষককে রাখতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলবেন শিক্ষকেরা। শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারলে তবেই বিভিন্ন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শোনার ক্ষমতা (Listening skill) তৈরি করতে হবে শিখনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে।

(৪) এই সমস্ত শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে কীভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগানো যায়।

(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকা নজর রাখবেন এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সময় যেন কোনোভাবে মনঃক্ষুণ্ণ না হয়, তাদের নিজের সম্পর্কে যেন সঠিক ধারণা সৃষ্টি হয়।

(৬) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলি যেমন—ছন্দ, সংগীত, নাটক ইত্যাদি সংগঠিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিকাশসাধন করতে পারে।

(৭) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Vocational training) : প্রতিটি শিশুর বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে, শিক্ষিকার কাজ হল সেই ক্ষমতাটিকে শনাক্ত করা ও শিক্ষার্থীকে সহায়তাদান যাতে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর এই ক্ষমতাটি বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করতে পারে।

(৮) শিক্ষার্থীদের দৈহিক প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী শিক্ষক পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করবেন বিদ্যালয়ে।

(৯) শিক্ষক এই শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দেবেন।

(১০)এ ছাড়াও সমাজে বসবাস করতে গেলে ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিও শিক্ষার্থীদের শেখানো হবে, যেমন— রাস্তা পার হওয়া, টাকা-পয়সার হিসেব রাখা, বাসে ট্রেনে ওঠানামা ইত্যাদি, প্রয়োজন হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর পিতামাতার সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।

সবশেষে বলা যায় শিক্ষক এমন একটা পরিবেশ রচনা করবেন যেখানে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থীকে তার কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে সঠিক কাজ করলেই, আংশিকভাবে সঠিক হলেও তার স্বীকৃতি শিক্ষককে দিতে হবে। শিক্ষককে মাথায় রাখতে হবে যাকে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনার সম্মুখীন শিক্ষার্থী না হয়।

৭.৫.৪ নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your Progress) :

১. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(i) অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর আইনগত সংজ্ঞা দাও।

(ii) যে যে উপসর্গ দেখে তুমি দৈহিক সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে চিনতে পারবে? (যে-কোনো একটি উপসর্গ লেখো)

(iii) অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর প্রয়োজনীয় দুটি উপকরণ সম্পর্কে লেখো।

(iv) যে-কোন দুটি শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে বলো যা দৈহিক সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষিকা প্রয়োগ করতে পারেন।

৭.৬ শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিশু (Children with Learning Disability) :

বিশেষ শিক্ষার (Special Education) একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল শিখন অক্ষমতা (Learning Disabilities)। নিউইয়র্কে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এই কথাটি ব্যবহার করেন স্যামুয়েল কার্ক (Samuel Kirk)। একটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিখনের সমস্যা বোঝানোর জন্য, শিশুদের অন্যান্য অক্ষমতার তুলনায় শিখনে অক্ষমতার ধারণাটি বোঝা একটু কঠিন। কারণ শিখনে অক্ষমতা অনেক সময় হয় সাময়িক এবং প্রাক্ষোভিক কারণে, অন্যান্য অক্ষমতার তুলনায় অনেক পরে শিখনে অক্ষমতা স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে বিশেষ শিক্ষার এই ক্ষেত্রটি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে, দেখা অনেক বিখ্যাত মনীষীরা ছেলেবেলায় এই সমস্যার স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। টমাস এডিসন, এলবার্ট আইনস্টাইন ইত্যাদি মহান বিজ্ঞানীরাও তাদের ছেলেবেলায় এই সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন।

৭.৬.১ শিখন অক্ষমতার সংজ্ঞা (Definition of Learning Disability) :

প্রতিবন্ধী শিশুদের উপর প্রথম জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির (National Advisory Committee) শীর্ষে ছিলেন স্যামুয়েল কার্ক। এই কমিটি তাদের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট (First Annual Report) পেশ করে ১৯৬৮-এর ৩১ জানুয়ারি। এই রিপোর্ট শিখন অক্ষমতার সংজ্ঞায় বলেছিল—

যে শিশুরা এই বিশেষ শিখন অক্ষমতার শিকার তাদের মধ্যে কোনো ভাষা বলা, লেখা বা বোঝার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক সমস্যা দেখা যায়, যা প্রতিফলিত হয় শিশুর শোনার, চিন্তার, কথা বলার, পঠনের, লেখার বা গণিতের ক্ষমতার উপর। এই সীমাবদ্ধতার কারণগুলি হতে পারে—প্রত্যক্ষণের প্রতিবন্ধকতা, মস্তিষ্কে আঘাত, মস্তিষ্কের ন্যূনতম কার্যকারিতা, ডিসলেক্সিয়া ইত্যাদি। তবে

যদি শিখনে অক্ষমতার কারণ হয় কোনো শারীরিক সমস্যা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, তবে তা শিখনে অক্ষমতা বা Learning disability-র অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনকী কোনো প্রাক্ষোভিক সমস্যা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও পরিবেশের কোনো কারণে যদি শিখনে অসুবিধা হয় সেটাও শিখনে অক্ষমতার (Learning Disability) অন্তর্ভুক্ত হবে না।

"Children with special learning disability exhibit a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using spoken or written languages. These may be manifested in disorders of listening, thinking, talking, reading, writing, speaking or arithmatic. They include conditions, which have been referred to as perceptual handicapes, brain injury, minimal brain disfunction, dislexia, development apharia etc. They do not include bearing problem that are due primarily to visual, hearing or motor handicapes to mental retardation, emotional disturbance, or to environmental disadvantage."

৭.৬.২ শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ (Indentification of Learning Disabled Children) :

যে মূল বৈশিষ্ট্যটি শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তা হল তাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও পারদর্শিতার মধ্যে বিস্তর ফারাক। কথা বলা, লিখে মনের ভাব প্রকাশ, শুনে কোনো বিষয়বস্তু বোঝা, পড়ে বোঝা, পড়া বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতাগুলি প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও কিছু গুরুত্ব বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হল যা থেকে শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের সহজেই চিনে নেওয়া যাবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) দেরিতে কথা বলা (Delayed Spoken Language Development) :

শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কথা বলার ক্ষমতা তাদের সমবয়সি শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে থাকে, তাদের শব্দভাণ্ডার (vocabulary) সীমিত। কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োগ অনেক ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। কোন ধারণাকে যুক্তিপূর্ণভাবে পর পর প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই শিশুদের সমস্যা দেখা দেয়। অনেকগুলি বিষয়বস্তু যদি একসঙ্গে আলোচিত হয়, এই শিশু অনেক সময় সঠিকভাবে অনুসরণ করতে না পেরে গুলিয়ে ফেলে।

(ii) সঠিক স্থানগত ধারণার অভাব (Poor Spatial Orientation) :

নতুন কোনো জায়গায় গেলে এই শিক্ষার্থীরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। কোনো বিল্ডিং যদি একটু জটিল হয়, তারা ঢুকে, বেরোবার রাস্তা চিনতে পারে না। যখনই কোনো জটিল পরিস্থিতি বা Puzzle-এর সম্মুখীন হয় তখন তারা পরিকল্পনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে না, বরং সমস্ত রকম সম্ভাবনা randomly চেষ্টা করে।

(iii) সঠিক সময়গত ধারণার অভাব (Inadequate Time Concept) :

সঠিক সময়ের ধারণা যেহেতু এই শিক্ষার্থীদের থাকে না তারা তাদের সময়োচিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। শিখন অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কখনও বুঝতেই পারে না, অন্যেরা কী করে বিভিন্ন কাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে খুঁজে নেয়। ঘড়ি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি দেখে সেই অনুযায়ী নিজেকে সময় দেওয়া—সেটা এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভবই হয় না।

(iv) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচারকারণে সমস্যা (Difficulty in Judging Relationship) :

শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মুহূর্তে কোন্‌টির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। তাই সবকিছু দেখা সত্ত্বেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটিকে বেছে নিতে পারে না। কোন্‌টা বড়ো, কোন্‌টি ছোটো, কোন্‌টা হালকা, কোনটা ভারী, কোনটা কাছে, কোনটা দূরে এই সম্পর্কগুলি বুঝতে পারে না এই শিক্ষার্থীরা। তাই বিভিন্ন কাজ এরা অনেকটাই অসংগঠিত (disorganised) ও বিশৃঙ্খল (indisciplined) ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করে।

(v) সঠিক দিক্‌নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যা (Direction Related Confusion) :

সাধারণভাবে দেখা যায় এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের ডান বা উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, উপরে-নীচে ইত্যাদির ধারণাগুলি বুঝে কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। তারা কোন্ রাজ্যে বাস করছে বা রাস্তার কোন্ দিক থেকে গাড়ি আসে আর কোন্ দিক দিয়ে যায় তা মনে রাখা এই সমস্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে দুষ্কর।

(vi) নিম্নমানের সাধারণ সঞ্চালনমূলক সমন্বয় (Poor General Motor Coordination) :

যে-কোনো কাজে অপরিচ্ছন্নতা, সমন্বয়ের অভাব, পড়ে যাওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয় এই শিক্ষার্থীরা। দুটো হাত দিয়ে দু-রকম কাজ একসঙ্গে করে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা চঞ্চল, সহজে ধৈর্য হারায়, এবং তাদের স্মৃতির বিস্তার খুব কম হওয়ার দরুন তারা কখনো-কখনো অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে পড়ে আবার কখনো বা নিষ্ক্রিয়।

(vii) বিভিন্ন বস্তু নিয়ে কাজ করার অসুবিধা (Problem in Working with Different Articles) :

পেনসিল, বই, খাতা কীভাবে ধরতে হবে, কীভাবে কাজ করতে হবে এই সমস্যাগুলি দেখা যায় শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে। নতুন কোনো বস্তু ব্যবহার করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এ ছাড়াও তাদের সামাজিক, বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করা এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

(viii) সঠিক সামাজিক প্রত্যক্ষণের অভাব (Lack of Proper Social Perception) :

শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীরা বুঝতে সমর্থ হয় না যে তারা কি তাদের বন্ধুদের দলে বাঞ্ছিত কি না। অনেক সময় শরীরী ভাষা (body language) অনেক কিছু প্রকাশ করে। তবে এই শিক্ষার্থীরা পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অন্যান্য শ্রেণির বন্ধুদেরও body language বুঝতে পারে না।

(ix) অমনোযোগী (Inattention) : স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মতো এই শিক্ষার্থীরা অনেকক্ষণ একই বস্তুতে বা কাজে মনোযোগী হতে পারে না। তাই শ্রেণিকক্ষেও একটানা শিক্ষকের কথা অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

(x) অতিরিক্ত সক্রিয়তা (Hyperactivity) :

অনেক ক্ষেত্রেই এই শিশুরা সাধারণের তুলনায় বেশি সক্রিয় হয়। এরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। এই চঞ্চলতা আবার বেশি দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে।

(xi) প্রত্যক্ষণের সমস্যা (Perceptual Disorders) :

সংবেদনের মাধ্যমে যা অনুভবকারী তা অর্থপূর্ণ করে নেয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। সঠিক প্রত্যক্ষণের জন্য প্রয়োজন তথ্যের পৃথকীকরণ (Disovimination), সমন্বয় (coordination) এবং নিয়ম অনুসারে সাজান (Sequencing)। দেখা যায় শিখন অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুরা এই প্রত্যক্ষণের প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(xii) স্মৃতিসংক্রান্ত সমস্যা (Memory Disorders) :

মনের বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্মৃতি। অনেক গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়েছে বা বর্তমানেও চলছে এই প্রক্রিয়ার উপর। তবু এই জটিল মানসিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয়নি। দেখে মনে রাখা (Visual Memory), শুনে মনে রাখা (auditory memory) এই দুটি ক্ষেত্রেই শিখনে সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্ত সমস্যাগুলি যদি কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে তাহলে শিক্ষক তাকে শিখন সমস্যাসম্পন্ন (Learning Disabled) বলে চিহ্নিত করতে পারেন।

৭.৬.৩ শিক্ষক কীভাবে শিখন অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন (How the Teacher will Assess the Learning Disabled) :

এইক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন, যেমন—

(ক) পাঠক্রমভিত্তিক মূল্যায়ন (curriculum based assessment) : এই পদ্ধতিতে শিক্ষিকা দেখেন পাঠক্রমের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থী অগ্রগতি করতে পারছে কি না।

(খ) পর্যবেক্ষণ (Observation) :
এই পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন তার আচার-আচরণ অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় কতটা ভিন্ন।

(গ) সাক্ষাৎকার (Interview) :
শিক্ষিকা প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীকে আলাদা করে ডাকবেন তার সঙ্গে কথা বলবেন এবং বুঝতে চেষ্টা করবেন শিশুটির মধ্যে সত্যি শিখনে সমস্যা আছে কি না।

(ঘ) প্রশ্নাবলি ও Checklist-এর ব্যবহার (Using Questionnaire or Check List) :
শিক্ষিকা শিখন সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো প্রশ্নাবলি বা checklist তৈরি করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে বলে বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি তথ্য সংগ্রহ করলে বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনে সমস্যা আছে কি না, থাকলে তার মাত্রা কীরকম।

(ঙ) এ ছাড়াও শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা (teachers made test) এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭.৬.৪ শিখন অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় শিক্ষক কীভাবে সহায়তা করবেন (How the Teacher will help in Education of the Learning Disabled Children) :

(ক) এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত, সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক চাহিদার কথা মনে রাখতে হবে, কী ধরনের অক্ষমতা আছে এবং তার মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এই শিশুদের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

(খ) এই সমস্ত শিক্ষার্থীকে আলাদা কোনো শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা না দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই শিক্ষা দেওয়া উচিত, প্রয়োজনে এই শিক্ষার্থীদের কয়েকটা ক্লাস আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে যেখানে শুধুমাত্র শিখনে সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই থাকবে।

(গ) বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি, উপকরণ (Specialised Instructional Strategies and Materials) শিক্ষিকা ব্যবহার করবেন, এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশনাদানের জন্য।

(ঘ) এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক চাহিদা সময়ের সঙ্গে বদলে যায় তাই নির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক (systematic & ongoing) মূল্যায়ন প্রয়োজন, যাতে তারা সঠিক শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পায়।

(ঙ) এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিখন নির্ভর করে শিক্ষার গুণমান ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার উপর। শিখন অক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই অক্ষমতার প্রকৃতি বদলে যায়। তাই শিক্ষার সুযোগসুবিধা এমনভাবে গঠন করতে হবে যে এই শিশু নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা (support) পায়।

(চ) সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা (Social Acceptance) এই শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের (self-confidence)-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রহণযোগ্যতা বিদ্যালয়ের সমস্ত মানুষের থেকেই কাম্য।

(ছ) এই শিক্ষার্থীরা যাতে মূল স্রোতে (main streaming) ফিরতে পারে, সেইজন্য বিদ্যালয় পরিবেশ প্রয়োজনীয় সংযোজন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সদর্থক পরিবেশ (positive environment) শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে।

বিশেষ শিক্ষা বা Special Education-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষণের দায়িত্ব এই সমন্বয়িত শিক্ষার যুগে (Age of Inclusive Education) অনেক বেড়ে গেছে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর লক্ষণ অনুযায়ী চিনতে হবে তার কী সমস্যা রয়েছে এবং সমস্যাটির গভীরতা কতখানি, তবেই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা তিনি দিতে সক্ষম হবেন।

৭.৬.৫ নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানো (Check your Progress) :

(১) একটি বাক্যে উত্তর লেখো—

(i) প্রতিবন্ধীদের উপর প্রথম জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির শীর্ষে কে ছিলেন?

(ii) কোন্ কোন্ আচরণে শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধতা দেখা যায়?

(iii) শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশ সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে লেখো।

(iv) শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের যে-কোনো দুটি সমস্যা লেখো।

(v) শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক কোন্ কোন্ পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকেন?

(vi) শিক্ষক শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করেন তার যে-কোন দুটি লেখো।

৭.৭ সারাংশ (Summary)

সমন্বয়িত শিক্ষার কথা মাথায় রেখে অতীতে বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ৩২টি দৃষ্টিহীনদের বিদ্যালয়, ৩০টি মূক বধিরদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাত্র ৩টি মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল।

২০০০ সালে এই বিশেষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০০ (NCERT. UNESCO Regional Workshop Report, 2000), বর্তমানে ভারতে বিশেষ শিক্ষাসংক্রান্ত দুটি ধারা দেখা যায় (Two Tracks, Pijl & Meijer, 1991)। একটি সমান্তরাল, অপরটি স্বতন্ত্র। একটি পৃথকীকরণের (Segregation) অপরটি সমন্বয়ের (Integration) ভিত্তিতে স্থাপিত।

যে বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও চলাফেরাজনিত সমস্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্ত, তাদের পাঠক্রম অনেকটাই সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমের মতোই। প্রয়োজনমতো পাঠক্রম ও পদ্ধতির রদবদল ঘটানো হয়। কিন্তু মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ পাঠক্রমের প্রয়োজন, সাধারণ পাঠক্রমের রদবদল ঘটিয়ে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার চাহিদা সম্ভব নয়।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে বিশেষ শিশুদের শিক্ষার ধারণাটি পরিষ্কার হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ শিশুদের শিক্ষা স্বতন্ত্র না করে বরং সাধারণ বিদ্যালয় তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ শিক্ষার্থীদের আলাদা বিদ্যালয় সৃষ্টি না করে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে 'সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান' (Supporting institution) বলে গণ্য করা হয়েছে (NCF, 2005)। ১৯৯২ সালের Programme of POA Action-এ সমন্বিয়ত শিক্ষার (Integrated education) উন্নয়নের কথা উল্লিখিত আছে। ১৯৯২ POA-এ আরও বলা আছে, যে সমস্ত বিশেষ শিশুকে সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া যাবে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা দেওয়া হবে। এবং যে সমস্ত শিশু বিশেষ বিদ্যালয়ে বিদ্যারত, তারা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার উপযোগী হলে তাদেরকেও সাধারণ বিদ্যালয়ে সরিয়ে আনা হবে। (MHRD, POA, 1992)। এই ব্যবস্থাকে (Pragmatic Placement Principle) বলা হয়।

১৯৯৪-এর Salamanca Statement-এর সুপারিশে বিশেষ বিদ্যালয়গুলির একটি বিকল্প ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বিশেষ বিদ্যালয়গুলির কাজের পরিধি শুধুমাত্র যারা বিশেষ বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকছে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রও স্থাপিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে সাধারণ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, পাঠক্রম ও পদ্ধতির গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিদ্যালয়ের সহায়তা নেওয়া হয়।

সুতরাং বলা যায় বর্তমানে বিশেষ বিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয় বা বিশেষ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ক্রমে কমে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে বিশেষ শিক্ষা তাই সাধারণ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

তাই শিক্ষা নীতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বিশেষ শিশুদের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মনে রাখা প্রয়োজন।

- **প্রয়োজনীয় ধারণা (KEY CONCEPT)**

ব্যতিক্রমী ব্যক্তি (Exceptional Individual) :

সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অন্যান্য মানুষের চাইতে স্বতন্ত্র, তা হতে পারে দৈহিক, মানসিক বা সামাজিক, এঁদেরকে বলা হয় ব্যতিক্রমী বা exceptional individual।

ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু (Visually Impaired Child) :

যে শিশুর দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ১/২০ ভাগের কম এবং যে শিশু দেড় মিটার দূরত্ব থেকে আঙুল গুনতে পারে না তাকে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলা হয়।

মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mild Mental Retardation) :

বয়স অনুযায়ী বৌদ্ধিক কার্যাবলি ও আচরণে যদি প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলা হয়।

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী (Orthopedically Handicapped) :

যে শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ অস্থিসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার উপর প্রভাব ফেলে, তাকে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বলা হয়।

শিখনে অক্ষমতাসম্পন্ন শিশু (Learning Disabled Children) :

যদি শিশুদের মধ্যে বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও পারদর্শিতার মধ্যে বিস্তর ফারাক হয় তাকে শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থী বলা হয়। কথা বলা, লিখে মনের ভাব প্রকাশ, শুনে কোনো বিষয়বস্তু বোঝা, পড়ে বোঝা, পড়া বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে যদি সীমাবদ্ধতাগুলি কোনো শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হয় তবে সেই শিশুটি শিখনে অক্ষমতার শিকার।

৭.৮ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(i) নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ শিশুদের ক-টি ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(ii) ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিবিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(iii) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কীভাবে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে পারবেন?

(iv) ব্যাহত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

(v) ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্য কী সংক্ষেপে বলো।

(vi) কোন্ কোন্ উপকরণ ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

(vii) ব্যাহত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর কোন্ উপসর্গ দেখে শিক্ষক চিনতে পারবেন?

(viii) কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিনতে সাহায্য করে?

(ix) মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

(x) অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণে জন্য কী উপসর্গ দেখা দরকার?

(xi) অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদাগুলি কী কী?

(xii) অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের শিক্ষামূলক কোন্ কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা আলোচনা করো।

(xiii) শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণে উপায় বর্ণনা করো।

(xiv) শিক্ষক কীভাবে শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের অক্ষমতার হার বুঝবেন ব্যাখ্যা করো।

(xv) শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে সহায়তা করবেন নিজের ভাষায় লেখো।

গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

(1) Chintamoni Kar (1992), Exceptional Children : Their Psychology and Instruction Sterling, Publishers, New Delhi.

(2) Hallahan, D.P. and Kauffnan, J.M. (1991), Exceptional Children : Introduction to Special Education, Prentice Hall Interaction Limited, London.

(3) সাহা মিনতি, সেন সৌম্যশ্রী, ধর্মপান রোহিণী (২০১৪), উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিজ্ঞান (দ্বাদশ শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ।

(4) দেবাশিস পাল (২০১৫), প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণে সমকালীন শিক্ষা, রীতা পাবলিকেশন।

Names of website :

W.L. Heward (2014) Characterisation of Children with Mental Retardation. Pearson Allyn Bacon Prentice Hall. file : IIC : /INCOMING/Characteristics of Children with Mental Retardation.

অধ্যায় ৮

লিঙ্গ, বিদ্যালয় এবং সমাজ
(GENDER, SCHOOL AND SOCIETY)

৮.০ ভূমিকা (Introduction)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ পুরুষ ও মহিলা সম্পর্কে সামাজিক নির্মাণকরণ ও সমসাময়িক বিকাশকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (Social Construction of Masculinity and Feminity – A Brief Description with Focus on Contemporary Development)

৮.৩ লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণ বিদ্যালয় পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া, সহপাঠীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া ভারসাম্য (Including Gender Balance in School Curriculum)

৮.৪ অনুশীলনী (Unit end exercise)

৮.০ ভূমিকা (Introduction) :

ভারতবর্ষে লিঙ্গ বৈষম্য কোন নতুন ঘটনা নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। বর্তমানে শিক্ষাপ্রসারের সাথে সাথে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত সমাজ বুঝতে শুরু করেছে যে স্ত্রী-পুরুষের সমান মর্যাদা না থাকলে তা সমাজের উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর। সমাজের এই চিন্তাধারা যদি ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে বিকশিত করতে হয় তবে তা শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে লিঙ্গ, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা করা হল।

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা —

- সামাজিক নির্মাণকরণ কাকে বলে তা বলতে পারবে।
- লিঙ্গ সমতা কাকে বলে তা বলতে পারবে।
- পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া, সহপাঠীদের মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ার কীভাবে লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে সমতা আনতে পারে তা ব্যবস্থা করতে পারবে।

৮.২ পুরুষ ও মহিলা সম্পর্কে সামাজিক নির্মাণকরণ ও সমসাময়িক বিকাশকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (Social Construction of Masculinity and Feminity : A Brief description with Focus on Contemporary Development):

পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে সামাজিক নির্মাণকরণ (Social Construction) সম্পর্কে আলোচনা করার আগে জানা প্রয়োজন যে Social Construction বা সামাজিক নির্মাণকরণ কাকে বলে। সংক্ষেপে এবং সরলভাবে বললে বলা যায় যে আমাদের সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে যা জনগণের জ্ঞাত আছে বা জনগণ সঠিক বলে মনে করে, সেইসব বিষয় সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে হলেও সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। যেমন অর্থ, নাগরিকতা, সাহসিকতা, পুরুষ/মহিলা (জেন্ডার) সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি। সামাজিক নির্মাণকরণে মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের ভিত্তি হল নৈর্ব্যক্তিকতা (reality) বা বাস্তবতার (objectivity) সমালোচনা।

ম্যারিক, ক্রফোর্ড এবং পোপ (Markeck, Crawford & Pope)-এর মতে সামাজিক নির্মাণকরণের মৌলিক ধারণাগুলি হল—

1. **সামাজিক নির্মিতিবাদ হল জ্ঞানের তত্ত্ব (Social Constructivism is a theory of Knowledge) :**

   কীভাবে কোনোকিছুর অর্থ গড়ে ওঠে তার উপর সামাজিকীকরণ গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক নির্মিতিবাদ 'পজিটিভিজম (Positivism)' দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ বা বিরোধিতা করে। পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে সবকিছুই বাস্তব থাকে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে মন নিরপেক্ষ। অর্থাৎ মন কোনোকিছুকে নির্মাণ করে না। সমাজ দ্বারা নির্মিত হয়, মন নিরপেক্ষভাবে তা মেনে নেয়।

2. **জ্ঞান হল সমাজ প্রভাবিত (Knowledge is a Social Product) :**

   ম্যারিক, ক্রফোর্ড এবং পোপ বলেন সমাজের বিজ্ঞ জনগণ সমবেতভাবে যা বাস্তব বলে মনে করেন তাই হল জ্ঞান (Knowledge)। সেই কারণে বলা হয় কোনোকিছুর জ্ঞান কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, সমাজ নির্মাণকরণ তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এবং মনে করে জ্ঞান বা Knowledge কেবলমাত্র সামাজিক বিষয় নয়, সমাজ দ্বারা প্রভাবিত এবং নির্ধারিত।

3. **সামাজিক নির্মিতিবাদ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (Social Constructivism is a Dynamic Process):**

   জ্ঞান এবং কোনো কিছুর অর্থ স্থায়ী নয়। যে-কোনো জ্ঞান পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয় এবং তা সংশোধনযোগ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—বহু পূর্বে মানুষের জ্ঞান ছিল যে পৃথিবীর চারদিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করে। এই জ্ঞানও সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা যারা এটিকে সঠিক বলে মনে করেছিল। কিন্তু আরও পরে প্রমাণিত হয় সূর্যের চারদিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এই জ্ঞানও প্রমাণিত হয় সমাজের মানুষের দ্বারা। সুতরাং বর্তমান জ্ঞান ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হতে পারে।

4. **ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন (The Individual and Society are inseperable) :**

   সমাজ নির্মাণকরণকারীদের মতে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কোনো কিছুর অর্থ সৃষ্ট করতে পারে। কারণ কোনো কিছুর অর্থ সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কেই প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজনই নয় ব্যক্তি এবং সমাজ ছাড়া কোনোকিছুর অর্থ তৈরি করা যেতে পারে না।

জেন্ডার এবং সমাজ নির্মাণকরণ (Gender and social construction) :

অ্যালাসপ এবং লেমন (Alsope & Lemon) মনে করেন জেন্ডার সচেতনতা দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত—

(1) **বস্তুবাদী তত্ত্ব (Materialistic theory) :** এখানে সম্পর্কিত পরিবেশের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যা জেন্ডারের ভূমিকার জন্য দায়ী।

(2) **অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্ব (Non-contextual theory) :** এই theory-তে জেন্ডারের সঙ্গে যুক্ত ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ সমাজে মহিলা ও পুরুষ সম্পর্কে যে পৃথক সচেতনতা তা শুধুমাত্র জৈবিকভাবে নির্ধারিত বা স্থির হয় না। আংশিক হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

West এবং Zimmerman-এর মতে জেন্ডার কোনো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নয়, সামাজিক বিষয়। নারী-পুরুষ সমাজের একটি সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং শক্তিশালী বিভাজন, দুটি ভিন্ন সত্তার নামকরণ হয়েছে তাদের ভিন্ন দৈহিক গঠনের জন্য যা একেবারেই প্রকৃতিগত। কিন্তু নারী-পুরুষের বিভাজন তাদের দায়িত্ব কর্তব্য কার্যকলাপগত পার্থক্যের জন্য সমাজ বহু অংশে দায়ী। অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিভাজনে তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যতটা দায়ী তার থেকে অনেক বেশি দায়ী সামাজিক বিষয়।

জেন্ডারের ভূমিকা এবং সমাজ নির্মাণকরণ (Role of Gender and Social Construction) :

মানুষ সমাজবন্ধ জীব। সমাজের রীতিনীতি আইন-কানুন সবই সমাজের স্বার্থে রচিত। সামাজিক রীতিনীতি এবং আদর্শ দ্বারা 'জেন্ডার' অর্থাৎ মহিলা বা পুরুষের আচরণ নির্দিষ্ট করা হয়। পুরুষ বা মহিলাদের নিকট থেকে কী ধরনের ভূমিকা বা আচরণ প্রত্যাশা করা হবে সেই সামাজিক নিয়ম বা আদর্শ সমাজের মানুষ দ্বারাই সৃষ্ট। মহিলা-পুরুষের আচরণে বৈচিত্র্য নির্ভর করে প্রধানত সমাজ-সংস্কৃতির উপর। কোনো জাতির ক্ষেত্রে মহিলাদের নিকট থেকে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা হয় তা সেই জাতির সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—পাশ্চাত্য দেশে একজন অবিবাহিতা মহিলা থেকে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা হয় ভারতীয় নারীর ক্ষেত্রে তা চিন্তা করতে পারি না। প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষের আচার-আচরণ দেখেছোটো শিশুরা নিজেদের নারী ও পুরুষ বলে নিজেদের আলাদাভাবে চিনতে শেখে। তারা জগতসংসারে 'ছেলেদের কাজ' ও 'মেয়েদের কাজ' বলে দুটি পৃথক ব্যাপার বুঝতে শেখে। অর্থাৎ জেন্ডারের ভূমিকাতে সামাজিক নির্মাণকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অগ্রগতি যাচাই (Check your Progress) :

- **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

  (ক) সামাজিক নির্মাণকরণ বলতে কী বোঝ?

  (খ) বস্তুবাদী তত্ত্ব বলতে কী বোঝ?

৮.৩ লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণ—বিদ্যালয় পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া, সহপাঠীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া ভারসাম্য (Including Gender-balance in School Curriculum. Text book, Classroom Processes, Peer Interaction and Teacher Student Interactions)

1997 খ্রিস্টাব্দে UNESCO প্রস্তাব করে যে শিক্ষা-পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। UNESCO পরিষ্কার করে বলে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বা জেন্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ বলতে বোঝায় শিক্ষা কর্মসূচির সমস্ত ক্ষেত্রে যেন নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন—পাঠক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া, সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়াকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং এ ব্যাপারে UNESCO-এর রিপোর্ট বলা হয় যে এই ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

- **বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করা (Balance in School Curriculum) :**

  UNESCO এই ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছে—

  - পাঠক্রম রচনার কমিটিতে লিঙ্গ সচেতন সমসংখ্যক মহিলা এবং পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
  - পাঠক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বালক ও বালিকা উভয়েরই চাহিদা পূরণ করতে পারে।
  - প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে লিঙ্গ সচেতনতা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হবে।
  - বালক-বালিকাদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, পাঠক্রমের রূপরেখা এবং শিক্ষার্থীর উপকরণ তৈরি করতে হবে।
  - নতুন পাঠক্রম চালুকরণে সব শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত হবে এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল হবে।
  - পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে প্রাথমিকভাবে যে পরীক্ষা করা হয় (Pilot testing) সেখানে সমসংখ্যক বালক এবং বালিকা থাকবে।

- লিঙ্গ-ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লেখক ও শিল্পীদের নির্বাচন করতে হবে। তারা যেন লিঙ্গ-সচেতন হয়।
- লিঙ্গ-ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ওয়ার্কশপের কর্মসূচিগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে।
- পাঠক্রমের অধ্যায়গুলি এবং শিক্ষা-উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করবে।
- শিক্ষা-উপকরণগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

- **1961 খ্রিস্টাব্দের হংস মেহেতা কমিটি :** এই প্রসঙ্গে 1961 খ্রিস্টাব্দে হংস মেহেতা কমিটি লিঙ্গবৈষম্যের ভারসাম্য বজায় রক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি সুপারিশ করেন।
- **পাঠক্রম পৃথকীকরণ :** হংস মেহেতা কমিটিতে বলা হয় যে পাঠক্রম তৈরি হবে ব্যক্তিগত ক্ষমতা, আগ্রহ ও মনোভাবের উপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্যের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। প্রতিটি শিশুই চরিত্রগত দিক থেকে পৃথক পৃথক। তার উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম তৈরি হওয়া উচিত।
- **প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম :**

  প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের পাঠক্রমে অবশ্যই কোনো প্রভেদ থাকবে না। ছেলেদের বিষয় আলাদা, মেয়েদের বিষয় আলাদা এইরূপ ধারণাগুলি সামাজিক অনুবর্তনের দ্বারা গঠিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকা আরও বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করতে হবে।
- **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :** 14 বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে যেন একই ধরনের হয়। লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনোরকম কোনো পার্থক্য পাঠক্রমে থাকবে না। সাধারণ পাঠক্রমে সবার জন্য গৃহবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই স্তরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা দুই ধরনের শিক্ষাকর্মী থাকবে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য ছাত্রী আবাস তৈরি করতে হবে। দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বৃত্তির ব্যবস্থাও থাকা উচিৎ। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সুবিধা থাকা উচিত।

মাধ্যমিক স্তর :

কমিটি সুপারিশ করে যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বৃত্তিশিক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করলেও কোনো শিল্প বা হাতের কাজকে পাঠক্রমে আবশ্যিক অংশ করতে হবে।

সাধারণ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। এই বৃত্তিশিক্ষা নিম্নমাধ্যমিকে শুরু হবে এবং তিন বছর ধরে চলবে। কমিটি আরও বলে যে কী কী ধরনের বৃত্তি বা পেশার প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে গবেষণা চালানো উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে পাঠক্রম আবার বিভাজন করা উচিত। যাতে ছাত্রীদের একটি অংশ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং অন্য দলটি বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা নেবে।

৮.৩.১ পাঠ্যপুস্তক রচনা (Text Books Preparation) : একটি ভালো পাঠ্যবই সবসময়ই লিঙ্গসমতা বজায় রেখে রচনা করা উচিত। পাঠ্য বইয়ের বিষয় উপস্থাপনা এমন হবে না যাতে করে কোনোরকমভাবে লিঙ্গবৈষম্য তৈরি করে। তাই পাঠ্যবই নির্বাচন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর রাখা উচিত।

- পাঠ্যবই-এ কোনো ভাষা, ছবি দেওয়া যাবে না যা লিঙ্গবৈষম্যকে নষ্ট করে।
- পাঠ্যবিষয়গুলির গল্প এবং অনুশীলনগুলি বালক এবং বালিকাদের প্রতি সমভাবে নজর রাখে। এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- অনুশীলনের প্রশ্নগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে কোনো বিভেদ না থাকে। মানে বালিকাদের জন্য আলাদা প্রশ্ন, এমন যেন না হয়।

- সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, কোনো দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে বালক-বালিকাদের একইভাবে ক্ষমতায়ন করতে হবে।
- গৃহকাজ, স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটিতে বালক-বালিকাদের সমগুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে উদাহরণ দেওয়ার সময় বা ছবি ব্যবহার করার সময় বালক-বালিকাদের সমগুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ কোনো কাজের উদাহরণ দেওয়ার সময় যেন শুধুমাত্র ছেলে বা শুধুমাত্র মেয়েদের নাম ব্যবহার করা না হয়।
- পাঠ্যবই বালক-বালিকাদের মধ্যে সম-পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ করে ভাষা ও সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে মেয়েদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, সমস্যা প্রভৃতি বিষয় থাকা উচিত। কমিটি সুপারিশ করে যে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৮.৩.২ শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া এবং লিঙ্গবৈষম্যের ভারসাম্য রক্ষা করা (Balance in Classroom Process and Gender Inequality) :

লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। UNESCO-র প্রস্তাব অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট তালিকার (Table)-এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরে সিদ্ধান্ত করা। নিম্নে Table-এর একটি নমুনা দেওয়া হল—

তালিকা (1) বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা				
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা	বালিকা	বালক	মোট	শ্রেণির মনিটর বালক না বালিকা
,,				
,,				
,,				
,,				
,,				

তালিকা (2) বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (1)	মহিলা শিক্ষক	পুরুষ শিক্ষক
নির্দিষ্ট শ্রেণি (2)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (3)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (4)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (5)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (6)		
মোট		

3. (ক) বিদ্যালয়ের প্রধান : মহিলা/পুরুষ

(খ) বিদ্যালয়ে সহ প্রধান : মহিলা/পুরুষ

4. (ক) বালক এবং বালিকা একই বিষয় পড়ে :

(খ) যদি না হয় বালিকারা কি পড়ে যা বালকেরা পড়ে না :

5. শিক্ষার্থীরা কি লিঙ্গ অনুযায়ী পৃথকভাবে বসে?

6. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘোরাফেরা করেন তখন কি তিনি বালক বা বালিকার নিকট থেমে যান?

7. শ্রেণিকক্ষের কাজ শেষ হওয়ার পরে জানতে হবে শিক্ষক কতবার বালক বা বালিকার সঙ্গে কথা বলেছে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ :শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দু-ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়—

(ক) পাঠদানের সময় শিক্ষক কতবার বালক এবং বালিকাকে সম্বোধন করেছেন তার সংখ্যা নথিভুক্ত করা হয়।

(খ) কতবার বালক বা বালিকাদের চকবোর্ডে কাজ করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ডেকেছেন।

তালিকা 3. কতবার বালক বা বালিকা শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করেছে তার তথ্য :

শিক্ষক ছাত্র বা ছাত্রীকে সম্বোধন করেছে	বালিকা	বালক	মোট
শিক্ষার্থী চকবোর্ডে গেছে			

এইভাবে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্যকে দূর করে সমতা আনয়ন করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষের প্রক্রিয়ায় লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা দেখা যেতে পারে।

৮.৩.৩ লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহপাঠীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (Peer Interaction for Balance in Gender Inequality) :

লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে ক্ষমতা আনয়নের ক্ষেত্রে সহপাঠীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—যে বিদ্যালয়ে বালকের সংখ্যা বেশি এবং বালিকার সংখ্যা কম সেখানে যে ধরনের মিথস্ক্রিয়া হয় তা অনেক সময় লিঙ্গসমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় বালকের আক্রমণাত্মক আচরণ শ্রেণিকক্ষের আচরণ এবং আবহাওয়ার মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে Chile (চিলি)-র একটি সমীক্ষার তথ্যে দেখা গেছে যে বালকেরা বালিকাদের তুলনায় অধিক আক্রমণাত্মক আচরণ করছে।

আবার দেখা যায় Peer-Interaction মধ্য দিয়েই বালকদের উপস্থিতি বালিকাদের আত্মবিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ের (যেমন গণিত এবং বিজ্ঞান) উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ছাত্রীদের নিজ সম্পর্কে প্রত্যাশার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ (যেমন-) তাদের সমীক্ষায় লিঙ্গ-পার্থক্যের কারণে সহপাঠীদের মিথস্ক্রিয়ার যেসব প্রভাব দেখা গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- মিথস্ক্রিয়ার উপর নেতিবাচক প্রভাব
- শ্রেণিকক্ষের আচরণ এবং আবহাওয়া ব্যাহত হয়।

- বালিকাদের আক্রমণাত্মক আচরণ, বালিকাদের আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- বিশেষ বিশেষ বিষয়ে (গণিত, বিজ্ঞান) বালিকাদের খারাপ ফল।
- বালিকাদের বিদ্যালয় অনেক বেশি শৃঙ্খলামণ্ডিত।
- বিদ্যালয় লিঙ্গভিত্তিক হবে না কো-এডুকেশন হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দেয়।
- অনেক সময় দেখা যায় জ্ঞানমূলক শিক্ষকের স্টাইলের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-পার্থক্যের প্রভাব থাকে।

এছাড়াও আরও যেসব তথ্য উক্ত সমীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে তা হল—

- শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষণের বক্তব্য সহপাঠীরা তাদের মধ্যে আলোচনা করে অনেক কিছু শেখে। সহপাঠীরা নিজেদের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করে এবং জ্ঞান বিনিময় করে।
- সহপাঠীদের আচরণ (ভালো আচরণ বা বিশৃঙ্খল আচরণ) শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে (Lavy and Schlosser, 2007)
- সহপাঠীদের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এই শিক্ষকদের শ্রেণি প্রত্যাশার পরিবর্তন ঘটে (Cunninegham and Andrews, 1986)।

- **শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গ-পার্থক্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কতকগুলি করণীয় বিষয় হল—**
    - শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী সমান অথবা ছাত্রী বেশি হওয়া প্রয়োজন। তবে ছাত্রী সংখ্যা খুব বেশী এবং ছাত্র সংখ্যা খুব কম এমন না হলেই ভালো।
    - ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকের আচরণ একইরকম হওয়া উচিত। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব হওয়া উচিত নয়।
    - পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে ছাত্র এবং ছাত্রীদের সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।
    - শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোনোভাবে জেন্ডার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

৮.৩.৪ লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব (Teacher-Student Interaction for Balance in Gender Inequality) :

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জেন্ডারের প্রভাব রয়েছে। 1960 খ্রি.-1990 খ্রি. পর্যন্ত বেশিরভাগ গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে শ্রেণিকক্ষে বালক এবং বালিকাদের উপর শিক্ষকের আচরণের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। (Sadker and Sadker 1992, Tennen 1991) দেখা গেছে যে বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষকগণ পুরুষ ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং বিশ্লেষণাত্মক, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন (Sadker and Sadker, 1992)। Thorne (1979) বলেন যে শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ই পুরুষ শিক্ষার্থীকে বারবার প্রশ্ন করে শ্রেণিকক্ষে প্রাধান্য বিস্তারে উৎসাহিত করেন।

Kelly (1988)-র মতে—শিক্ষক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বালক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। অধিক প্রশ্ন করে। অর্থাৎ Kelly-র এর মতে শিক্ষক বালক শিক্ষার্থীদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়।

Dale এবং Spencer (1980)-এর মন্তব্যে ধরা পড়ে 58% বালকদের ক্ষেত্রে 42% বালিকাদের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতিক্রিয়া করে।

পাঠদানের ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষক দ্রুত পাঠদান করেন, অধিক সময় কথা বলেন, দ্রুত পাঠের বিষয় পরিবর্তন করেন। অপরদিকে শিক্ষিকাগণ উৎকর্ষতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, অধিক ধৈর্যশীল এবং গণতন্ত্রসম্মত আচরণ করেন (Chaver 2000)।

Francies (2004)-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বালিকাদের তুলনায় বালকরা শ্রেণিতে অধিক মিথস্ক্রিয়া করে।

সবশেষে বলা যায় যে শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করলে বালক এবং বালিকারা যেন সমভাবে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত যাতে বালক-বালিকা সমানভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে।

- **অগ্রগতি যাচাই (Check your Progress) :**

  1. সমাজ নির্মাণকরণে জেন্ডারের ভূমিকা কী?
  2. বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন?
  3. জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা লিখুন।
  4. লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কী?

প্রয়োজনীয় ধারণা (Key Concepts) :

- সামাজিক নির্মাণকরণ (Social Construction)
- বিদ্যালয়ে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণ (Gender Inclusion in School)
- লিঙ্গবৈষম্য (Gender Inequality)

৮.৪ অনুশীলনী (Unit end exercise) :

- **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—**

  (i) 'ব্যক্তির জ্ঞান সমাজ দ্বারা প্রভাবিত'— ব্যাখ্যা করো।

  (ii) সমাজ নির্মাণকরণ কেন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া?

  (iii) পাঠ্যপুস্তক কীভাবে gender balance -এ সহায়তা করতে পারে?

  (iv) শিক্ষক কীভাবে সহপাঠীদের মধ্যে সার্থক মিথস্ক্রিয়া সম্পাদন করে gender-balance তৈরি করতে সক্ষম হয়?

  (v) UNESCO বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপের কথা বলেছে?

  (vi) লিঙ্গবৈষম্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হংস মেহেতা কমিটি কী কী সুপারিশ করছে?

গ্রন্থপঞ্জি (References) :

- Gender School and Society – Dr. Dalvinder Kumar & Alka Rani
- Gender School and Society – Dr. K.K. Sharma & Dr. Punam Miglani
- শিক্ষায় সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি — সোনালী চক্রবর্তী

অধ্যায় ৯

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের বিষয়সমূহ - ১
(CONTEMPORARY INDIAN ISSUES - 1)

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৯.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক মূল্যবোধসমূহের অনুশীলন সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা (Critical Appraisal of Constitutional Values as Practised in Educational Institution)

৯.৪ বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা (First Generation Learners in School)

৯.৫ গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in Democracy)

৯.৬ শান্তির জন্য শিক্ষা (Education for Peace)

৯.৭ বিদ্যালয়ের ভাষা (Language within School)

৯.৮ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

৯.৯ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

৯.১ ভূমিকা (Introduction) :

সাম্প্রতিককালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। এই এককে তেমন কতকগুলি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি। সেগুলির মধ্যে অন্যতম — বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা, বিদ্যালয়ে ভাষা নির্বাচন, শান্তির জন্য শিক্ষা। এ ছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেসকল সাংবিধানিক মূল্যবোধ অনুশীলন করা হয় তার গুণগত বিশ্লেষণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়— তা বর্তমানে একটি চর্চার বিষয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও আদর্শ না জাগ্রত করলে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া দরকার। এই একককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা নিম্নে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে সক্ষম হব।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

(ক) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে কী কী সাংবিধানিক মূল্যবোধ চর্চা করা হয়। — তার একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করব।

(খ) বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ, তাদের অসুবিধা, তাদের প্রতি বিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রভৃতি জানব।

(গ) শান্তির জন্য শিক্ষার তাৎপর্য ও তা জাগ্রত করার পদ্ধতিগত জ্ঞান আহরণ করব।

(ঘ) গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে জানব।

(ঙ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার ভাষা কী হওয়া উচিত— তা আলোচনা করব।

৯.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক মূল্যবোধসমূহের অনুশীলন সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা (Critical Appraisal of Constitutional Values as Practised in Educational Institutions)

ভারতের সংবিধান হল আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের আধার। বিশেষত সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble), মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)-গুলির মধ্যে জাতীয় মূল্যবোধগুলির উল্লেখ আছে। নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive Principles) মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। মূল্যবোধ বলতে বোঝায় কিছু আদর্শগত বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর যুগের আচরণ। ভারতীয় সংবিধানে যে মূল্যবোধগুলি উল্লিখিত আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার অনুশীলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মূল্যবোধ (Value) :

মূল্যবোধ বলতে এমন কিছু বিষয়কে বোঝানো হয়, যেগুলি মানুষ তাদের ভাবনা, অনুভূতি ও কাজের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ও অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে। মানুষের যে-কোনো কাজ, চিন্তা, ভাবনা, আবেগ বা অনুভূতি, যা সমস্ত দিক থেকে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে, তাকেই মূল্যবোধ বলা যেতে পারে।

কোনো রাষ্ট্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, জাতি এবং বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যে সব মূল্যবোধ গ্রহণ করে এবং চর্চা করে, সেগুলিকেই জাতীয় মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধ একপ্রকার চিরন্তন বিশ্বাস। এটি মানুষের আচরণকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মূল্যবোধগুলিরও পরিবর্তন হয়।

সাংবিধানিক মূল্যবোধ (Constitutional Values) :

ভারতের সংবিধানের অন্তর্গত মূল্যবোধগুলি সার্বজনীন, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক প্রকৃতির। ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রস্তাবনায় মৌলিক মূল্যবোধগুলি হল :

(ক) গণতান্ত্রিক নীতি — স্বাধীনতা, সাম্য, ধৈর্য, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মর্যাদা দান এবং দলবদ্ধ কাজ করার ক্ষমতা।

(খ) সমাজবাদী নীতি — সুযোগসুবিধা ও অবস্থানগত বিষয়ে সাম্য এবং শ্রদ্ধা, জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও সম্পদের সমবণ্টন।

(গ) ধর্মনিরপেক্ষ নীতি — সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম যেন কোনো নাগরিকের অধিকারে বাধা না হয়ে ওঠে।

সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংবিধানের আত্মা বলা হয়। মূল্যবোধের আধার হিসেবে এই প্রস্তাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—

> ''আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে ৪২-তম সংবিধানের সংশোধনীর দ্বারা প্রস্তাবনায় দুটি নতুন মূল্যবোধ যুক্ত হয়েছে — সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতা (Socialist এবং Secularism)। সংবিধানের তৃতীয় অংশে উল্লিখিত (Part-III) মৌলিক অধিকারসমূহ এবং চতুর্থ অংশে (Part-IV) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিও মূল্যবোধের পরিচায়ক। মৌলিক অধিকারগুলি ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করে। ২০০২ সালে ৮৬-তম সংশোধনীর মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার (Right to Education), মৌলিক অধিকার হিসেবে ২১ (ক) ধারাতে যুক্ত হয়।

সংবিধানের ৫১ (ক) ধারাতে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহের (Fundamental Duties) মধ্যেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ প্রকাশ পায় যেমন দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা, মানবিকতা, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন, লিঙ্গসাম্যতা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও অনুসন্ধান, ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রয়াসে উৎকর্ষতা।

সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধগুলির উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবনদর্শন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালন পদ্ধতি ইত্যাদি রূপায়িত হয়। বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর যুগে সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলি — স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সাম্য, সমাজতন্ত্র, মৈত্রী, দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা দরকার পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মধ্যে জাতীয় মূল্যবোধগুলির প্রকাশ ঘটলে, শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে।

অগ্রগতি যাচাই (Check your Progress) :

(ক) ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত তিনটি মূল মূল্যবোধ (Core Values) কী কী?

(খ) মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

(গ) সংবিধানের প্রস্তাবনায় কী কী মূল্যবোধের কথা বলা আছে?

(ঘ) সাংবিধানিক মূল্যবোধ চর্চা করার তাৎপর্য কী?

৯.৪ বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা (First Generation Learners in School)

৯.৪.১ ভূমিকা (Introduction) :

বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী বলতে সেই শিক্ষার্থী যার পিতামাতা কোনোভাবে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এই সকল শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে, তখন তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের শিক্ষামূলক সাফল্যের হার বা শিক্ষায় পারদর্শিতার মান অন্যদের তুলনায় অনেক কম হয়। অবশ্য এগুলোর পিছনে অনেক কারণ আছে। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার সুরক্ষা দেয়। এই উপ-এককটির পাঠ করার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে দেওয়া হল।

৯.৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

(ক) বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী বলতে আমরা কাদেরকে বোঝাব?

(খ) বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(গ) শিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার মূলস্রোতে আনার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

৯.৪.৩ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী :

শিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী বলতে যে শিক্ষার্থীর পিতামাতা কোনোরূপ প্রথাযুক্ত শিক্ষা (Formal Education) গ্রহণ করেননি বা সুযোগ পায়নি সেই শিক্ষার্থীকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী (FGL) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় —

First generation learners are those who have the access to education at school for the first time in their entire generation.

যেহেতু তারা বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রথম অংশগ্রহণ করে, ফলে বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ের বাইরে তারা বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

৯.৪.৪ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য :

(ক) শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা পিতা-মাতার কাছ থেকে উৎসাহ কম পায়।

(খ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বা আত্ম-প্রত্যয় (Self-Confidence) কম থাকে।

(গ) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

(ঘ) বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ (Maladjustment) বেশিমাত্রায় দেখা যায়।

(ঙ) শিক্ষার গুরুত্বটাও তারা কম উপলব্ধি করে।

(চ) জীবনের আশা-আকাঙ্খার (Aspirations in Life) স্তরও কম।

(ছ) এরা শিক্ষায় পারদর্শিতার (Academic Performance) নিরিখে পিছিয়ে পড়া।

৯.৪.৫ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার মূলস্রোতে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ :

(ক) স্থানীয় এলাকার সাংস্কৃতিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচিত হওয়া দরকার।

(খ) তপশিলি উপজাতিদের (Tribals) ভাষা চর্চা ও ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

(গ) বিদ্যালয়ে শিক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যদান দরকার।

(ঘ) শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর কার্যকরী প্রয়োগ দরকার।

(ঙ) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education)-এর দর্শন বিদ্যালয় শিক্ষায় বৃহত্তর অর্থে প্রচার করতে হবে।

(চ) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ মানবিক আচরণ করবে।

(ছ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উদ্‌যাপনের দিনগুলোতে, আলোচনা সভাতে, পিতামাতার সঙ্গে শিক্ষকদের সভাতে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা এবং পরামর্শদান দরকার।

(জ) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাও জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে — এই ভাবনায় তাদের মানব সম্পদ (Human Resource)-কে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress) :

(ক) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হয়?

(খ) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষায় কৃতকার্য করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে?

(গ) শিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

৯.৫ গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in Democracy)

৯.৫.১ ভূমিকা (Introduction) :

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'Demos' এবং 'Kratia' নামক দুটি গ্রিক শব্দ থেকে Democracy শব্দটি এসেছে। 'Demos'-এর অর্থ হল 'জনগণ' আর 'Kratia' শব্দের অর্থ 'শক্তি' বা 'ক্ষমতা'। সুতরাং Democracy বলতে 'জনগণের শক্তি বা ক্ষমতা বা 'Power of the People'-কে বোঝায়। সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, আমেরিকা ও ফ্রান্সের

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিল গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও আদর্শকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব—এই চারটি হল গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শ। আধুনিককালে গণতন্ত্র বলতে জীবনযাত্রার বিশেষ প্রকৃতিকে বোঝায়। এটি একটি জীবনদর্শনও বটে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা।

৯.৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

(ক) গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলি কী কী জানতে পারব।

(খ) গণতন্ত্রের শিক্ষার ভূমিকা সংক্রান্ত দিকগুলি আলোচনা করব।

৯.৫.৩ গণতন্ত্রের মূলনীতি (Principles of Democracy) :

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলির ওপর গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রের চারটি মাত্রা হল—

গণতন্ত্র (Democracy)

নৈতিক মাত্রা	রাজনৈতিক মাত্রা	সামাজিক মাত্রা	অর্থনৈতিক মাত্রা
ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদাকে জনগণের কাছে নিশ্চিত করা	রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ	ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান সমান অধিকার	অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে সকলের সমান সুযোগ দেওয়া

গণতন্ত্রের মূলনীতি :

(ক) সাম্য (Equality) — সকলের সমান অধিকার।

(খ) সহযোগিতা (Co-operation) — পারস্পরিক সহযোগিতাবোধ ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে।

(গ) শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিসংঘাতের অভাব (Absence of Class Distinction and Class Conflict) — সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আর্থসামাজিক, শিক্ষাগত ব্যবধান কমানো কারণ এই ব্যবধান শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংঘাত সৃষ্টি করে।

(ঘ) ব্যক্তির গুরুত্ব (Value of Individual) — ব্যক্তির মূল্য, স্বক্ষমতা, মর্যাদা, চিন্তাভাবনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া।

(ঙ) ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা (Justice and Freedom) — ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ইত্যাদি মূল্যবোধ বা আদর্শগুলোকে ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত করা এবং নিশ্চিত করা।

৯.৫.৪ গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in Democracy) :

গণতন্ত্রকে সফল রূপ দিতে গেলে শিক্ষাব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক মূলনীতি বা আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করে গণতান্ত্রিক শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষকদের ভূমিকা, পাঠক্রম, বিদ্যালয়, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি গণতন্ত্রের আদর্শকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারে। শিক্ষার জন্য যেমন গণতন্ত্রের দরকার, তেমনি গণতন্ত্রের জন্যেও শিক্ষার দরকার। গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

(ক) গণতন্ত্র ও শিক্ষার লক্ষ্য (Democracy & The aim of Education) :

(১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতার বিকাশসাধন করা।

(২) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

(৩) সামাজিক ন্যায়ের প্রতি আস্থা গড়ে তোলা।

(৪) দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটানো।

(৫) আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ সাধন।

(৬) সহযোগিতার মনোভাব ও চরিত্রের বিকাশ সাধন।

(খ) গণতন্ত্র ও পাঠক্রম (Democracy & Curriculum) :

গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হলে পাঠক্রম রচনার সময় নিম্নে উল্লিখিত নীতিগুলিকে ভিত্তি হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে।

(১) পাঠক্রমের বিষয়গুলি সমাজের এবং ব্যক্তির চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্খা পূরণে যেন সমর্থ হয়।

(২) শিক্ষার্থীর নিজ নিজ আগ্রহ এবং প্রবণতা প্রেক্ষিতে পাঠক্রম বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে।

(৩) পাঠক্রম হবে বৃত্তিমুখী।

(৪) শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ।

(৫) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (Inclusive Education) দর্শন বাঞ্ছনীয়।

(গ) গণতন্ত্র এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া : (Democracy & Teaching-Leaning Process) :

এক্ষেত্রে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিগুলি হবে সক্রিয়তাভিত্তিক, জীবনকেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে সমস্যা সমাধান, দলগত কাজ, নির্মাণবাদ, প্রকল্প, সার্ভে, ভূমিকা-অভিনয় (Role-Play) ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং পূর্বের অভিজ্ঞতার পরিমার্জনের সুযোগ পাবে।

(ঘ) গণতন্ত্র ও শিক্ষক : (Democracy & The Teacher) :

শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে শিক্ষক নিম্নে উল্লিখিত ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(১) ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত সম্মান দেবেন।

(২) শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও সামর্থ্যতাকে স্বীকৃতি দেবেন।

(৩) শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামত পোষণের সুযোগ দেবেন।

(৪) শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন।

(৫) শিক্ষক হবেন গণতন্ত্রের পূজারী।

(ঙ) গণতন্ত্র ও বিদ্যালয় : (Democracy & School) :

(১) বিদ্যালয় হবে শিক্ষার্থীদের কাছে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চার কেন্দ্রভূমি।

(২) বিদ্যালয়ের নানাবিধ কার্যাবলিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন ও এটি মতামতের আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল হবে।

(চ) গণতন্ত্র ও শিক্ষা প্রশাসন : (Democracy & The Educational Administration) :

বিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ কার্যাবলি, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের (Decentrilisation) নীতি অনুসরণ করা উচিত। শিক্ষার্থীদেরকে আত্মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেবেন শিক্ষক।

অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress) :

(ক) গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

(খ) গণতন্ত্রের কয়েকটি নীতি উল্লেখ করো।

(গ) শিক্ষায় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

৯.৬ শান্তির জন্য শিক্ষা [Education for Peace]

৯.৬.১. ভূমিকা (Introduction) :

শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ও সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরির জন্য একমাত্র মাধ্যম বা হাতিয়ার হল শিক্ষা। শান্তি ব্যক্তিমানুষের সামঞ্জস্য বিধানের পথনির্দেশ দেয় এবং সকলের মধ্যে মতবিরোধ দূর করে সংগতিবিধান করে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে UNO, UNESCO, UNICEF, IRC, Non-Alignment-Movement, Green Peace Movement, Pacifist Movement প্রভৃতি সংস্থা কাজ করে চলেছে। বিশ্বায়নের যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক অশান্তকর বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তির জন্য শিক্ষা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এক অন্যতম সংযোজন হল শান্তির জন্য শিক্ষা।

৯.৬.২. উদ্দেশ্য (Objectives) :

- শান্তির জন্য শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা পাব।
- শান্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করব।
- শান্তিশিক্ষার বাধাসমূহ সম্পর্কে জানব।
- শান্তির জন্য শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি নির্বাচন করব।

৯.৬.৩ শান্তিশিক্ষার ধারণা (Concept of Peace Education) :

শান্তি হল এক ধরনের আচরণ যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ মনোভাব তৈরি করে। শান্তির মূল ভিত্তি হল পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচার, সততা ও মূল্যবোধ। এটি এক ধরনের প্রক্রিয়া যা মানুষের মধ্যে সঠিক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের বিকাশ ঘটায়।

শান্তির জন্য শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া যা, আন্তঃব্যক্তিক (Inter-personal), জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্ব নিরসন করা। এই শিক্ষা শিশু, যুবক ও পরিণত মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন আনে যা হিংসা ও দ্বন্দ্ব নিরসন করে।

নিম্নলিখিত উৎসগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক শান্তি পাওয়া যায় —

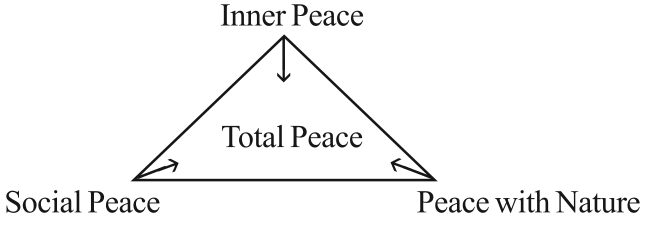

শান্তিশিক্ষা হল মানুষ গড়ার শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক গুণাগুণ বিকশিত হয়। ডেলর কমিশনের রিপোর্টে (১৯৯৬) প্রকাশিত শিক্ষার চারটি লক্ষ্যের মধ্যে Learning to live together এবং Learning to be শান্তি

শিক্ষার কথাই বলে। যে শিক্ষা সামাজিক ন্যায়বিচার, মানব অধিকার, গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার সেই শিক্ষাই হল শান্তির শিক্ষা। শান্তির জন্য শিক্ষা হল একটি দর্শন এবং প্রক্রিয়া যার মধ্যে আছে দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, মূল্যবোধ, গঠনমূলক চিন্তন ইত্যাদি।

৯.৬.৪ শান্তি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Peace Education) :

- ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা গড়ে তোলা।
- ব্যক্তির মধ্যে সময়োপযোগী মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
- ব্যক্তির সংকীর্ণ মনোভাব দূর করা।
- বিশ্বে যুদ্ধের পরিণাম, যুদ্ধের কুফল, হিংসা ইত্যাদি সম্পর্কে বেশি করে সচেতন করা যাতে কোনো দেশ দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ না নেয়।
- সহানুভূতি, ন্যায়, সাম্য, লিঙ্গসাম্য, জীবনের প্রতি যত্নশীল হওয়া, ঐক্য, অহিংসা ইত্যাদি গুণাগুণ শান্তির শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা।
- শান্তির সভ্যতা নির্মাণের উপযোগী দক্ষতা ও সক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।
- ব্যক্তিকে চরিত্রবান ও হৃদয়বান করে গড়ে তোলা।

৯.৬.৫ শান্তিশিক্ষার বাধাসমূহ (Barriers of Peace Education) :

শান্তিশিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাধাদান করে —

(a) রাজনৈতিক বাধা (Political Barrier)

(b) সাংস্কৃতিক বাধা (Cultural Barrier)

(c) অর্থনৈতিক বাধা (Economic Barrier)

(d) বেকারত্ব (Unemployment)

(e) ধর্মীয় বাধা (Religious Barrier)

(f) সামাজিক বাধা (Social Barrier)

৯.৬.৬ শান্তির জন্য শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি (Teaching-Learning Activities for Peace) :

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা (২০০৫), শান্তির জন্য বিষয় উপস্থাপনের সময়কালীন শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করে। যেমন —

(ক) 'সহযোগিতা' (Co-operation) শব্দটির অর্থ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বোঝানো দরকার।

(খ) সমাজবিজ্ঞান বিষয়গুলি পড়ানোর সময়ে একটি শান্তিপ্রিয় বিশ্ব (Peaceful World) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনার সুযোগ দেওয়া।

(গ) ভাষা বিষয় উপস্থাপনের মধ্যে সহিষ্ণুতা, সততা, সংবেদনশীলতার ওপর গল্প বলা বা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করা।

(ঘ) সততা, শ্রম, সহমর্মিতা ইত্যাদি প্রকাশ করে এমন কবিতা বা সংগীত রচনা করার দক্ষতা গড়ে তোলা প্রয়োজন, ভাষা বিষয় চর্চাকালীন।

(ঙ) পরিবেশগত অধঃপতন কীভাবে গরিব মানুষের ক্ষতি করে — তা ব্যাখ্যা করা।

(চ) ভাষা বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে রাগ শান্তিকে ধ্বংস করে তা ব্যাখ্যা করা।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি : (Co-curricular Activities)

(ক) মানব অধিকার দিবস (Human Rights Day), শিশু দিবস (Children's Day), পরিবেশ দিবস (Environment Day), রাষ্ট্রসংঘ দিবস (UN Day) ইত্যাদি দিবসে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(খ) শিক্ষার্থীদের শান্তি, সততা, অহিংসা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নাটক, গান, কবিতা রচনা বা অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

(গ) Story telling, Debate এবং Discussion Session ইত্যাদি বিষয় রাখা দরকার— স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

(ঘ) সহপাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া ও বিদ্যালয় পরিবেশকে শান্তিদায়ক বাতাবরণের অনুকূল করা।

অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress) :

(১) শান্তিশিক্ষা বলতে কী বোঝায়?

(২) শান্তিশিক্ষার কয়েকটি লক্ষ্য বলো।

(৩) বিদ্যালয়ে কীভাবে সহপাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে শান্তিশিক্ষার বিকাশ ঘটানো যাবে?

৯.৭ বিদ্যালয়ের ভাষা (Language within School)

৯.৭.১ ভূমিকা (Introduction) :

বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু হবার আগেই শিশু ভাষা আত্মস্থ করে। ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে তার/তাদের জ্ঞান। শিশুর চিন্তাভাবনা, আবেগ, অনুভূতির পরিচয়— সবকিছুর প্রকাশ সাধিত হয় তার মাতৃভাষাতে। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতার স্বীকৃতি আবশ্যক। তাতে যেমন তারা নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়, তেমনি সাংস্কৃতিক শিকড়ের প্রতি তাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে। ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য একটি বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতা আমাদের একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যেমন দাঁড় করিয়েছে, তেমনি সুযোগের পরিসর বিস্তৃত করেছে।

৯.৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

(ক) ভাষা সম্পর্কে সাংবিধানিক নির্দেশ কী আছে তা সম্পর্কে জানব।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন, কমিটি ও জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশগুলি কী ছিল?

(গ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার — এর সুবিধা ও অসুবিধা কী কী?

৯.৭.৩ ভারতীয় সংবিধানে ভাষার স্থান :

সংবিধানের ৩৪৩ থেকে ৩৫১ নং ধারা পর্যন্ত এবং ৮তম তফশিলে দেশের ভাষা বিষয়ে নানাবিধ নির্দেশ দেওয়া আছে।

(ক) দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে লিখিত হিন্দি হবে সরকারি ভাষা (Official Language) [ধারা ৩৪৩ (১)]।

(খ) সংবিধান চালু হওয়ার ১৫ বছর পর্যন্ত সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হবে [৩৪৩ (২) ধারা]।

(গ) ১৯৬৫ সালে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের একটি সহযোগী সহকারী ভাষা (Associate Official Language) হিসেবে স্থান দেয়।

(ঘ) হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, সংসদের আইনকানুন-এর ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হবে।

(ঙ) ৩৪৫নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্য সরকার রাজ্যের এক বা একাধিক ভাষা ব্যবহারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(চ) ৩৫০ (ক) নং ধারা অনুযায়ী ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত শিশুদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

(ছ) ৮তম তফশিল অনুযায়ী ২২টি ভাষার নাম সংবিধানে উল্লেখ আছে।

৯.৭.৪ বিদ্যালয়ে ভাষার ক্ষেত্রে কমিটি/কমিশন/জাতীয় শিক্ষানীতি :

(ক) মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩) :

মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষায় দুই ভাষা সূত্রের উল্লেখ করে। যার মধ্যে একটি হল— মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা অথবা ক্লাসিক্যাল ভাষার সমন্বয়। অপরটি হল— হিন্দি, ইংরেজি, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, আধুনিক বৈদেশিক ভাষা ও প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত ও পালি) — ভাষাগুলির একটি।

(খ) কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) :

কোঠারি কমিশন রিপোর্টে বিদ্যালয় শিক্ষায় ত্রিভাষা সূত্র (Three Language Formula) হল —

(১) মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা

(২) হিন্দি এবং

(৩) ইংরেজি।

(গ) জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮) :

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮) উল্লেখ করে যে—

- প্রথম ভাষা (First Language) হবে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা।
- হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যগুলোতে দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) হবে যে-কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা বা হিন্দি।
- অহিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যে দ্বিতীয় ভাষা হবে হিন্দি অথবা ইংরেজি।
- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(ঘ) জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা, ২০০৫ (NCF, 2005) :

NCF 2005-এর মতে বিদ্যালয় শিক্ষায় পুরোটাতে বা অন্ততপক্ষে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তবে যেখানে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে সেখানে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শুরু করা যেতে পারে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব থাকলে উত্তর প্রাথমিক স্তর (Post-Primary Stage) থেকে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যম হলে ভালো হয়।

৯.৭.৫ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা :

সুবিধা (Advantages) :

(ক) শিক্ষার সময়কাল সংক্ষিপ্ত হয়।

(খ) ভাষা সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ ঘটে।

(গ) আন্তঃরাজ্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

(ঘ) শিশুদের ভাষাগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতার ভিত্তি মাতৃভাষাতে গড়ে ওঠে এবং তা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করে। ফলে মাধ্যম সর্বদা মাতৃভাষা হওয়া উচিত।

অসুবিধা (Disadvantage) :

(ক) শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হলে শিক্ষার্থীরা বহু ভাষাভাষী একটি শ্রেণিকক্ষের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

(খ) জাতীয় ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে না।

(গ) মাতৃভাষায় লেখা বইপত্র ছাড়া অন্যভাষায় লেখা বইপত্র পড়ার সুযোগ থাকে না।

(ঘ) নানান ভাষায় ভাব বিনিময়ের দক্ষতা প্রসারে বাধা পায়।

অগ্রগতি যাচাই (Check Your Progress) :

(ক) মাতৃভাষা বলতে কী বোঝ?

(খ) শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হলে কী কী ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে শিক্ষার্থীরা?

(গ) তোমার মতে বিদ্যালয় শিক্ষায় কী কী ভাষা শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত?

৯.৮ সংক্ষিপ্তসার (Summary) :

প্রযুক্তি নির্ভর যুগে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, অশান্তি, হিংসা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র ধর্মাচরণ ইত্যাদি জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এই প্রেক্ষাপটে শান্তির জন্য শিক্ষা বিদ্যালয়ে চর্চা করা জরুরি। বিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার মূলস্রোতে রাখার নানাবিধ পদক্ষেপ নেব। বিদ্যালয়ে ভাষা নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকা দরকার। অবশেষে বলব, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, চাহিদা, সামর্থ্য ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার কোনো কিছু সিদ্ধান্ত এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

৯.৯ অনুশীলনী (Unit end Exercise) :

(১) ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত কয়েকটি মূল্যবোধের সম্পর্কে বলো।

(২) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

(৩) গণতন্ত্রে শিক্ষার ভূমিকা কী- ব্যাখ্যা করো।

(৪) মনে করো একটি তৃতীয় শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে ভাষাশিক্ষা দান করছ। এখানে কীভাবে এবং কোন্ সংবিধানের মূল্যবোধ-এর সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবে?

(৫) বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ও ভাষাশিক্ষা বলতে কী বোঝ?

(৬) শান্তিশিক্ষা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির বিবরণ দাও।

(৭) শান্তির জন্য শিক্ষা বলতে কী বোঝ?

(৮) সাংবিধানিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

(৯) গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

(১০) শান্তি বলতে কী বোঝ?

প্রয়োজনীয় ধারণা (Key Concepts) :

- সরকারী ভাষা (Official Language)
- শান্তিশিক্ষা (Peace Education)
- প্রস্তাবনা (Preamble)
- মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)

সহায়ক গ্রন্থ (Reference) :

(১) ভট্টাচার্য্য, ডি. (২০১৪). শিক্ষা ও দর্শন, নিউ দিল্লি : পেয়ারসন্।

(২) Taneja, V. R. (1990). Educational Thought and Practice, New Delhi : Sterling Publishing Pvt.Ltd.

(৩) Ravi, S. (2015). Education in Emerging India, New Delhi : PHI Learning Pvt. Ltd.

(৪) রায়, সুশীল (২০১০). শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

(৫) চ্যাটার্জী, এম. কে. এবং চক্রবর্তী, কবিতা (২০১৪). সাম্প্রতিক ভারতীয় শিক্ষার ধারা, কলকাতা : রীতা বুক এজেন্সি।

(৬) পাল, দেবাশিষ (২০১৫). সাম্প্রতিক শিক্ষা, কলকাতা : রীতা বুক এজেন্সি।

অধ্যায় ১০

সমসাময়িক ভারতীয় সামাজিক ঘটনাবলি - ২
(CONTEMPORARY INDIAN SOCIAL ISSUES - 2)

১০.১. ভূমিকা (Introduction)

১০.২. উদ্দেশ্য (Objectives)

১০.৩. দলিত, উপজাতীয় এবং সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষাগত সুযোগ ও সমস্যা (Educational status, Opportunities & Experiences of Dalits, Tribal & Religious Minorities in India)

১০.৪. বস্তি ও সমস্যাসংকুল অভিবাসন পীড়িত শিশুদের শিক্ষা ও তাদের প্রান্তিককরণ (Marginalization and Education of Children from Slums and Distress Migration)

১০.৫. শিশুদের উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব (Impact of Electronic Media on Children)

১০.৬. আধুনিক যুবসমাজের সংস্কৃতিবোধ ও আন্তর্জালের প্রভাব ও উপযোগী শিক্ষা (Understanding Youth Culture in the Present times and the Impact of internet and Other Visual Medium)

১০.৭. সারসংক্ষেপ (Summary)

১০.৮. অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১০.১. ভূমিকা (Introduction)

সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে শিক্ষার সমস্যাগুলি অনেকটাই সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি, ঘটনাবলি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর কারণে উদ্ভূত। যেমন সামাজিক মূলস্রোতের বাইরে এক বড়ো জনসংখ্যা শিক্ষার সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর কারণ নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনা। তাই জাত, বর্ণ, ধর্ম, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে সামাজিক পরিকাঠামোর বহির্ভূত জনসংখ্যার শিক্ষাগত সমস্যা বর্তমানে একটি বহু আলোচিত বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন কারণে অনেক সময় সামাজিক বিচলন ও উচ্ছেদ এক বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করে। সেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো সকলের জন্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বা করতে পারে তা এই এককের আলোচ্য বিষয়। এ ছাড়াও শিক্ষাজগতে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও অন্তর্জালের প্রভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছে। কী কী ধরনের মানসিক এবং সামাজিক পরিবর্তন এগুলির সাহায্যে দেখা যাচ্ছে তারও আলোচনা এই পাঠ্য এককে করা হয়েছে।

১০.২. উদ্দেশ্য (Objectives)

এই একককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যে যে বিষয়ে অবহিত হবে সেগুলি হল—

(ক) সামাজিক বঞ্চনা ও পিছিয়ে পড়ার কারণগুলি কী কী জানতে পারবে।

(খ) ভারতীয় সংবিধান সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জানতে পারবে।

(গ) ভারতীয় শিক্ষা কমিটি ও কমিশন কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেছে জানতে পারবে।

(ঘ) সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত মানুষগুলির অবস্থান পরিবর্তনে শিক্ষা কী কী ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে জানতে পারবে।

(ঙ) শিক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে এবং কারা সংগঠিত করবে জানতে পারবে।

(চ) সামাজিক উচ্ছেদের প্রভাব শিক্ষায় কীভাবে প্রতিফলিত হয় জানতে পারবে।

(ছ) সামাজিক নিরাপত্তাদানে শিক্ষা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে এবং বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের কী পদ্ধতির সাহায্যে তা সংগঠিত করা সম্ভব তা জানতে পারবে।

(জ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম শিশুদের কীভাবে প্রভাবিত করছে এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষা কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা জানতে পারবে।

(ঝ) প্রজন্মের পার্থক্য (generation gap) বুঝতে হলে আধুনিক প্রজন্মের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন বুঝতে পারবে।

(ঞ) অন্তর্জাল ও অন্যান্য দর্শনমূলক মাধ্যমগুলি কীভাবে যুবসমাজকে প্রভাবিত করছে তার পরিচয় লাভ করতে পারবে।

(ট) শিক্ষার সামগ্রিক চিত্রটি এই সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে কীভাবে গড়ে তোলা যায় তার পরিচয় লাভ করতে পারবে।

১০.৩. দলিত, উপজাতীয় ও সংখ্যালঘু ভারতীয় নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা (Educational status, Opportunities and Experiences of Dalits, Tribal and Religions Minorities in India)

১০.৩.১. দলিত, উপজাতীয় ও সংখ্যালঘু ভারতীয় নাগরিক কারা?

সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজে মানুষের অবস্থানগত শ্রেণিবিন্যাসের মূলভিত্তি বর্ণ, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়। পশ্চিমি দেশগুলিতেও সামাজিক শ্রেণিকরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে তার ভিত্তি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা বর্ণভিত্তিক/গায়ের রং ভিত্তিক। কিন্তু ভারতবর্ষে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে অসংখ্য জাতি, বর্ণ, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদিও জাতি, বর্ণ, ধর্মগত বৈষম্য বর্তমানে আর বিশেষ গুরুত্ব পায় না। তবে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কারণে সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া একটি জনসমাজ আজও আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে।

ঘটনা সমীক্ষা - ১

ভজন হুগলির গুড়াপের প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক চাষি, সামান্য জমির মালিক হয়ে চাষ করে ও অন্যের জমিতে মজুরি খেটে তার দিন চলে। তার ছেলে নয়নকে সে খুব কষ্ট করে স্কুলে ভরতি করে এবং স্বপ্ন দেখে পড়াশোনা শিখে সে বড়ো মানুষ হবে। স্কুলে ভরতি হলে নয়ন নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে শেখে, তার আগ্রহী মন অনেক কিছু জানতে চায়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার অনেক জিজ্ঞাসা। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে সে কোনো প্রশ্ন তার শিক্ষককে করতে পারে না। কারণ তার ভয় হয় তার ভাষা মাস্টারমশাই বুঝতে পারে না। আবার অনেক সময় অতিকষ্টে প্রশ্ন বোঝাতে পারলেও তাকে শুনতে হয়েছে ''মাঠে চাষ করতে যা''— তোর কি আর লেখাপড়া হবে?

ঘটনা সমীক্ষা - ২

চাঁদ মুর্মুর মেয়ের বয়স আট বছর। ঝাড়গ্রামের কাছে শালপাতা বুনে তার পরিবারের দিন চলে। ছোটো মেয়েটির খুব ইচ্ছা স্কুলে যায়। কিন্তু তার ঠাকুমা তাকে যেতে দেয় না। বলে স্কুলে গেলে তাকে কেউ ঘরে নেবে না।

ঘটনা সমীক্ষা - ৩

আরামবাগের কাছে এক গ্রামের মাদ্রাসার ছাত্র শামিম। তার ইতিহাসের মাস্টারমশাই খুব সুন্দর করে ইতিহাসের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করেন। তার খুব ভালো লাগে। সে স্বপ্ন দেখে বড়ো হয়ে ইতিহাস পড়বে, অনেক অনেক দূর পর্যন্ত পড়াশোনা করবে। কিন্তু নবম শ্রেণিতে এসেই বুঝতে পারে তার পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ স্বপ্নবৎ। কারণ তার বাকি পাঁচজন ভাইবোনকে একা বাবার পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। তার বাবা গ্রামে ছোটো একটা দোকান চালায়। সেই দোকানে সাহায্য করতে পারলে তার পরিবারের সবাই অনেকটা সুবিধা পাবে। কাজেই তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

উপরের তিনটি ঘটনা আমাদের তিন ধরনের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করায়।

প্রথমত, নয়ন সমাজের যে স্তরে অবস্থান করে তার সমাজ, জগৎ, জীবন তাকে যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করায়, তার মুখের ভাষা কোনোটিই প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়ের সামাজিক প্রেক্ষিতের মতো নয়। তাই বিদ্যালয়-সমাজের অন্তর্ভুক্ত সে হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, আদিবাসী জীবনের কুসংস্কার সেই সমাজের মেয়েটিকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

তৃতীয়ত, দারিদ্র্য একজন আগ্রহী শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত করে।

কিন্তু উপরের তিনটি ঘটনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে ঘটনার মানুষগুলি দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন, দেশের সাধারণ পরিসেবা থেকে বঞ্চিত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—

(ক) ঘটনাগুলি কি সত্যিই আজকের দিনের বাস্তব ঘটনা?

(খ) এর স্থান কাল কি বাস্তবসম্মত?

হ্যাঁ এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও সত্য ঘটনা। স্বাধীন ভারতে এই মানুষগুলিকে সমাজের বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করে নানা সুযোগ-সুবিধার সহায়তায় তাদের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অগ্রগতি যাচাই করুন :

(১) ভারতীয় সমাজে দলিত কারা?

(২) দলিত / উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের সমস্যা কী?

(৩) প্রথম ঘটনা সমীক্ষায় যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তাকে কি তুমি বাস্তবসম্মত মনে কর?

ভেবে দেখো :

(১) দ্বিতীয় ঘটনা সমীক্ষায় যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার বাস্তব ভিত্তিটি কি দূর করা সম্ভব বলে মনে কর? কীভাবে?

(২) তৃতীয় ঘটনা সমীক্ষায় যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে তা দূর করা কি শিক্ষামূলক পরিবেশে সম্ভব?

১০.৩.২. সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণগুলি কী কী?

সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণগুলি বহুমাত্রিক। অনেক সময় একটির সঙ্গে অপরটি চক্রাকারে আবর্তিত। নীচে চিত্রাকারে বিষয়টি তুলে ধরা হল—

তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্যতা বেআইনি। তাই সেই বর্ণ বা জাতিভুক্ত মানুষগুলিকেই আমরা তপশিলি জাতিভুক্ত বলে থাকি যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে এবং সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগসুবিধা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। গ্রাম্যজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এই তপশিলি জাতিরা। যদিও সামাজিকভাবে গ্রহণ বা অংশগ্রহণের মাত্রার দিক থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃশ্যতা বা জাতপাতের প্রভাব যথেষ্ট কম। তবে সবক্ষেত্রেই যে পিছিয়ে পড়ারা এজন্য অনেক পিছিয়ে গেছে একথা বলা যায় না।

'উপজাতি' বলতে বোঝায় সাধারণভাবে প্রত্যন্ত বনাঞ্চল বা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। যদিও ভারতীয় সংবিধানে এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যথাযথ কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, তবে ৩৩৬(২০) নং ধারায় বলা হয়েছে 'তপশিলি উপজাতি' বলতে সেইসব উপজাতিকেই নির্দিষ্ট করা হবে যাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ জারি করে তপশিলভুক্ত বলে ঘোষণা করবেন ৩৪২(১) ধারায়। ভারতবর্ষের তপশিলি উপজাতিভুক্ত জনগণকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। (১) উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, (২) মধ্য ভারত অঞ্চল, (৩) দক্ষিণ ভারত অঞ্চল।

অন্যান্য পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষ। এখানে মূলত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উল্লেখ করা যায়। এই প্রসঙ্গে Backward Classes Commission তাঁদের প্রতিবেদনে (১৯৫৬) উল্লেখ করেছেন কোনো কোনো ধর্মীয় সামাজিক গোষ্ঠী যেমন—শিখ, খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ এই অর্থনীতি ও শিক্ষামূলক অনুন্নয়নের শরিক। তাই তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর সমস্যাগুলি হল—

(ক) সামাজিক অত্যাচার, সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব

(খ) সামাজিক অংশগ্রহণে বাধা

(গ) নিজস্ব সংস্কৃতি ও কুসংস্কারের বাধা পেরোতে না পারা

(ঘ) ভাষাগত সমস্যা

(ঙ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসজনিত কারণে সুযোগসুবিধার অভাব

(চ) জমির মালিকানা না থাকা

(ছ) শিক্ষার পাঠক্রম উপযুক্ত না হওয়া

(জ) বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে যুক্ত হতে না পারা

(ঝ) অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা সমস্যা

(ঞ) দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ইত্যাদি।

অগ্রগতি যাচাই করুন :

(ক) সামাজিকভাবে মানুষ কী কী কারণে পিছিয়ে পড়ে?

(খ) তপশিলি জাতি এবং উপজাতি কীসের ভিত্তিতে তপশিল ভুক্ত হয়েছিল?

(গ) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী কারা এবং তাদের কেন পিছিয়ে পড়া বলা হয়?

ভেবে দেখো :

যদি তোমার শ্রেণিকক্ষে বেশ কয়েকজন উপজাতির শিক্ষার্থীকে পাও কীভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলবে?

১০.৩.৩. সংবিধানের বিভিন্ন ধারা যা তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সুরক্ষা দিয়ে থাকে—

ভারত সরকার সংবিধানে বিশেষ কয়েকটি ধারা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(ক) সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা আছে যে, এই সংবিধানের মাধ্যমে সাম্য দৃঢ় হবে, সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত হবে।

(খ) সংবিধানের ১৫নং ধারায় জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদে যে-কোনোরকম বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(গ) ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে।

(খ) ৪৬নং ধারায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়।

(ঙ) ৩৩০নং ধারায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের বিশেষ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিকে সংসদে সুনিশ্চিত করা হয়।

(চ) ৩৩৪নং ধারায় সবক্ষেত্রে তপশিলি জাতি এবং উপজাতির জন্য বিশেষ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

(ছ) ৩৩৫নং ধারায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের বিভিন্ন চাকুরির পদে নিয়োগ করার কথা বলা হয়।

(জ) ৩০৮নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তপশিলি জাতি ও উপজাতির কল্যাণের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন করার ভার দেওয়া হয়েছে।

(ঝ) ৩৩৯নং ধারায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় কমিশনকে তপশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে।

(ঞ) ৩৪১ ও ৩৪২ নং ধারায় বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক তপশিলি জাতি ও উপজাতির তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে।

১০.৩.৪. ভারত সরকার গৃহীত ব্যবস্থা :

শিক্ষায় সমসুযোগ প্রতিষ্ঠায় ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ভারত সরকার নিরাপত্তামূলক ‘পার্থক্যনীতি’ (‘Protective Discrimination’) গ্রহণ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিদের জন্য সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এর প্রধান গৃহীত নীতি হল সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

এ ছাড়া প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বেতন মকুব, বইপত্র, জামাকাপড় বিতরণ প্রভৃতি তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে চালু করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের শিক্ষার সমসুযোগের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) মেধাভিত্তিক বৃত্তি প্রদানের ব্যাপক ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করে। এ ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ে আবাসিক ব্যবস্থা চালু করার কথা সুপারিশ করা হয়। এজন্য সরকারি অর্থে প্রধান প্রধান অঞ্চলে তপশিলি জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) শিক্ষায় সমসুযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কোঠারি কমিশনের গৃহীত সুপারিশ কার্যকর করা ছাড়াও শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেমন— তাদের সংস্কৃতিকে পাঠক্রমে গুরুত্ব দেওয়া, ভাষার চর্চা প্রচলিত রাখা ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষাবিদরা সমাজে দুর্বলতর শ্রেণির সমস্যা সমাধানে যে নীতিটি গ্রহণ করার কথা বলেছেন তা হল পৃথকীকরণের পরিবর্তে সমন্বয়ন (Integration instead of Discrimination)। অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া, দুর্বলতর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকলের মধ্যে এনে, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে তাদের মূলস্রোতে পুনর্বাসন দেওয়ার নীতি সরকার করেছে।

সকলের জন্য শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রকল্পে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনান্য পিছিয়ে পড়াদের শিক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে যেমন শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে হয় এই নীতি প্রকাশিত।

অগ্রগতি যাচাই করুন :

(ক) তপশিলি জাতি এবং উপজাতি কারা?

(খ) কীভাবে এদের চিহ্নিত করা হয়েছে?

(গ) ভারতীয় সংবিধানে এদের কীভাবে সমসুযোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে?

ভেবে দেখো :

পৃথকভাবে তপশিলি জাতি উপজাতিদের শিক্ষা দেওয়া নাকি সমন্বয়ন কোন্ নীতিটি তোমার মতে বেশি উপযুক্ত এবং কেন?

১০.৪. বস্তি এবং উদ্‌বাস্তু সমস্যা পীড়িত শিশুদের শিক্ষা এবং তাদের প্রান্তিক অবস্থান (Marginalization and Education of Children from Slum and Distress Migration) :

সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের হিসাব অনুসারে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি মানুষ বসবাস করেন। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে বিচলন সারা পৃথিবীতে বর্তমানে এক উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। জেকব রিল (Jecob Ril) যথার্থই বলেছেন— "The slum is the measure of civilization"। এই বিচলনের ফলে আগত মানুষগুলি অতি ঘনবসতি সম্পন্ন এলাকাতে কোনোমতে অস্থায়ী বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে জোট বেঁধে থাকে। এই অবস্থাকে বস্তি বলে। এছাড়াও প্রাকৃতিক ও নানা বিপর্যয়ের বিধ্বস্ত মানুষ পাড়ি জমায় শহরে রুজি-রোজগারের আশায়। ফুটপাতে, পথের ধারে, রেললাইনের ধারে তারা বাস করতে শুরু করে। জীবনের সব প্রাথমিক চাহিদাগুলি তারা সুস্থভাবে জোগাড় করতে না পেরে সমাজের প্রান্তিক স্তরে অবস্থান করে।

বস্তি কী এবং কেন?

অনেকগুলি সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণে বস্তির উৎপত্তি। বস্তি হল এক ধরনের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা যেখানে সবরকম নাগরিক সুযোগসুবিধা নেই। অবশ্যই শহর বা আধাশহর অঞ্চলে এগুলি গড়ে ওঠে। স্বাস্থ্য বা পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত অসচেতনতা এখানে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শহরাঞ্চলে বস্তি গড়ে ওঠার মূল কারণগুলি হল—

(ক) দ্রুত গ্রামীণ মানুষের শহরমুখী হওয়া

(খ) গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত কাজের অভাব

(গ) গ্রামাঞ্চলে সমসুযোগের ও সামাজিক পরিষেবার অভাব

(ঘ) গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য

(ঙ) অসংগঠিত কর্মসংস্থানের প্রসার ও সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

তবে বর্তমান বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতে যতজন বস্তিতে বাস করে তার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা স্বীকৃত বস্তির বাসিন্দা নয়। জীবনযাত্রার অনেক ধরনের উপকরণ আজকের দিনের বস্তিগুলিতে দেখা যায় তার চিত্রবদল হয়েছে। উদ্‌বাস্তু সম্পর্কিত প্রণব সেন কমিটি রিপোর্টে (2010) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে কীভাবে বস্তিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। কলকাতার 29.6% মানুষ বস্তিবাসী (2011)। এদের মধ্যে 90% মানুষ রাস্তার কলের জল ব্যবহার করে, তবে প্রায় সব জায়গায় বিদ্যুৎ রয়েছে এবং অনেকেই রান্নার গ্যাস ব্যবহার করেন। তবে পয়ঃপ্রণালীর ব্যাপারে নাগরিক পরিসেবায় এই অঞ্চলগুলি যথেষ্ট পিছিয়ে।

উদ্‌বাস্তু সমস্যা :

বস্তি সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত একটি সমস্যা হল উদ্‌বাস্তু সমস্যা। অর্থাৎ এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে এসে বসবাস করার প্রবণতা। গ্রাম থেকে অনবরত শহরে আসা। গ্রামাঞ্চল বা আদি বাসস্থান ত্যাগ করে আসার কারণেই বস্তিগুলি শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয় বস্তিগুলিতে ন্যূনতম পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর ছাদ থাকলেও যেসব মানুষ বিভিন্ন কারণে শহরে আসছেন তাদের অনেক সময়ে রেল স্টেশনে, ফুটপাতে, রেললাইনের ধারে অস্থায়ী চালা করে বসবাস করতে হয়। এরা অনেক সময় শুধু গ্রাম নয় সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী অন্যদেশের মানুষও হয়ে থাকেন। রুজি-রোজগারের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে অন্যদেশে পাড়ি জমান। এই বিচলন যখন কোনো মানুষকে স্থায়ীভাবে অন্য জায়গায় বাস করতে বাধ্য করে তখনই তাদের উদ্‌বাস্তু বলা হয়।

এই উদ্‌বাস্তু সৃষ্টি সমস্যায় দু-ধরনের শক্তি কাজ করে—টানা এবং ঠেলা (Pull and Push)। একজায়গায় জীবনযাত্রা চালানোর অভাব যেমন মানুষকে অন্য কোনো অঞ্চলের দিকে ঠেলে দেয় আবার অন্য অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধা এক অংশ থেকে অন্য অঞ্চলের মানুষকে টেনে নেয়।

বিংশ শতাব্দীর উদ্‌বাস্তু সমস্যার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। একবিংশ শতকে গোটা পৃথিবী জুড়ে অন্য এক ধরনের বাস্তুচ্যুত হওয়ার সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তা হল উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রসার এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে উদ্ভূত সমস্যা। বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে বিভিন্ন মফঃস্বল এবং গ্রামাঞ্চলে নতুন বাসস্থান নির্মাণ ও জমি অধিগ্রহণের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এতে ভূমিপুত্ররা যেমন বাস্তুচ্যুত হচ্ছে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এক অঞ্চল থেকে মানুষ অন্য অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই ধরনের বাস্তুচ্যুতি নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। নীচে দুটি ঘটনার সমীক্ষা দেওয়া হল যেখান থেকে বিষয়টির প্রকৃতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যাবে।

ঘটনা সমীক্ষা - ১

সুধা এবং তার বাবা, মা ও ভাই-এর পরিবার জন্মাবধি বসবাস করত পূর্ব কলকাতার জলাভূমির এক প্রান্তে। কাপড় কাচার কাজ করে তার বাবা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করত। তাদের নিজস্ব একচিলতে জমিতে ঘর করে তারা বসবাস করত এবং ওই পল্লিতে তাদের মতো আরও অনেক মানুষ ছিলেন। হঠাৎ খবর আসে সেখানে পাঁচতারা হোটেল হবে। হোটেলের সুস্থ পরিবেশ রক্ষা করার জন্য পল্লির প্রত্যেককে জমির কিছু দাম দিয়ে ওই জমি থেকে তাদের তুলে দেওয়া হল। এর ফলে পরিবারগুলি বাস্তুচ্যুত হল। এরপর শহরের অন্য প্রান্তে বসতি করতে হল কারণ যে সামান্য টাকা তারা পেয়েছিল তাতে নতুন জমি কিনে বাড়ি করার সামর্থ তাদের ছিল না। ফলে অন্যত্র লোকের বাড়িতে কাজ করে কোনোক্রমে তারা সংসার চালাতে লাগল, বাসস্থান হিসেবে বেছে নিল বস্তি অঞ্চল।

ঘটনা সমীক্ষা - ২

শহরের একটি প্রান্ত ততটা উন্নত নয় তাই উচ্চ আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ সেখানে বাস করত না। অত্যন্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষরাই সেখানে নিজস্ব জমি এবং বাড়ি নিয়ে বসবাস করত। এমন সময়ই অঞ্চলটির উন্নতি হতে লাগল এবং আবাসন গড়ে তোলার বিশেষ প্রভাব দেখা দিল। সেখানকার জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে তাদের একটি করে ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রস্তাব হতে জমিগুলি মালিকরা দিয়ে দেয়। কিন্তু বাড়ি তোলার পর নতুন আবাসনে যারা আসতে লাগল তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান ও জমির মালিক যারা ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন তাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা গেল। ফলে জমির মালিক বসবাসকারীদের অন্যত্র আরও কিছুটা মফঃস্বল বা ট্রেন লাইন ধরে অন্য স্টেশনে তাদের বাসস্থান খুঁজে নিলেন।

দুটি ঘটনা সমীক্ষা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে —

প্রথমত, শহরে উন্নয়নের স্বার্থে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন আর্থসামাজিক বৈষম্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং একদল মানুষকে তার নিজস্ব আর্থসামাজিক অবস্থান অনুসারে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ঘটায়।

এর ফলে অনেকগুলি সমস্যা দেখা দিতে পারে—

- নতুন জায়গায় বসতি স্থাপনের ফলে পুরানো জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।
- আরও বেশি আর্থিক সংগতির প্রয়োজনে পরিবার-এর সকলকে উপার্জন করার কাজে নিযুক্ত হতে হয়।
- মানসিক ও সামাজিক অস্থিরতার শিকার হয় মানুষ।
- সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হয়।
- সামাজিক পরিচয় বিঘ্নিত হওয়ার জন্য কিছুটা নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হয়।
- রাজনৈতিক ও সামাজিক হিংসার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।
- অসামাজিক কাজকর্ম করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- এছাড়া উদ্‌বাস্তু হওয়ার জন্য সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ধারা ব্যাহত হয়।

তবে এর আগের শতকের উদ্‌বাস্তু সমস্যার সঙ্গে এই শতকের সমস্যা কিছুটা পৃথক। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাতে অনেক মানুষ যেমন হারিয়ে গেছেন, তেমনি অনেক মানুষ আত্মপরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে তীব্র লড়াই করে জীবনে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। কিন্তু আজকের দিনের বাস্তুচ্যুতি যে ধরনের নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করছে তাতে সামাজিক চিত্র ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। আর্থিক বৈষম্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই প্রান্তিক মানুষগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক মূলস্রোতে ফিরে আসতে ব্যর্থ হচ্ছে।

১০.৪.১. বস্তি ও উদ্‌বাস্তু পীড়িত অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষা সমস্যা :

প্রথমত, একস্থান থেকে অন্যস্থানে বসবাস করতে এসে জীবনের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে এতটাই অর্থ এবং শক্তির ব্যয় হয় যে, শিক্ষার দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, বস্তি অঞ্চলে খুব ছোটো জায়গায় অনেকজন থাকায় প্রতিটি পরিসেবাই অপ্রতুল। ফলে মানসিক অসন্তোষ, শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটায়।

তৃতীয়ত, সাধারণ বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠক্রম ও সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক সময় এই ধরনের শিশুদের কোনো পরিচয় থাকে না।

চতুর্থত, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমত, অর্থনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অনেক সময়ে শিশুরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়।

ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক হিংসার প্রভাবে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়।

সপ্তমত, সামগ্রিকভাবে পরিবেশের মধ্যে হিংসা ও শান্তির অভাব মূল্যবোধ গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

অষ্টমত, উন্মুক্ত খেলার মাঠের অভাবে তাদের দৈহিক শক্তির যথাযথ অনুশীলন হয় না এবং তার যথাযথ বিকাশ ঘটে না।

নবমত, প্রবল দারিদ্র্য ও জ্ঞানের অভাব অপুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দৈহিক অক্ষমতার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়।

দশমত, সুস্থ সংস্কৃতির অভাবে অনেক সময়ে শিশুরা সস্তা প্রলোভনে আকৃষ্ট হয় এবং বিপথগামী হয়।

একাদশত, লিঙ্গবৈষম্যের কারণে মেয়েরা অনেক সময়ে হিংসার শিকার হয়। মেয়েদের লেখাপড়া আগে বন্ধ হয়ে যায়।

শেষত, বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও বিজ্ঞাপন সহজেই প্রভাবিত করে, ফলে কোনো বিষয়ে বিচারবোধ তৈরি করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ে।

১০.৪.২. শিক্ষার সমস্যাগুলি দূরীকরণের উপায় : উপরের আলোচিত অংশে আমরা দেখতে পাই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বস্তি অঞ্চলের এবং উদ্‌বাস্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে বঞ্চিত করছে। এ প্রসঙ্গে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বোঝায় দুর্গত ও পীড়িত মানুষদের জন্য ধারাবাহিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন—বেকারত্ব দূরীকরণ, সামাজিক ও আর্থিক সহায়তাদান। বিশেষত আর্থিক সহায়তাদান। অসুস্থ ও আর্থিক দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য যথাযথ বীমাকরণের ব্যবস্থা। এ ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষাদান পরিকল্পনা করা যাতে যথাযথ শিক্ষালাভ করে এইসব শিক্ষার্থীরা স্বনির্ভরশীল হতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ : শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি চিরাচরিত—বিদ্যালয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, তাদের স্বনির্ভরশীল করে তোলা। এর জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার সেগুলি হল—

প্রথমত, সকলে যাতে বিদ্যালয়ে আসে তার জন্য পারিবারিক ও আঞ্চলিক স্তরে বিশেষ জনসচেতনতা সৃষ্টি যা সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে অনেকটাই স্বীকৃত। সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য প্রাপ্ত পাঠ্যবই, জামাকাপড় প্রভৃতির সাহায্যে তাদের অসহায়তা অনেকটা দূর করা গেছে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রচলিত পাঠক্রমকে জীবনমুখী করে গড়ে তোলা, যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি তুলে ধরা যায়।

তৃতীয়ত, প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের কথ্যভাষার সঙ্গে পাঠক্রম ও শিক্ষাদানকে যুক্ত করতে হবে। তবেই এইসব ছেলেমেয়েরা পাঠদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে।

চতুর্থত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে তাদের পরিচিতি করানো প্রয়োজন।

পঞ্চমত, যেহেতু গৃহ পরিবেশে তাদের লেখার সুযোগ কম তাই এইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষালয়ের মধ্যেই এই ধরনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে।

ষষ্ঠত, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষককে কিছুটা বেশি শ্রম বা যথাযথ যত্ন নিতে হবে। যেহেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্থ গৃহ পরিবেশ থাকে না, সেজন্য সংশোধনমূলক পাঠদানের অভ্যাস করতে হবে।

সপ্তমত, যথাযথ মূল্যবোধ অনুশীলন ও শারীরিক শ্রমের সুযোগ করে দিতে হবে।

অষ্টমত, শিক্ষকের সহনশীলতার মাত্রা বাড়াতে হবে। কারণ এইসব অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার যথেষ্ট প্রথানুগ হয় না। কাজেই তাদের ওই আচরণে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধরে শিক্ষাদান করতে হবে।

নবমত, প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে, যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে তারা সহজেই স্বনির্ভরশীল হতে পারে।

দশমত, প্রয়োজনমতো পারিবারিক সদস্যদের মতামত নিয়ে, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রচনা করে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও পেশার সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে হবে।

অগ্রগতি যাচাই করুন :

(ক) বস্তি ও উদ্‌বাস্তু পীড়িত অঞ্চলের প্রকৃতি কী?

(খ) এইসব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব শিশুদের মূল সমস্যা কী?

(ঘ) উদ্‌বাস্তু সৃষ্টি সমস্যার দুটি প্রধান উৎস কী কী?

(ঙ) উদ্বাস্তু শিশুদের শিক্ষার প্রধান দুটি সমস্যা উল্লেখ করো।

ভেবে দেখো :

(১) ঘটনা সমীক্ষা ১ এবং ২-তে যে দুটি ঘটনা দেখানো হয়েছে সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

(২) এই দুটি ক্ষেত্রে কী ধরনের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে?

১০.৫. শিশুদের উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব (Impact of Electronic Media on Children)

শিশুদের উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব আজকের দিনে কোনো সম্ভাবনামূলক ঘটনা নয়। এটি নিশ্চিত ঘটনা। সব ধরনের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব অপরিসীম। প্রতিদিনের খবরে কোনো-না-কোনো ঘটনায় আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই। ছোটদের জন্য নির্মিত নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। তা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রভাব প্রমাণিত। বৈদ্যুতিন মাধ্যম সাধারণত যে যে উপায়ে শিশুদের প্রভাবিত করে সেগুলি হল—

(ক) খাদ্য অভ্যাসে প্রভাব : টিভিতে দেখানো খাদ্য বা পানীয়টিই শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাস থেকে শিশুদের অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাস গঠিত হয়।

(খ) অলীক কল্পনার সওয়ারী : এই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান শিশুদের অলীক কল্পনার সওয়ারী করে তোলে। ফলে বাস্তব জীবন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়।

(গ) মনোযোগ বিনষ্ট : একভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বিনষ্ট হয়। ফলে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়।

(ঘ) সামাজিক সংযোগ বিঘ্নিত : বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অতিরিক্ত আসক্তি শিশুর সামাজিক সংযোগ বিঘ্নিত করে। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে সহনশীলতা, অভিযোজন ক্ষমতা প্রভৃতি ব্যাহত হয়।

(ঙ) শৈশব অবস্থায় বড়োদের জগতে প্রবেশ : বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জগতের অনেক বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে উন্মুক্ত হওয়ায় যথেষ্ট পরিণত হওয়ার আগেই বড়দের জগৎ তাদের সামনে চলে আসছে, ফলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই জগতের কোনোকিছুই তার অপরিণত মস্তিষ্কে স্পষ্ট হয় না। ফলেই এই বিঘ্ন।

উপরের যে প্রভাবগুলি উল্লেখ করা হল তার বেশিরভাগই শিশুর লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার প্রভাব বা কুপ্রভাব। কিন্তু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার পথ অনেকটা সুগম করে তুলেছে। ওই বিষয়ের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

(ক) পাঠ্যবিষয় চোখের সামনে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। পাঠ্যবিষয়গুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিশুদের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, ফলে তার শিক্ষা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্যের জগতে অবাধ বিচরণের ব্যবস্থা হতে পারে। শিশুর সামনে তথ্যের জগৎ হয়ে ওঠে অবারিত।

(গ) বই-এর বিষয়গুলিকে জীবন্ত করে চোখের সামনে তুলে ধরতেও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিকল্প নেই।

(ঘ) সমাজের সাধারণ ঘটনাবলি অথবা নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যাবলির প্রচারেও বৈদ্যুতিন মাধ্যম বিশেষ উপযোগী।

(ঙ) এছাড়া ভবিষ্যতের উপযোগী নানা ধরনের দক্ষতার বিকাশে বৈদ্যুতিন মাধ্যম অপরিহার্য। আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রয়োজনীয়।

(চ) যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তাই বিশেষ মত বিনিময় ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শিশুদের আরও সক্রিয় করে তুলতে পারে।

(ছ) এছাড়া নানা সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে শিশুরা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা বা অন্তর্ভুক্তিকরণের নীতি অনুসারে বৈদ্যুতিন মাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল শিশুদের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যম বিশেষ প্রভাবশালী শুধু নয়, এটি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। কীভাবে তা সম্ভব তার একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(ক) শিক্ষা পরিকল্পনা ও পাঠক্রম : শিক্ষা-পরিকল্পনা করার সময় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা মনে রাখতে হবে। শুধু কম্পিউটার বা টিভি কেনা নয়, তা যাতে ঠিকমতো ব্যবহার উপযোগী হয় তা দেখতে হবে। পাঠক্রম এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনা একইরকমভাবে সক্রিয় হয়। অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তারা যাতে নিজেরা করতে পারে এবং অপসারী চিন্তনে তাদের সক্ষম করে তুলতে হবে। আর তা হতে হলে বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রয়োগের সঠিক ব্যবস্থা করতে হয়। এতে প্রত্যেকের চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করার জন্য নানা ধরনের সফট্‌ওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন—ইতিহাসে মধ্যযুগের স্থাপত্য সম্পর্কে বোঝাতে হলে ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে তার ছবিগুলি তুলে ধরতে হবে। সেখান থেকে ওই বিশেষ সময়ের স্থাপত্যর বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীরা নিজেরা বিশ্লেষণ করবে এর পাশাপাশি আধুনিক যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীরা স্থায়ীভাবে এই দুই-এর পার্থক্য সম্পর্কে বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে পারবে।

অর্থাৎ পাঠক্রমকেও বাস্তব ও প্রয়োগযোগ্য করে তুলে বিদ্যালয় পরিকাঠামোয় এই সুযোগসুবিধাগুলি রাখতে হবে। বিদ্যালয় পরিকাঠামোকে উন্নততর করে এই ভাবনা ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। দৈহিকভাবে অক্ষম শিশুরা যাতে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তা দেখতে হবে। যদিও বর্তমানে সরকারি পরিকাঠামো প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করেছে। তা দুটি উদ্দেশ্যে মূলত ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীদের এই মাধ্যমের সঙ্গে পরিচিতিকরণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা।

(খ) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ : বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় যথাযথ ব্যবহার করার জন্য এর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। বিষয়ভিত্তিক এবং পাঠএকক ভিত্তিক প্রদর্শন কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণদান প্রয়োজন। এ ছাড়া শিক্ষা সহায়ক উপকরণ কীভাবে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রস্তুত করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত প্রয়োগ এবং অনুশীলন প্রয়োজন।

(গ) শ্রবণ-দর্শন সহায়ক উপাদান সংবলিত লাইব্রেরি : বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র ছাপানো বই না রেখে বিভিন্ন ধরনের অডিও-ভিডিও ক্যাসেট রাখলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এমনিতেই বর্তমানে শিশুরা টেলিভিশনে বিশেষ অভ্যস্ত হওয়ায় শ্রবণ-দর্শন সহায়ক মাধ্যমে বেশি পাঠ নিতে পারে।

(ঘ) হাতেকলমে কাজের আদর্শ : বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তার অসুবিধাগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের পাঠ লাভে বাধা সৃষ্টি না করে সেই সুযোগ পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে রাখতে হবে। যেমন, অতিরিক্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যম নির্ভর হয়ে এক জায়গায় বসে কাজ বা খেলাধুলায় শিশুরা অভ্যস্ত হয়। সেজন্য পর্যাপ্ত সময় তারা যাতে খেলাধুলা ও অন্যান্য শরীর সঞ্চালনে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া অপর একটি বিশেষ সমস্যা হল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারা। অতিরিক্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যম নির্ভর হয়ে কাল্পনিক জগতে বেঁচে থাকতে শুরু করে শিশুরা। তার জন্য উপযুক্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে দলগত কার্য পরিচালনার দ্বারা সামাজিক সুষ্ঠু সম্পর্কগুলি গড়ে তোলা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণাবলির অনুশীলন করাতে হবে।

(ঙ) বিজ্ঞাপনের জগৎ সম্পর্কে সঠিক মতবাদ গড়ে তোলা : শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জগতে যে ধরনের মিথ্যাকে তুলে ধরা হয়ে থাকে তার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এর প্রতি শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোমতেই আকৃষ্ট না হয় সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। আবার জনমত গঠনের বিজ্ঞাপনগুলি মন দিয়ে যাতে তারা শোনে এবং বিশ্লেষণ করতে পারে তার পরিসর শিক্ষাক্ষেত্রে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়গুলিকে শিশু অবস্থা থেকে আলোচনা করে তাদের মানসিকতা দৃঢ় করতে হবে।

যেমন—জল ও বিদ্যুতের অপচয় না করা, চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্যকর স্বাভাবিক খাদ্য যেমন—ফলমূল শাকসবজি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা, ফাস্ট ফুড বা ঠান্ডা পানীয় না খাওয়া ইত্যাদি।

(চ) প্রথম প্রজন্মের শিশুদের শিক্ষাদান : বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যথেষ্ট সংখ্যক প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আসে। এদের গৃহ পরিবেশে শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা না থাকায় এরা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই বৈদ্যুতিন মাধ্যমটিকে নাড়াচাড়া করা বা তার সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা এদের কাছে এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা। এবিষয়ে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষককে যথেষ্ট যত্নশীল হতে হবে।

অগ্রগতি যাচাই করুন :

(ক) শিশুদের উপর কী কী বিষয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব পড়ে থাকে?

(খ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রয়োগের সুফলগুলি কী কী?

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা কী?

ভেবে দেখো :

শিশুর মানসিক, সামাজিক, দৈহিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর?

১০.৬. আধুনিক যুবসমাজের সংস্কৃতি বোধ এবং অন্তর্জালের প্রভাব ও উপযোগী শিক্ষা :

আধুনিক যুবসমাজের সংস্কৃতি বোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই প্রজন্ম পার্থক্যের নিরিখে 'আধুনিক যুবসমাজ' কথাটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

আধুনিক কথাটি আপেক্ষিক। সমাজতত্ত্বের নিরিখে প্রচলিত আধুনিকতার সংশয় প্রজন্মান্তরের প্রসঙ্গ আসে। এক প্রজন্মের সঙ্গে অন্য প্রজন্মের চিন্তা, ভাবনা, রুচি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল। বর্তমানে এই পার্থক্য ও পরিবর্তন এতটাই দ্রুত ঘটে যে এক প্রজন্মের পার্থক্য যা আগে ছিল কুড়ি বছর তা প্রায় এখন তিন থেকে পাঁচ বছরে এসে ঠেকেছে। কাজেই এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন করা আর একটা সামাজিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে। এই পার্থক্য যে যে বিষয়ে বিশেষভাবে প্রকাশিত তা হল—ভাষার ব্যবহার, প্রযুক্তির ব্যবহার, আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি। নিম্নে একটি একটি করে প্রতিটি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

ভাষার ব্যবহার : অত্যন্ত দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বহুভাষা মাধ্যম-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় ভাষাগুলির মধ্যে মিশ্রণ ঘটছে। পরিপূর্ণ শুদ্ধ একটি ভাষা ব্যবহারের বদলে মিশ্র কথ্যভাষা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে ভাষা শিক্ষার মধ্যেও এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই।

প্রযুক্তির প্রয়োগ : বর্তমানে প্রযুক্তি কৌশল ও তার ব্যবহারের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যে-কোনো আর্থসামাজিক স্তরেই এর ব্যবহার ব্যাপক। যেমন, মোবাইল ফোন, সোশ্যাল-নেটওয়ার্ক প্রভৃতি। এই ধরনের প্রযুক্তি কৌশল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বদলে প্রযুক্তিমূলক সম্পর্ক তৈরি করছে। যেখানে বন্ধুত্ব বা নৈকট্য প্রত্যক্ষ দৈহিক সাক্ষাৎ-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির নিরিখে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ব্যক্তিগত আবেগ বা শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিমা বিশেষভাবে বদলে গেছে।

মানবিক সম্পর্কের দিকটি বদল হওয়ার অন্য একটি তাৎপর্য এখানে রয়েছে, তা হল দ্রুত সংযোগ সৃষ্টি বা যোগাযোগ স্থাপন। যে তথ্য বা সংবাদ পরিবেশনে দুই থেকে তিনদিন সময় লাগত তা মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব হচ্ছে। ফলে কোনো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে অনেক কম সময় লাগছে।

আচরণের পরিবর্তন : মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। মানুষ অনেক সময়ে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তুলনায় নিজের মধ্যে, নিজেকে নিয়ে সময় কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির নানা মাধ্যম তার প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠছে। বর্তমান সংস্কৃতির অঙ্গ নিউক্লিয়ার পরিবার। যৌথ পরিবারের অভিজ্ঞতা না থাকায় একটি বা দুটি মানুষকে দেখে শিশুরা বড়ো হচ্ছে। আবার তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছোটোবেলা থেকেই এতটা প্রাধান্য পাচ্ছে যে, নিজের চারপাশের সঙ্গে অভিযোজন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। যে-কোনো অবস্থাতেই স্বার্থত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার মানুষের আচরণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারছে না। ফলে অতি সহজেই আচরণের মধ্যে অসংগতি প্রকাশ পাচ্ছে। সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উদার মানসিকতা খুব সহজে গড়ে উঠছে না।

মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নগরায়ণের অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল একাকিত্ব। মানুষ তীব্র একাকিত্বের শিকার হচ্ছে। নিজস্ব চাহিদা ও জীবনযাত্রার দাবি মিটিয়ে মানবিক সম্পর্কের নৈকট্য সর্বদা সৃষ্টি হচ্ছে না। কোনো কারণে বিশেষ উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে দায়বদ্ধতা থাকছে না। ফলে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। শিশু অবস্থা থেকেই এই পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যেও একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। আত্মীয় পরিজনহীন পরিবার, বন্ধুত্বহীন সমাজ, তীব্র উচ্চাকাঙ্খাবিশিষ্ট শিক্ষা জীবন এক জটিল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত আলোচিত কারণে সামগ্রিকভাবে আধুনিক সমাজে সববয়সি মানুষের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এর সঙ্গে আর একটি আধুনিক উপাদানকে যুক্ত না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে তা হল অন্তর্জালের (Internet) প্রভাব। এর প্রভাব আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য সংক্রান্ত কোনো বাধা থাকছে না। যে-কোনো তথ্য যে-কোনো সংবাদ অতি দ্রুত পরিবেশিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে-কোনো বয়সে যে-কোনো কৌতূহল মেটাতেও-এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর যেমন সুফল আছে, তেমনি কুফল বর্তমান। একটা বিরাট জগৎ যেমন মানুষের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে তেমনি এর যুক্তিপূর্ণ যথাযথ প্রয়োগ না হলে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে, বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের জন্য। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সুকৌশলে তাদের সামনে পরিবেশন করতে হয়। যেমন- আধুনিক পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য প্রকাশের তুলনায় কিছু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য রেখে অনেকটাই আভাস দেওয়া হয় যা অন্তর্জালের সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজের মতো খুঁজে নিতে পারে। নির্মিতিবাদী জ্ঞানতত্ত্বে (Constructivist Approach) এর প্রভাব অপরিসীম। আধুনিক পাঠ্যপুস্তকগুলি নতুনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, যেখানে বিষয়ের তথ্যভারে বইগুলিকে জর্জরিত না করে, বিষয়ের তাৎপর্যটুকু উল্লেখ করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের ভার শিক্ষার্থীদের। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, পরিবেশ, অন্তর্জাল প্রভৃতির থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের জ্ঞান নির্মাণ হবে। বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে-এর ভূমিকা অপরিসীম।

আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?

শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক সংস্কৃতির প্রতিটি আলোচিত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে শিখন-শিক্ষণ পরিবেশ, পদ্ধতি, পাঠক্রম প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

(ক) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন : শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শুধু জ্ঞান অর্জন করা বা কিছু তথ্য মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে আধুনিক যুগে মনে করা হচ্ছে না। আজকের শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি (Capacity building) যাতে সে নিজের জীবনের সমস্যাগুলি আত্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে মিটিয়ে নিতে পারে। শুধু পরীক্ষায় পাশ নয়, বিচারশীল চিন্তাভাবনা সৃষ্টি, বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(খ) শিক্ষার পাঠক্রমে পরিবর্তন : পাঠক্রমের ক্ষেত্রে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুই একমাত্র পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে। যা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নয় এমন বিষয় বিদ্যালয় পাঠক্রমে স্থান পাবে না। শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক, হৃদয় ও অন্যান্য অঙ্গের সঞ্চালন (Head, Heart and Hand) একই সঙ্গে যাতে হয় তেমন পাঠক্রম গড়ে তুলতে হবে। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-এর উপযোগী পাঠক্রম এমন হবে যাতে সামাজিক সৌহার্দ বিস্তারিত হয়, একত্রে কাজের অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়, অংশীদারিত্ব নীতি প্রকাশিত হয়। এমন পাঠক্রমই আধুনিক শিক্ষায় গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

(গ) শিক্ষার পদ্ধতি : জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনার কথা বলেছে। শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে কর্মভিত্তিক ছোটো ছোটো দলগত কার্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পাঠক্রম প্রয়োগ হবে। প্রতিটি জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করা হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে এই পদ্ধতি সফল করতে হবে। এই পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা মিটিয়ে তাদের একত্রিত করে শিক্ষাদান করা এর বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) শিক্ষকের ভূমিকা : আধুনিক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের ভূমিকায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষকের প্রান্তিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে শিক্ষক হয়েছেন সংযোগসাধনকারী সহায়ক (Facilitator) শ্রেণিকক্ষের নানা বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে তিনি সর্বদাই শিক্ষার্থীর জ্ঞান নির্মাণে সহায়ক হবেন। শিক্ষার্থীদের দমন বা নিয়ন্ত্রণ নয়, তাদের স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচালনা করাই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

শিক্ষকের অবস্থানগত পরিবর্তন—

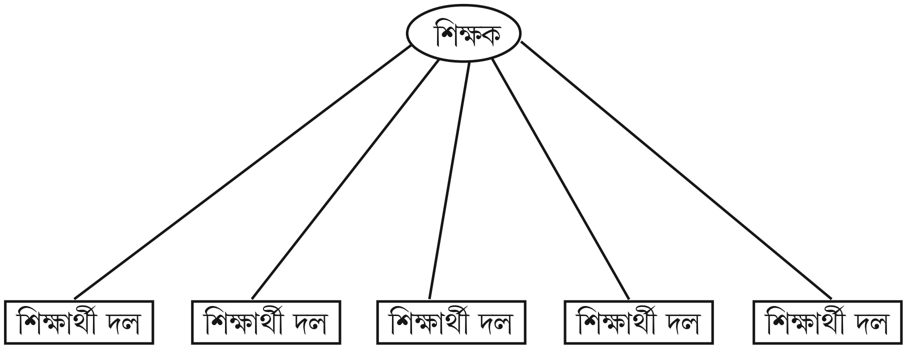

আধুনিক অবস্থান

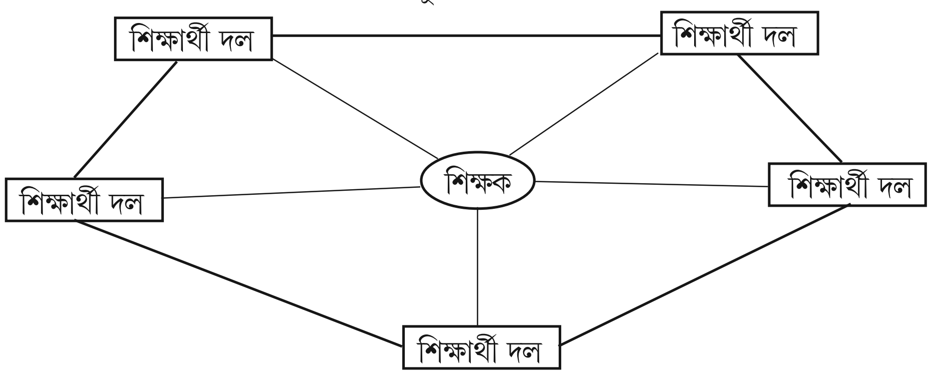

পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া আধুনিক সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য শিক্ষকের অবস্থান।

(ঙ) পাঠ্যপুস্তক : আধুনিক প্রযুক্তি ও সংস্কৃতি পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও নতুন ভাবনার প্রবর্তন ঘটিয়েছে। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে শুধু তথ্যজ্ঞাপন পাঠ্যপুস্তকের মূল উদ্দেশ্য নয়। বিষয়বস্তুর তাৎপর্য নির্দেশ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। শিক্ষার্থীদের ভাবনার পরিসর বাড়িয়ে, অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

(চ) মূল্যায়ন ব্যবস্থা : কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সার্থক রূপ লাভ করে না, যতক্ষণ না শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়। তাই মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে রূপান্তর আনা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত। পরীক্ষা ব্যবস্থা মূলত তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা যেখান থেকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে আসতে হবে। মুখস্থ নির্ভরতা, তথ্য নির্ভরতা থেকে এই মূল্যায়নকে করে তুলতে হবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণধর্মী এবং সৃজনশীল। এবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার পরিবর্তন না হলে শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী সত্য সত্যই বিচারশীল চিন্তা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে কি না তা বোঝার জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

(ছ) বিদ্যালয় ব্যবস্থা : প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি শুধু শিক্ষাদান কেন্দ্র নয়, সামাজিক আদানপ্রদান কেন্দ্র বলে বিবেচিত হবে। সমাজের সকল শ্রেণি, জাতি, বর্ণ ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে যেমন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসবে তেমনি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষ বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করবেন। যেমন— সমাজের বিদ্বান গুণী শিক্ষাবিদরা, আঞ্চলিক প্রশাসন, শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, অন্যান্য সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি।

জ) শিল্পকলার অনুষঙ্গে শিক্ষা : আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি দুটিই বহুমাত্রিক, বহুধর্মী ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন। তাই এর মাধ্যম শুধুমাত্র ভাষা বা বাচনিক যোগাযোগ নয়। অন্যান্য কলাবিদ্যা যেমন— দৃশ্যকলা, নৃত্য, সংগীত, নাটক প্রভৃতি শিক্ষা প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নান্দনিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি সব ধরনের বিকাশ হতে পারে। শুধু তাই নয় দৈহিক ও মানসিকভাবে সমস্যাপূর্ণ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিল্পকলা থেকে সংকেত গ্রহণ করে, নানাধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে।

বর্তমান শিক্ষায় পাঠদান কৌশলকে আরও পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর রূপ দান করার জন্য গান, নাটক, দৃশ্যকলা প্রভৃতির নানাবিধ সাহায্য লাভ করা যায়।

১০.৭. মূলকথা : সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজে মানুষের অবস্থানগত পার্থক্য নির্ধারিত হয় সামাজিক কাঠামোগত কারণে। যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ এককালে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি সৃষ্টি করেছিল। এই শ্রেণিবৈষম্য ও পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বঞ্চনার সূচনা করে এবং একটি বিরাট জনগোষ্ঠী সাধারণের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে যায়। এই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী স্বাধীন ভারতে বিশেষ তপশিলের অধিকারে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি বলে স্বীকৃত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সংবিধানের অনেকগুলি ধারা প্রযুক্ত হয় যেখানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়।

তপশিলি জাতি-উপজাতি সমস্যা ছাড়াও তীব্র দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, কৃষিজমির অপ্রতুলতা প্রভৃতির কারণে বিপুল জনগোষ্ঠীর গ্রাম থেকে শহরমুখী বিচরণ ঘটেছে। এ ছাড়া তথাকথিত নগরায়ন ও উন্নয়নের চাপে একটি বড়ো সংখ্যার মানুষ ভূমিচ্যুত হচ্ছেন। তাদের অতি জনবহুল বাসস্থানটিকে সাধারণভাবে আমরা বস্তি বলে থাকি। এই ধরনের সমস্যায় মানুষ কীভাবে শিক্ষার আলো লাভ করবে বা এখানে কী কী ধরনের শিক্ষা সমস্যা বা সামাজিক সমস্যা ঘটতে পারে তা পৃথকভাবে আলোচনা করা ও সামাজিক বহিষ্কার-এর প্রভাবমুক্ত করে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে এঁদের পুনর্বাসিন সম্ভব করে তোলা, শিক্ষা পরিকল্পনকালে এদিকে নজরদান জরুরি।

আধুনিক ভারতীয় সমাজে শুধু নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যম, অন্তর্জাল প্রভৃতির প্রভাব ছাত্রসমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করছে। এই প্রযুক্তি সহায়তা আমাদের একদিকে যেমন বিশেষ প্রয়োজন অপরদিকে অনেক সংকট নিয়ে আসছে। সেই সংকট থেকে মুক্ত হতে হলে মুক্ত চিন্তার সাহায্যে প্রজন্ম পার্থক্যের বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি দিক নতুন করে চিন্তাভাবনা, পুনর্বিচার ও পরিবর্তন করতে হবে।

মূলশব্দ (Key words) :

সভ্যতা

সংস্কৃতি

তপশিলি জাতি, উপজাতি

সামাজিক বঞ্চনা

সমানাধিকার

সামাজিক উচ্ছেদ

সামাজিক বহিষ্কার

সামাজিক নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিন মাধ্যম

প্রজন্ম পার্থক্য, আন্তর্জাল

১০.৮. অধ্যায় শেষ অনুশীলনী : (Unit end Exercise)

১। ৫০০ শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি ভারতীয় সমাজে কীভাবে চিহ্নিত? তাদের সমস্যাগুলি কীভাবে সৃষ্টি হয়?

(খ) বস্তি এবং উদ্‌বাস্তু পীড়িত অঞ্চলে শিশুদের শিক্ষার সমস্যাগুলি কী কী? তা কীভাবে দূর করা সম্ভব?

(গ) শিশুদের ওপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব বিস্তারিত আলোচনা কর।

(ঘ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাবকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে কী ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো।

(ঙ) একবিংশ শতকে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে শিক্ষাকে আধুনিক প্রজন্মের সংস্কৃতি অনুসারে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তার পরিচয় দাও।

২। ২৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(ক) দলিত, উপজাতির ও সংখ্যালঘু ভারতীয় নাগরিকের শিক্ষার সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।

(খ) ভারতীয় সংবিধান এই সমস্যাটিকে কীভাবে দেখেছে এবং কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

(গ) ভারত সরকার বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের মাধ্যমে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়াদের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

(ঘ) বস্তি কী এবং কেন গড়ে ওঠে?

ঙ) উদ্‌বাস্তু সমস্যা বা বাস্তুচ্যুতি কী কী ভাবে ঘটে থাকতে পারে?

(চ) বাস্তুচ্যুতির ফলে কোন্ কোন্ সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হয়?

(ছ) বস্তিবাসী ও বস্তিচ্যুতদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি কী কী?

(জ) শিশুদের উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাবের ভালো দিকগুলি চিহ্নিত করো।

(ঝ) আধুনিক যুবসমাজের সংস্কৃতিবোধের পরিচয় দাও।

(ঞ) অন্তর্জালের প্রভাব কীভাবে সংস্কৃতির উপর প্রকাশিত হয়?

৩। **২৫ শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**

ক) তপশিলি জাতি কীভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল?

খ) সংবিধানে ‘Protective Discrimination’ নীতিটি কী?

গ) বস্তি অঞ্চলের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাটি কী?

ঘ) বস্তিচ্যুত মানুষের সামাজিক সমস্যাগুলি কী?

ঙ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম শিশুদের শিক্ষাকে ব্যাহত করে? — যুক্তি দাও।

চ) নতুন সংস্কৃতি অনুসারে শিক্ষকের ভূমিকায় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ